তৃতীয় বাংলা

তৃতীয় বাংলা

১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২২

সম্পাদনা পরিষদ

ময়নূর রহমান বাবুল
আতাউর রহমান মিলাদ
ফারুক আহমদ
এ কে এম আব্দুল্লাহ
ইকবাল হোসেন বুলবুল
মোসাইদ খান
সাগর রহমান

সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাজ্য
Web: sommilito.blogspot.com
Email: sommilitosspj@gmail.com

প্রকাশকাল
১০ম বাংলাদেশ বইমেলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক উৎসব
লন্ডন – ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাজ্য

প্রকাশক
সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাজ্য

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ
অনার্য প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
১১১ নয়া পল্টন (৬ষ্ঠ তলা), পল্টন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ই-মেইল : anarjo5271@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.anarjo.com
মোবাইল : +৮৮০১৯৫২২০০৭০০

প্রচ্ছদ : নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা

MRP: Taka 500.00, US$ 12: 00 UK£ 15: 00

উৎসর্গ

আবদুল গাফফার চৌধুরী
বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক
প্রধান উপদেষ্টা
সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাজ্য

স্পন্সর

অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
ঢাকা, বাংলাদেশ

আমাদের কথা

বাঙালিরা যেখানেই বসতি স্থাপন করেছে, সেখানেই রচনা করেছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভিত। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে, বিলেতে, একটি বিশাল জনগোষ্ঠী মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলেন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করেন। সময়ের পরিক্রমায় বিলেতে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অভিনেতা, চিত্রকর, শিল্পী, নাট্যকার– এদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরী হয়েছে। বিলেতের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন সারাবছর ধরেই সরব থাকে এবং এর সাফল্য গাঁথাও চোখে পড়ার মতো। বিলেতের মূলধারায়ও তাদের শক্ত অবস্থান লক্ষণীয়।

সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাজ্য দীর্ঘদিন থেকে প্রতিবছর দু'দিনব্যাপী বইমেলার আয়োজন করে আসছে। বৈশ্বিক মহামারির কারণে গত দুই বছর মেলার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এ বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে দশম বইমেলা। প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে উৎসাহ প্রদান এবং সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ করা এর মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন প্রকাশনী তাদের প্রকাশিত বইপত্র নিয়ে মেলায় যোগ দেন। আগমন ঘটে বিলেতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করা অসংখ্য লেখক, পাঠক, বইপ্রেমীদের। ফলে এ বইমেলা লেখক, পাঠক ও প্রকাশকের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

সম্মিলিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিষদ, যুক্তরাজ্য কর্তৃক আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী বইমেলাটি বইয়ের প্রদর্শন ও বিকিকিনি ছাড়াও নানা ধরনের অনুষ্ঠানে ভরপুর থাকে। স্টলে ঘুরে বই কেনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য আলোচনা, স্বরচিত কবিতা পাঠ, কবিতা আবৃত্তি, সম্মাননা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের আয়োজন এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ। বিশেষত এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা গুণী বাঙালি সাহিত্যিকদের আগমন আয়োজনটিকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

এ বছরই প্রথম বারের মতো বইমেলাকে উপলক্ষ্য করে একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মূলত বিলেত প্রবাসী কবি সাহিত্যিকদের লেখা দিয়ে সাজানো এই সংকলনের প্রকাশ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে– এ আশা রাখছি। সাম্প্রতিক সময়ে বিলেতে যারা সাহিত্যচর্চা করছেন, কিংবা দীর্ঘদিন থেকে চর্চাটি অব্যাহত রেখেছেন– আমরা জোর দিয়েছি বিশেষত তাঁদের লেখা অর্ন্তভুক্ত করার।

চেষ্টা করা হয়েছে নবীন ও প্রবীণ– সব প্রজন্মের লেখকদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করার। এর মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যতের পাঠকদের সামনে বিলেতের সাহিত্য চর্চার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি আমরা।

আন্তরিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সংকলনে বিলেতের সকল লেখককে অর্ন্তভুক্ত করা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। বারবার তাগাদা দিয়েও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লেখা হাতে না পৌঁছা এবং কিছু ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যর্থতা এর প্রধান কারণ। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরো সচেষ্ট হবার আশাবাদ ব্যক্ত করছি। তবে পূর্ণাঙ্গ না হলেও বিলেতের অধিকাংশ লেখকের লেখার সন্নিবেশ ঘটেছে এই সংকলনে– এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। সংকলনের কলেবর আশাতীত বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মূল পরিকল্পনার ব্যতয় করতে হয়েছে। বিশেষত ইচ্ছে ছিল প্রত্যেক কবির একাধিক কবিতার অর্ন্তভুক্ত করার এবং সে অনুযায়ী লেখাও সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি করা সম্ভব হয়নি। ছড়াকারদের ক্ষেত্রেও গুচ্ছ ছড়া প্রকাশের পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে।

সংকলনে সূচি তৈরিতে আমরা যতদূর সম্ভব সম্মানিত লেখকদের বয়সানুক্রমকে প্রাধান্য দিয়েছি। পূর্ণাঙ্গ সূচিটিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে, প্রত্যেক বিভাগে নবীণ-প্রবীণ লেখকদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। জানার সীমাবদ্ধতায় এখানে ত্রুটি থাকা অমূলক নয়। আশাকরি সবাই বিষয়টিকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যতদূর সম্ভব একটি উপস্থাপনযোগ্য সংকলন পাঠকদের হাতে তুলে দিতে আমাদের ইচ্ছের অন্ত ছিল না। তবুও, মুদ্রণ প্রমাদসহ আরো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো থেকে গেল, তার দায়ভার আমরা কাঁধে নিচ্ছি। এ ব্যাপারে পাঠকদের যে কোনো পরামর্শ আমাদের কাজে লাগবে।

সংকলনভুক্ত সকল লেখকের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। তাঁদের সহযোগিতা না পেলে এই সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। সংকলনটি প্রকাশের ব্যাপারে আমরা অসংখ্য মানুষের পরামর্শ, মতামত, সহযোগীতা পেয়েছি– তাদের সবার কাছে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষত অনার্য পাবলিকেশন্স লি., ঢাকা-র প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার কারণে এটি প্রকাশ করা সহজ হয়েছে আমাদের জন্য। অনার্যকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বিলেতে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি উত্তরোত্তর আরো সমৃদ্ধ হোক, উদ্ভাসিত হোক আপন আলোয়।

সূচিপত্র

■ প্রবন্ধ - ১১ ■ কবিতা (প্রথম পর্ব) - ৫৯
■ গল্প (প্রথম পর্ব) - ৮১ ■ কবিতা (দ্বিতীয় পর্ব) - ১৪১
■ গল্প (দ্বিতীয় পর্ব) - ১৬৩ ■ ছড়া - ২১৯

প্রবন্ধ

১১ সালেহা চৌধুরী – আমি কেমন বাংলাদেশ চাই
১৭ হামিদ মোহাম্মদ – অনাবাসী সাহিত্য– একটি পর্যালোচনা
৩০ সুজাত মনসুর – সাম্প্রদায়িকতা ও আমাদের দায়বদ্ধতা
৩৫ ফারুক আহমদ – তথ্যচিত্রে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রবাসীদের কৃতিত্ব ছিনতাই
৩৯ ড. মুকিদ চৌধুরী – ধ্রুপদী জার্মান সাহিত্য
৫৯ উদয় শংকর দুর্জয় – বই : সৃজনশীল মননের চিরকালীন সঙ্গী

আমি কেমন বাংলাদেশ চাই
সালেহা চৌধুরী

আমার লেখাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করেছি: ১. বাংলাদেশের কোন কোন পরিবর্তন আমার কাম্য এবং ২. সেই পরিবর্তনের অসুবিধা কোথায়।

১. দূর্নীতিমুক্ত– আমার প্রথম দাবি হবে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। যখন দেখা যায় নানা সব দুর্নীতিতে ভরে গেছে আমার সোনার বাংলা বড় কষ্ট পাই। চোখে খুব সমস্যা। গেলাম লন্ডনের চোখের ডাক্তারের কাছে। তিনি বললেন– আপনি কি ড্রপ ব্যবহার করছেন? বলি– আমি বাংলাদেশে থাকতে আমার লন্ডনের চোখের ড্রপ শেষ হলে আমি বাংলাদেশের বানানো চোখের ড্রপ ব্যবহার করি। তিনি শিশিটি দেখে বলেন এতো অনেক আগেই মেয়াদ শেষ করেছে। এই ড্রপ আপনার চোখের সমস্যা করেছে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া ওষুধ, খাবার, পানীয় আমাদের যে কী পরিমাণ ক্ষতি করছে তা বলে শেষ করা যাবে না। একবার দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ দৈ নিয়ে হৈ চৈ করাতে যেটা জানতে পারলাম সেটা এই এসব ওদের কাছে কোনো বড় ব্যাপার নয় এবং অনেকেই এর মানেই জানে না। মানে 'এক্সপায়ারি ডেট' বলতে কী বোঝায় তার মানে। আমি বোকা হয়ে ফিরে এলাম। আরো দু-একটি দোকান ঘুরেও মেয়াদ ও সময় মধ্যে রাখা দৈ পেলাম না। আশাকরি পাঠক আপনাদের এমন অভিজ্ঞতা আছে। খাবারে, জীবনযাপনে এই ভেজালের প্রতিভা আমাদের জীবন প্রদীপের আলো কমিয়ে ফেলছে। ক্যান্সার এখন ঘরে ঘরে।

এ ছাড়া বড় বড় দূর্নীতি ধরবার জন্য দুদক আছেন। আমেরিকা গিয়ে জানতে পারি অনেকেই বাংলাদেশের টাকায় ওখানে বাড়ি কেনেন। কীভাবে নিয়ে যান? অনেক উপায় আছে বলে শুনেছি। আরো নানা ধরনের দূর্নীতিতে দেশ ছয়লাপ। আশাকরি একদিন দেশ টাকা পাচারের দুর্নীতি থেকে মুক্ত হবে। মহামারি নিয়ে যেসব দুর্নীতির কথা জানতে পারছি তাতে এটাই মনে হয় এই মহামারি আমাদের বদলাতে পারেনি। তাহলে কী পারবে। ফেসবুকে একজন লিখেছেন– 'আগে বিদেশিরা

আমাদের সম্পদ নিয়ে যেতেন এখন আমরা নিজেরাই বিদেশে সম্পদ রেখে আসি। ‘বছরের সেরা ‘কোটেশন’।

২. বাসস্থান– আমার এর পরের দাবি মানব অধিকার। যদি আমরা দেশের মানুষকে মানুষ মনে করি তাহলে সকলের বাঁচার ন্যূনতম শর্ত মানতে হবে। শর্ত কী? মাথার উপরে ছাদ, খাবার ও চিকিৎসা। জানি বলা যত সহজ কাজে পরিণত করা তত সহজ নয়। তবে পৃথিবীতে অসম্ভব বলে নাকি কিছু নেই। আশা করব সেটা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সকলের বাড়ি হবে। কাজটি সহজ নয়। দেশে যত বাড়ি বানানোর কারবারি বা ডেভেলপার আছেন তাদের সকলকে যদি এই দায়িত্বের কিছুটা দেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়? যিনি বড় ও বেশি বাড়ি বানান তিনি বানালেন বেশি সংখ্যায় এরপর আয় অনুসারে ডেভেলপারের বাড়ি বানানোর সংখ্যা কমতে পারে। হয়তো জায়গা সরকারের কিছু বাড়ি তারা করলেন। মাথার উপরে সকলের ছাদ হোক এমন ভাবনা সুখের। ব্রিটেনে সকলের মাথার উপর ছাদ আছে। তবে অনেকে কার্ডবোর্ড বাকসে রাত্রিযাপন করেন। যাদের নিয়ে প্রিন্সেস ডায়ানার ভাবনার অন্ত ছিল না। এদের অনেকের ছাদ হয়েছে। এবং এ নিয়ে কাজ চলছে। নিজেদের স্বভাবদোষে অনেকের ছাদ নেই। ‘সাইডারের’ বোতল হাতে ঘোরেন কিছু মানুষ।

৩. চিকিৎসা– আমাদের দেশে অনেক বড় বড় হাসপাতাল আছে। তবে সেসব হাসপাতালে কয়জন যেতে পারে? আকাশচুম্বি খরচ সেখানে। আমি দেশে অসুখে পড়ব ভাবতে আতঙ্কিত হই। এসব হাসপাতালের ব্যয়ের কোনো নিয়ম নেই। যার যা ইচ্ছা তিনি তেমন টাকা নেন। যে বেতন সকলে পায় বা যা একজনের আয় তা দিয়ে এসব হাসপাতালের খরচ সামলানো সহজ নয়। এসব খরচ কোথায় থেকে আসে তারও হিসাব নেওয়া দরকার। দুদক প্রশ্ন করতে পারেন– এই যে তিরিশ লাখ টাকা আপনি খরচ করলেন সে টাকা কোথায় থেকে এলো? এ্যান্ড্রু কিশোর নাকি চিকিৎসা করতে নিজের ফ্লাটটি বিক্রি করেছিলেন। এমন ঘটনা সকলের জীবনেই আসতে পারে। সরকার যদি নিয়ম করে দেন কতটা খরচ ন্যায়সংগত এবং হাসপাতাল ইচ্ছা করলেই বিশাল অঙ্কের টাকা নিতে পারবে না, তাহলে হয়তো কিছু একটা হতে পারে। আর গরিবের হাসপাতাল বা বিনা খরচে হাসপাতাল? সেখানকার চেহারা ও পরিস্থিতি বড়ই করুণ। মনে হয় না কোন মানুষ এখানে চিকিৎসা নিতে আসে, আসে মানুষ নামের প্রহসন। এসবের উন্নতি এবং সবকিছুর যদি মান নির্ধারণ হয় তাহলে হয়তো খানিকটা ঠিক হতে পারে। সামান্যতম স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম মানে না অনেক জায়াগায়। মান বা স্টান্ডার্ড একটি প্রয়োজনীয় শব্দ।

ভুল চিকিৎসা, ভুল ওষুধে প্রাণ যাওয়া বন্ধ হোক। আর কেউ যদি এমন করেন তার বিচার হোক। একজনকে ভুল চিকিৎসায় মেরে ফেলার সাজা হোক।

৪. সংস্কার নিচ থেকে উপরে উঠুক উপর থেকে নিচে নয়– এখানেও সেই প্রশ্ন যারা নিচের দিকে অবস্থান করেন তাদের যদি মানুষ মনে করা হয় তাহলে পরিবর্তন সম্ভব। আয় ও ব্যয়ের ভেতরে মিল। যিনি নিচের দিকে তাদেরও সপ্তাহে একদিন ছুটি দরকার। বাংলাদেশে গার্ডের কোনো ছুটি নেই। তারা দিনে বিশ ঘণ্টা কাজ করেন কখনো এবং তাদের সপ্তাহের ছুটি থাকে না। এমনকি ঈদেও ছুটি নেই। গার্ড মানে সেসব লোক যারা আমাদের বাড়ির সামনে বসে থাকেন, দেখলেই সালাম দেন ও গেট খোলেন আর বন্ধ করেন। এক ধরনের 'রোবট' তারা। ঢাকায় এমন কিছু মানুষ দুঃখের কথা বলেছিলেন। এরপর থেকে ভাবনায় আছি। আমি কেবল এক শ্রেণির চাকরিজীবীর কথা বললাম। সব চাকরিজীবীদের ব্যাপারে নিয়ম এক হোক। আর বেতনের একটি ন্যূনতম মান থাক। দেশ সংস্কার নিচ থেকে উপরে যাক উপর থেকে নিচে নয়। আলো উপরে উঠুক।

যে লোকটি রাস্তা ঠিক করেন তাদের পায়ে বুটজুতো হোক। আমি অনেককে খালি পায়ে কাজ করতে দেখেছি। পা হারানো মানে কি? এরপর ভিক্ষা করা।

৫. শিক্ষা কেবল ডিগ্রি নয়– শিক্ষা হোক মানুষের জীবনের সেই হাতিয়ার যা দিয়ে সে সবকিছু বুঝতে পারে। শিক্ষা কেবল ডিগ্রি নয় বা চাকরি পাবার টুল নয়। শিক্ষা হোক আলোর মতো। লন্ডনে আমার বাগানের মালি আমাকে 'ডিলন টমাস অমনিবাস' উপহার দেন, 'হান্ডিম্যান' বা মিস্ত্রি সাহিত্যের ও রাজনীতির কথা বলেন। শিক্ষার আলো সবখানেই অল্পবিস্তার চোখে পড়ে। ব্রিটেনে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বাজারের বিল মেটানো বা অন্যরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া নতুন কথা নয়। তাদের মূল্যবোধ অনেক আগে বদলেছে। ওদের চরিত্র শব্দটি আমাদের চরিত্র শব্দটির সঙ্গে মেলে না।

৬. মানুষের চিন্তার পরিবর্তন হোক– কেবল মাত্র চিন্তার পরিবর্তনে বদলে যেতে পারে দেশ। দেশ উন্নতি বলতে কেবল বড় বড় রাস্তা আর দালানকোঠা নয়। পরিবর্তন হোক এমন ভাবনার। আমরা যেন কেবল সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি পিছনে নয়। করোনা ভারতের কেরালায় তেমন থাবা দিতে পারেনি তার কারণ তাঁদের উন্নতির প্রধান কথা ছিল চিন্তার উন্নতি। কোন একজন মনীষী বলেছেন– 'চেঞ্জ ইয়োর থট এ্যান্ড ইউ চেঞ্জ দ্য ওয়ার্লড'। একটু আগে আমি বলেছি আমাদের সমাজে নতুন কোন মূল্যবোধ আজো এসে পৌঁছায়নি। অফিসের ঘুষখোর সাহেব

চরিত্রহীন নন। চরিত্রহীন সেই জন যিনি তার মহিলা সহকর্মীর সঙ্গে তরল কথা বলেন বা হৃদয় নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন বা হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। ঘুষখোর চরিত্রহীনতা এবং পরেরগুলো চরিত্র দুর্বলতা।

৭.বই পড়ার অভ্যাস– চিন্তার পরিবর্তনের হাতিয়ার হলো বই। যে যত বই পড়বেন তিনি তত আলোকিত হবেন। ঈদের দিনে বা জন্মদিনে কেবল ভালো ভালো পোশাক কেন ভালো ভালো বইও দেওয়া যেতে পারে। এমন অনেক বাড়ি দেখেছি যেখানে নানা প্রকার ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, ঘরে ঘরে প্যাসেজে, বারান্দায় টেলিভিশন দেখেছি কিন্তু বই দেখিনি। এখন চোখে পড়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ যা অনেকের সময় কেড়ে নেয়। একজন মনীষী বলেছেন– এই কম্পিউটার করতে করতে আমাদের ছেলেমেয়ে একদিন তেমন কিছু শিখবে না। ওরা মূর্খ হবে। রংপুরের বিশাল লাইব্রেরিতে এখন কেবল মাকড়সার জাল। লাইব্রেরি কোনোমতে টিকে আছে ম্যাগাজিনের কারণে। বাংলাদেশের সব লাইব্রেরির সংস্কার হোক। আমি এই ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সার্ত্রে বলেন– লাইব্রেরি আমার মন্দির, মসজিদ, চার্চ। আর বই আমার ধর্ম। (ওয়ার্ডস)

৮. লোভ বা অপরিমিতি– গান্ধিজী একবার বলেছিলেন এই পৃথিবীতে যা আছে তা আমাদের প্রয়োজনের জন্য অনেক। কিন্তু লোভের জন্য অনেক নয়। অনেকে বলতে পারেন – গান্ধিজির কথা বাদ দেন। ওঁর মত লেংটি পড়ে আমরা থাকতে পারব না। তা ঠিক। কিন্তু তাঁর কথায় কিছু সত্যও আছে। তাইতো কারো দশটা বাড়ি কারো একটি চালাও নেই। সম্পদের সুনিপুণ বণ্টন হয়তো মার্কসবাদীদের কথা কিন্তু লোভের লাগাম টেনে ধরা সকলের জন্য মঙ্গল। আর অপরিমিত খরচ না করা। কতটুকু সম্পদ আমাদের থাকবে তার একটা নিয়ম হোক। গয়নার পর গয়না, শাড়ির পর শাড়ি, সম্পদের পর সম্পদ, টাকার পর টাকা, বাড়ির পর বাড়ি, বিয়ের বাজার করতে লন্ডন, আবুধাবী। এসবেরওতো কিছুটা নিয়ম থাকা উচিত। কসফুসিয়াস বলেছেন– যে মানুষ একটা পাহাড়কে সরাতে চায় সে শুরু করে কেবল একটা ছোট পাথর সরিয়ে। কাজেই সকলে যদি এসব পর্বত প্রমাণ প্রাচুর্য কমাতে চান তাহলে অল্প অল্প করে শুরু করতে পারেন এবং সবকিছু বদলে যেতে পারে পাথর সরানোর মতো অল্প কিছু থেকে।

৯ 'প্রাইড অফ পারফরমান্স' বা কে কত সুন্দর করে একটা কিছু শেষ করলো তা স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় দেশে একটা ব্রিজ না বানিয়ে বা একটা রাস্তা শুরু না করেই টাকা নেওয়া হয়। সেসব থেকে মুক্ত হোক দেশ। যেসব এ্যাওয়ার্ড

বা পুরস্কার দেওয়া হয় তা যোগ্য লোকদের দেওয়া হোক। পুরস্কার দেওয়ার পর আবার কেড়ে নেওয়া থেকে এই প্রমাণিত হয় যারা পুরস্কার দেন তারা কোনো কিছু চিন্তা করেন না। কাজেই এখানেও একটা বড় সংস্কার প্রয়োজন।

মূলকথা আমাদের থাকতে হবে মাথার উপর ছাদ, পেটে ভাত ও অসুখের চিকিৎসা। এ ছাড়া মানুষ পাবে মানুষের অধিকার। এতে খানিকটা সমাজতন্ত্রের চর্চা হতে পারে। কিন্তু তাতে অসুবিধা কী? কানাডা তো সমাজতন্ত্রের দেশ। কী সুন্দর সবকিছু সেখানে।

এবার দেখা যাক আমাদের দেশের উন্নতিতে বাধা কোথায়?

১. ঘন জন বসতি। বাংলাদেশে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে বারো শ বায়ান্ন জন বাস করেন। এ হলো পৃথিবীর ভেতর সব চাইতে ঘনবসতিপূর্ন দেশ। কাজেই যে বাড়িতে দুইজন সন্তান আর যে বাড়িতে দশজন তার ভেতরে ফারাক অনেক। আমাদের পরে যে দেশ ঘনবসতিপূর্ণ সেটা একসময় ছিল লেবানন। সেখানে প্রতি স্কোয়ার কিলোমিটারে পাঁচশো পচানব্বই জন। কানাডায় চারজন, অস্ট্রেলিয়ায় ৩.১ জন। এভাবে খুঁজলে দেখা যাবে যে সব দেশগুলো মানবাধিকারে সমৃদ্ধ তাদের লোকসংখ্যা কম। এই অনেক মানুষ আমাদের উন্নতির বড় বাধা। তবে আমরা আশা করব একদিন এই মানুষ সম্পদে পরিণত হবে। অনেক কলকারখানায় এদের কাজ থাকবে। চাষাবাস ছাড়াও আরো নানা কাজ। পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ এলাকায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে 'অর্থনৈতিক অঞ্চল'। যেখানে দশ হাজার লোকের কর্মসংস্থান থাকবে। এমন অর্থনৈতিক অঞ্চল আরো প্রতিষ্ঠিত হোক। বিদেশে যারা কাজ করতে যান তারা বিদেশ থেকে টাকা পাঠান। এই 'রেমিটান্স' সরকারের বড় আয়। এই 'বিদেশিদের' দেশের লোক মনে করবেন।

২. আর একটি বাধা আমাদের দেশের ভৌগলিক অবস্থান। যে কোনো সময় বান তুফানে আমরা ভেসে যেতে পারি। মনে হয় ঈশ্বর বার বার নানা বিপদ দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করেন। এসবের উপরে মানুষের হাত থাকে না। উন্নতির বাধা এসব প্রাকৃতিক ব্যাপার। তবে আশার কথা একটি খবরে এমন– বিশ্বসেরা চিন্তাবিদের তালিকায় তৃতীয় স্থানের মর্যাদা লাভ করেছেন বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম। জলবায়ূ পরিবর্তনের সৃষ্ট সমস্যার বাস্তব সমাধানের উপায় নিয়ে কাজ করে ব্রিটিশ ম্যাগজিন প্রসপেক্ট-এর ৫০ জন চিন্তাবিদের তালিকায় শীর্ষ দশে তিনি স্থান করে নিয়েছেন। কাজেই তিনি আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে কাজ করবেন, বাড়িঘর বানানোর এবং অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দেবেন এ ভাবনায় স্বস্তি। এমন হিরে মানিক আরো আছেন।

৩. আমাদের দেশে মানুষের আর ও একটি চিন্তা এমন– রাস্তায় লোকটা গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে? ওর ভাগ্যেই এমন ছিল। এই ভাগ্যকে বিশ্বাস করে অনেকে অনেক কিছু মেনে নেয়। মানুষকে আরো যুক্তিপূর্ণ হতে হবে। রাস্তায় এই মানুষ শেষ হওয়ার আসল কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং এর সমাধানও। এমনিভাবে খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি সবকিছুর সমাধানই হতে পারে। একজন ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দিলে কেমন হয়? এবং সঙ্গে সঙ্গে।

৪. আমাদের দেশে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকতে পারে যে দল সরকারের সুষ্ঠু সমালোচনার মাধ্যমে দেশকে আরো উন্নত করতে সাহায্য করতে পারেন। ব্রিটেনের 'দি ইকোনমিস্ট' পত্রিকা বলেন– বাংলাদেশ এক দলের দেশ। এর পরিবর্তন হওয়া ভালো। আশা করি শক্তিশালী বিরোধীদল দেশকে গঠনমূলক কাজে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং সঠিক সমালোচনা করবেন, কেবল নিন্দা নয়।

৫. আর সকলের থাকতে হবে সেই ভালোবাসা যাকে বলা হয় দেশপ্রেম।

এখন কথা হলো এসব কারা করবেন? কেবল দেশ নেতারা নয়। এর সঙ্গে আমরা সকলে। আমরা যারা মহামারির চাল-ডাল-তেল চুরি করি তারা। আমরা যারা লোভের শিকার হই। আমরা যারা ভাগ্যে এমন ছিল বলে সবকিছু মেনে নেই। আমরা যারা আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে বলে রাস্তায় মৃত্যুকেও 'নাথিং' ভেবে থাকি। বলতে পারেন কেউ কেউ– আমরা তো খুবই সামান্য একজন? দেশ পরিবর্তন কেমন করে করব? ডালাইলামা বলেছেন, 'ইফ ইউ থিংক ইউ আর টু স্মল টু মেক এ ডিফারেন্স, ট্রাই স্লিপিং উইথ এ মসকিউটো।'

পাহাড় সরাতে হবে? একটি নুড়ি সরানো দিয়েই শুরু হোক।

অনাবাসী সাহিত্য– একটি পর্যালোচনা

হামিদ মোহাম্মদ

মূলধারায় অনাবাসী বাংলা সাহিত্য মূলত একটি অনালোচিত বা মূল্যায়নহীন ধারা। গত একশ বছর এর চলমানতা। অথচ এ নিয়ে বিশেষজ্ঞমহল অনেকটা নিস্পৃহই বলা যায়। কেন নিস্পৃহ তার উত্তর খোঁজার সময় এসেছে।

আমরা দেখেছি, এই অনাবাসী বাংলা সাহিত্য মূলধারার পুষ্টি বর্ধন করেই গতিশীল একটি স্রোতধারা বাহিত একটি উর্বরক্ষেত্র নির্মাণ করে অগ্রসরমান। তবে এর আগে অনাবাসী সাহিত্যের সংজ্ঞায়ন জরুরি। ক্রমান্বয়ে যে জগত বা ভূ-ভাগ সৃষ্টি হচ্ছে, তার চরিত্র ও পরিচয় নিধার্রণ না হলে হিসেবের মাপকাঠিতে তলানিতে থেকে যাচ্ছে–যার আলাদা কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমরা অনাবাসী বাংলা সাহিত্যের সেই কণ্ঠস্বরই খুঁজে নিতে চাই।

অনাবাসী সাহিত্য চিহ্নায়িত বিশ্বসাহিত্যে বা উপমহাদেশীয় সাহিত্যে বিরল নয়। অনাবাসী বা অভিবাসী বা ডায়াস্পরা এই তিনটি শব্দের অর্থ এতো কাছাকাছি–যা আলাদা করা খুব সহজ। এর গূঢ়ার্থে রয়েছে মানববিশ্বের মাইগ্রেশন সম্পর্ক। আমরা ইতিহাসের দ্বারস্থ হলেই এর চরিত্র, তার বিকাশ এবং জেগে ওঠা তথা আত্মপরিচয়ের খোঁজ পাব।

আমরা জানি, অভিবাসন চিহ্নায়িত করতে এক্সাইল, মাইগ্রেশন, এক্সোডাস ও ডায়স্পরা এই ৪টি শব্দের কাছে আমাদের দাঁড়াতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে নিকটার্থক হলেও শব্দগুলো সমার্থক নয়। একেকটি শব্দের পিছনে কিছু না কিছু ইতিহাস রয়েছে– যার সাথে মাইগ্রেশন সম্পর্ক বিদ্যমান। এই সম্পর্কগুলো তৈরি হয়েছে কাল ও স্থানিক নানা কারণে। স্বেচ্ছা মাইগ্রেশন, জোরপূর্বক মাইগ্রেশন, উচ্ছেদ এবং বিতাড়ন বা নির্বাসন। তবে সবগুলো ধারা এক সময় স্থিতাবস্থায় পৌঁছে এবং নিয়ত আত্মপরিচয় সন্ধান থেকে একটি নিজস্ব কণ্ঠস্বর নির্মিত হয়– যা তাদের ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষাও বটে। তখন জাগ্রত কণ্ঠস্বরই অনাবাসী সাহিত্য হয়ে ওঠে।

বিশিষ্ট সাহিত্য ও ইতিহাস গবেষকরা একে চিহ্নিত করেছেন এভাবে– এক্সাইল-এর সাদামাটা অর্থ নির্বাসন। সেটা স্বেচ্ছানির্বাসন হতে পারে, আবার কর্তৃপক্ষীয় বলপ্রয়োগকৃত নির্বাসনও হতে পারে। নির্বাসনের স্বাধীনতাহীনতা, জবরদস্তি, রাজনৈতিক ধর্মীয় মতভিন্নতা, সাম্প্রদায়িক অসহনীয়তা, নির্যাতন নিপীড়ন ও বাস্তুচ্যুতির মতো ধারণাসমূহ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মাইগ্রেশন মূলত আর্থসামাজিক শ্রেয়-ভূমির সন্ধানে বহির্গমন যার সঙ্গে এক্সাইল-এর নেতিবাচকতা অপরিহার্যভাবে জড়িয়ে নেই। এক্সোডাস-এর পিছনে রয়েছে নতুন ভূমির উদ্দ্যেশে যূথবদ্ধভাবে দেশত্যাগ বা স্থান ত্যাগ। এর সাথে ঐতিহাসিক ধর্মীয় নিপীড়নের যোগসূত্র আছে। যেমন খ্রিষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে মিশর থেকে ইসরাইলিদের দলবদ্ধ অভিনিষ্ক্রমণ দ্য এক্সোডাস নামে পরিচিত। অন্যদিকে, ডায়াস্পরা শব্দটি জন্ম থেকে এতোটা অর্থ পরিবর্তন করেছে যে, তা এখন বহু অর্থবোধকই নয়– বাকি তিনটি শব্দের বহু ধারণাকেই এককভাবে ধারণ করে। শব্দটি গ্রিকরা ব্যবহার করেছিল উপনিবেশিকায়নের যুগের শুরুতে। ডায়া অর্থ দূরে, অন্যত্র কোথাও এবং স্পারিয়া অর্থ বীজ বপন করা। কলোনিয়ানরা যখন ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই ছড়িয়ে পড়ার বা বীজ বপন থেকেই এর উৎপত্তি–যা ভৌগোলিক দখলদারিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, বর্ণসংকরতা, সংস্কৃতি সংকরতা যুক্ত হলো।

এসব দ্রুত ঘটতে থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল ও এর পরবর্তী অভিন্ন ঘাত থেকে। আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে আমেরিকায় মানব পাচার, বিক্রি এবং দাস প্রথার প্রচলন ও এর নিষ্কৃতির মাধ্যমে পরবর্তীতে আর্থসামাজিক উন্নত জীবন সন্ধানের প্রক্রিয়ার ভেতর গড়ে ওঠে একটি বিশ্ব। এসব মানবযাত্রার গত একশ বছরের ইতিহাসে যে কণ্ঠস্বর জেগে উঠেছে, তাকেই সাদামাটাভাবে আমরা অনাবাসী সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত। সেই ধারায় বাংলা সাহিত্যও বিশ্বের দেশে দেশে বাঙালির অভিবাসী বা অনাবাসী জীবনের কণ্ঠস্বর হয়ে যুক্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায়।

এর দুটি ক্ষেত্র রয়েছে। একটি হলো– শুধু বিদেশি ভাষায় সাহিত্য রচনা, দেশি-বিদেশি পটভূমি। অন্যটি বিদেশে বসবাস, কিন্তু রচিত সাহিত্য বাংলা ভাষায়, পটভূমিও বেশিরভাগ বাংলাদেশ, বাঙালি জীবন ও সমাজ। তবে এ আলোচনা উদ্দেশ্য বাংলাদেশের কণ্ঠকে চিহ্নিত করা।

এ পর্বটিতে আমরা আলোচনা করতে চাই তিন ভাগে। একটি হলো– বাঙালি, কিন্তু ভিন্ন ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি। দ্বিতীয়টি হলো– বাংলাভাষা ও ইংরেজি দুটি ভাষায় রচনা

এবং তৃতীয়টি বাঙালি– বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি। আরেকটি বাঙালি নন অথচ বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি। এটি অপ্রাসঙ্গিক হলেও আলোচনা সমৃদ্ধ হওয়ার চিন্তা থেকে উৎসারিত।

প্রথমেই বাঙালি হিসেবে পাই বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজি ভাষার লেখক বিপিন চন্দ্র পাল ও নিরঞ্জন পাল। বিপিন চন্দ্র পাল উপনিবেশবাদী শাসনের ঘোর সমালোচনা করে অসংখ্য বই লিখেন। একই সময় নিরঞ্জন পাল ইংরেজি সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে জ্ঞানার্জন করে চলচ্চিত্র স্ক্রিপট রাইট ও চলচ্ছিত্র নির্মাণে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে পুষ্ট করেন, এমনকি তাকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের পথিকৃত আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

আতাউল করিম বিজ্ঞানি ও ইলেক্ট্রোবিজ্ঞান লেখক। সাম্প্রতিক বিশ্বে অনুকরণীয় কাজের তিনি বিস্ময়কর উদ্ভাবনীর স্রষ্টা। তাঁর গ্রন্থসমূহ– ডিজিটাল ডিজাইন: বেসিক কম্পিউটস এন্ড প্রিন্সিপালস, অপটিক্যাল কম্পিউটিং, কন্টিনিউয়াস সিগনালস এন্ড সিস্টেম উইথ ম্যাথল্যাব, ইলেকট্রো অপটিক্যাল ডিভাইসেস, ডিজিটাল ডিজাইন: এ প্রোগ্রামেটিক এবং উড়ন্ত ট্রেনের আবিষ্কারক, যা পানির উপর দিয়ে চলতে পারে।

গোলাম মুর্শিদ। গবেষণা সাহিত্যে খ্যাতিমান লেখক। গ্রন্থ– হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, কালান্তরে বাংলা গদ্য, কালাপনির হাতছানি-বিলেতে বাঙালির ইতিহাস, মুক্তিযুক্ত ও তারপর– একটি নির্দলীয় ইতিহাস, বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান, আশার ছলনে ভুলি। বিংশ শতকের শেষ পাদে ঔপন্যাসিক বা কথা সাহিত্যিক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছেন মনিকা আলী ও তাহমিমা আনাম।

মনিকা আলী ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস লিখে সুনাম কুড়িয়েছেন ব্রিটিশ মূলধারার সাহিত্যমহলে। বিষয়বস্তু বিলেতে অভিবাসী বাঙালির জীবন বৃত্তান্ত। উপন্যাসের নাম 'ব্রিক লেইন'।

একইভাবে তাহমিমা আনাম ইংরেজি ভাষার লেখক। ব্রিটিশ মূলধারার সাহিত্য মহলে প্রশংসিত ও নন্দিত লেখক। তাঁর উপন্যাস– 'এ গোল্ডেন এজ' এবং 'এ গুড মুসলিম'। প্রথম উপন্যাসটির কাহিনির পটভূমি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।এটি কমনওয়েথ রাইটার্স পুরস্কৃত। দ্বিতীয়টির পটভূমি মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক অভিঘাত। এছাড়া বিভিন্ন লিটারারি জার্নালে নিয়মিত গল্প প্রকাশিত হচ্ছে। দুজনই অপেক্ষাকৃত নবীন লেখক হলেও সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেই সুনাম কুড়িয়েছেন পশ্চিমা মহলসহ বাঙালি পাঠকদের। এরপর রয়েছেন জিয়া হায়দার রহমান একজন কথাসাহিত্যিক। বসবাস করেন ব্রিটেনে। 'ইন দি লাইট অব হোয়াট উই নো' তার

একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। মূলধারার বোদ্ধামহলে প্রশংসিত এই উপন্যাসটি ব্যাপক আলোচিত। কানাডাবাসী নেয়ামত ইমাম মূলধারার কথাসাহিত্যিক। বাংলাদেশি কানাডিয়ান লেখক হিসেবে খ্যতিলাভ করেছেন। তার গ্রন্থ 'দ্যা ব্লাক কোট' এবং 'এ কোয়াইল এন্ড কোয়াইরি'। 'দ্যা ব্লাক কোট' বহুল পঠিত এবং শীর্ষ স্থানীয় সাহিত্য আলোচকদের নজরে আসা সাহিত্যসৃষ্টি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন বইটির উপজীব্য বিষয়।

নুরুল ইসলাম ইতিহাস গবেষক। গ্রন্থ– প্রবাসীর কথা। এটি অন্যতম পাঠক প্রিয় গ্রন্থ। অভিবাসীদের জীবন সংগ্রাম বিধৃত গ্রন্থখানার পরিধিও বিশাল।

এভাবে ইংরেজ কবি ইউলিয়াম র‍্যাদিচে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা, তাঁর গবেষণা আমাদের জানা। আরেকজন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যপ্রেমিক নেদারল্যান্ডের পিটার কাস্টার। বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রয়েছে। এরকম আরো অনেক বিদেশি– যারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন নিয়ত।

একুশ শতকের শুরু, গত দুই দশকের ইংরেজি ভাষায় লেখালেখিতে যুক্ত, ব্রিটেনে আরো পাই ফারাহ্ নাজকে। ফারাহ্ নাজ একজন অনুবাদকও। অকাল প্রয়াত নজরুল ইসলাম নাজও ছিলেন অনুবাদক ও ইংরেজি ভাষার লেখক।

ফারাহ্ নাজের ইংরেজি কবিতার বই 'মায়া-মিরর অব সউল' উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙালি কবিদের কবিতার অনুবাদগ্রন্থ 'এন্থলজি' তে ফারাহ্ নাজের গুচ্ছ কবিতা পাঠক প্রিয়তায় পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গুবা পাবলিশার্স থেকে ছোটদের গল্পের বই 'টাইনি ঝাম্পসিং'এর বাংলানুবাদ' টাইনি ঝাঁপ দিল' এবং বিলেতের দি হিস্ট্রি পাবলিশার্স থেকে 'লন্ডন ফোকটেলস ফর চিলড্রেন' ১৬ জন গল্পকারের সাথে ফারাহ্ নাজের গল্প রয়েছে।

বাংলাদেশি বর্তমানে অনাবাসী হিসেবে চিহ্নিত বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে শীর্ষ লেখক যুক্তরাজ্যবাসী আবদুল গাফফার চৌধুরী, সর্বাধিক বরণ্য। তার কালজয়ী গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান, ডানপিঠে শওকত, নাম না জানা ভোর, নীল যমুনা, শেষ রজনীর চাঁদ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে 'পয়েটস অব পলিটিক্স' চলচ্চিত্রের নির্মাতা ও কাহিনিকার তিনি।

অন্যতম বরেণ্য বাঙালি রাজনীতিক কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব তাসাদ্দুক আহমদ সাংবাদিক। ষাটের দশকে থিতু হন লন্ডনে। বিলেতে বাংলা সংবাদপত্র বিকশিত হয়েছে এই গুণীজনের হাত ধরেই। জীবনের অভিজ্ঞতানির্ভর গ্রন্থ– জীবন খাতার কুড়ানো পাতা।

কাদের মাহমুদ কবি, কথাসাহিত্যিক এবং অনুবাদক। গ্রন্থ–কবিতা–কালের মোড়, উপন্যাস-অহিনকুল, কচ্ছপ, এক ধরনের শোক। অনুবাদ–বঙ্গের লোকসংস্কৃতি।

আবদুল মতিন। মূলত সাংবাদিক। গ্রন্থ– ইউরোপের দেশে দেশে, কাস্তে, জীবনস্মৃতি একটি বিশেষ অধ্যায়। জেনেভায় বঙ্গবন্ধু, রোমের উত্থান ও পতন, মহানগরী লন্ডন, মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি, ইউরোপের কথা ও কাহিনি, প্রবাসীর দৃষ্টিতে বাংলাদেশ, শামসুদ্দিন আবুল কালাম ও তার পত্রাবলি, জীবনীগ্রন্থ-শেখ হাসিনা। উপন্যাস– ধুসর পৃথিবীসহ অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা। ইসহাক কাজল গদ্যকার। গ্রন্থ– সুরমা উপত্যকার চা-শ্রমিক আন্দোলন: অতীত ও বর্তমান, বাঙালি ও বাংলাদেশ, জনক তুমি বাংলাদেশ, সিলেটের শিল্পী সাধক সংগ্রামী। সম্পাদনা করেছেন কয়েকটি গ্রন্থ।

শামীম আজাদ মূলত কবি ও স্টোরি টেলার। কবিতা– ভালোবাসার কবিতা, ওম, স্পর্শের অপেক্ষায়, জিয়ল জখম, একলা জেগে রই, কইন্না কিচ্ছা। উপন্যাস– রক্তবীজ। বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে বিলেতের মূলধারায়ও বিশিষ্ট হয়ে আছেন।

সালেহা চৌধুরীর গল্প, কবিতা এবং অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে গল্প– যখন নিঃসঙ্গ, উষ্ণতার প্রপাত, জন ও জোয়ীদের গল্প, শতগল্প। উপন্যাস– বিন্নি ধানের, আনন্দ, ময়ূরীর মুখ, শেষ মারবেলা, জারাখান ও শ্রেষ্ঠ প্রেমিক, অনিকেত মানব, ব্রিটেন একটি দ্বীপ। ইংরেজি– এ ব্রড ক্যানভাস, ইট গ্রউজ ইন মাই হার্ট। কবিতা– দেয়ালে ক্যাকটাস ফুল, হৃদয়ে পেণ্ডুলাম বাজে, চাঁদের আলোয় রাজকুমারি। অনুবাদ– সরল এনিরডিরা এবং তার ভয়ংকরী দাদিমা, বিয়াট্রিক্স পটারের গল্প, মানুষ ও ইঁদুর, নোবেল বিজয়ীদের দুই ডজন গল্প।

দেলোয়ার হোসেন মঞ্জু কবি ও কথা সাহিত্যিক। গল্প– তুলসিপত্র অথবা অভিজিত কুণ্ডুর অমুক্তগদ্য, অভিজিত কুণ্ডুর ১৯টি অ-গল্প, মানুষ ডায়েরি লিখতে জানে রাজ হাঁস জানে না। উপন্যাস– কাফের, জোৎস্নার বেড়াল, অনবদ্য ইতর। কবিতা– বিদ্যুতের বাগান, সাপ ও সূর্যমুখী, বিপুলা বীজ গণিত, মৌলিক ময়ূর, নীল কাব্যের বয়াত, ঈসাপাখি বেদনা ফোটে মরিয়ম বনে, ইস্পাতের গোলাপ।

মুজিব ইরম কবি ও কথা সাহিত্যিক। কবিতার বই– মুজিব ইরম বনে শোনে কাব্যবান, ইরম কথা, ইরম কথার পরের কথা, সাং নালিহুরি, ইতা আমি লিখে রাখি, এক যে শীত ও অন্যান্য গপ এবং পাঠ্য বই। উপন্যাস– (ট্রিলজি) আউট বই [বারকি, মায়াপীর ও বাগিচাবাজার]।

মাহমুদ এ রউফ। ইতিহাসভিত্তিক লেখা বই– লন্ডনের স্মৃতি, তৃতীয় বাংলায় মুক্তিযুদ্ধ এবং ব্রিকলেইন ও বাংলা টাউন।

ফারুক আহমদ মূলত গবেষণা সাহিত্য রচনা করেন। তার গ্রন্থ– এ মাটির বাউল, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি, বিলেতে বাংলা সংবাদপত্র, বিলেতে বাংলার রাজনীতি এবং বিলেতের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা। উর্মি রহমান মননশীল লেখক। বই 'সাত সমুদ্র তের নদী, অতিথি, আবিদের সময়, ব্রিকলেন, সমান্তরাল, নারীমুক্তির প্রশ্নে, পাশ্চাত্য নারী আন্দোলন।

হামিদ মোহাম্মদ কবি, কথা সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। গ্রন্থ– কবিতাঃ স্বপ্নের লাল ঘুড়ি,আমার মৃত্যুর পর কোনো শোকসভা হবে না, উড়াল পাখি, তোমার অনিন্দ্য নাম। গল্পঃ হৃদয়ে রঙধনু, লাল গোলাপ, উপন্যাসঃ কালো দানব, মাতাল বাঁশি, পঙ্খিরাজ, পাথরকন্যা, জাহাঙ্গীর ডর, পরিবানু, স্কোয়াটিং। নিবন্ধঃ শিকড়-এর দিনগুলি ও অন্যান্য, নন্দিত ভুবনে, বিলেতের সাহিত্য–১, রুপালি সোনালি মাটি, বিলেতের সাহিত্য–২ বিশেষ গ্রন্থ– কবিতা সমগ্র-১। প্রেমের কবিতা।

আতাউর রহমান মিলাদ কবি ও গল্পকার। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে কবিতা– দুঃসময়ের চিৎকার, হৃদয়ের জানালা খুলে, আর যদি একটা গুলি চলে, কবিতার চেক বই, স্মৃতিহীন অচিন আঁধার ও স্বরচিত অন্ধকার। গল্পের বই– তোমার দেয়া দু:খ, স্বপ্ন ও ছায়া। শাহ শামীম আহমদ কবি। তার কবিতার বই– জলরঙা দিন। গাজিউল হাসান খান। সাংবাদিক। উপন্যাসঃ বিপন্ন জনপদ, প্রবন্ধঃ ইতিহাসের অনুঘটক।

মিল্টন রহমান কবি গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। তার গ্রন্থসমূহ– কবিতা– চূর্ণপক্ষ, স্নোড্রপ চুম্বনেরা, নিষঙ্গ, চূর্ণকাল, গল্পগ্রন্থ– নাকশাপুরাণ, ব্রুটাস পর্ব ও কর্তার শারীরিক অবনতি, প্রবন্ধগ্রন্থ– শহীদ কাদরী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, গবেষণা গ্রন্থ– ইউরোপে বিশ শতকের লিটলম্যাগ আন্দোলন। গল্পগ্রন্থ– মুক্তিযুদ্ধের গল্প। মুকিদ চৌধুরী কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার। নাটক– রাজাবলি, মননশীল বই–ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ড সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, একটি আষাঢ়ে গল্প, অচিন দ্বীপের উপখ্যান। মাসুক ইবনে আনিস। কবি। কবিতার বই– অর্কের অধিবাস, অলৌকিক মাসুকনামা, যদি বিদ্রোহ করি, অবশিষ্ট শূন্য এক।

ময়নূর রহমান বাবুল কবি ও গল্পকার। তার বই গল্প– প্রত্যাশার ধ্বনি, জলে নীল বিষ, নিগূঢ় পরম্পরা। কবিতা– স্বদেশ আমার মা আমার, বিন্দু আমার বৃত্ত, হ্যাঁ, জয়যুক্ত হলো।

সাগর রহমান মূলত গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তার গ্রন্থ– গল্প-খড়িমাটির দাগ, উপন্যাস– উড্ডয়নসূত্র, হিঁদোল চোরা, কৃষ্ণপক্ষের দিন রাত্রি, কৈন্নরী উপাখ্যান, দুইভূত অদ্ভুত, টুপটাপের বাড়ি ফেরা, ছায়াডিঙি। অনুবাদ– 'ঘুম' মূলঃ হারুকি মুরাকিমি; দ্য ওয়ান্ডারফুল স্টোরি অব হেনরী সুগার, মূলঃ রোয়াল্ড ডাল।

সাঈম চৌধুরী কথাসাহিত্যিক। গ্রন্থ– অথবা অপুরুষ এবং অদ্যনীল।

আনোয়ার শাহজাহান গদ্য লেখক। তার গ্রন্থ–গোলাপগঞ্জের ইতিহাস এবং 'স্বাধীনতা যুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা' দুই খন্ড, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও সৌধ।

সৈয়দ হিলাল সাইফ মূলত ছড়াকার। গ্রন্থ– হাহ্ হা, হিলাল সাইফ ডটকম, খোঁচাকথা, জগাখিঁচুড়ি, সৈয়দপুর আমার গ্রাম।

নুরুজ্জামান মনি কবি ও গল্পকার। গ্রন্থ– রাজার টোপর পড়ে গেছে ও গ্যাচাং গ্যাচ।

ইকবাল হোসেন বুলবুল কবি। কবিতার বই– তোমার সীমানার বাইরে নরক, সুখহীন এই সুখের সাথে, বাতিহীন তিমির নিশি।

আবু মকসুদ কবি। বই– বিবিধ মৃত্যুর রঙ, আনসার মাঠে বিকেলের রঙ, ন'টার ট্রেন ক'টায় ছাড়ে, মিথ্যাবাদী রাখাল ছেলে, একটি গুল্লি।

গোলাম কবির কবি। গ্রন্থ– হে সময় হে বন্য শক্ররা ও অদৃশ্য অবয়ব। রেণু লুতফা কবি ও নিবন্ধকার। গ্রন্থ– ইতরের মতো সত্য, হে ঈশ্বর তোমার যবনিকা, জীবন বলাকা, কালের কণ্ঠ, স্পর্ধিত আত্মবোধ, যেতে দিতে পারি না।

রব্বানি চৌধুরী ছড়া ও গল্পকার। ছড়াগ্রন্থ– যন্ত্রণা মন্ত্রণা, পাপাডাম, লন্ডনের ছড়া, ছড়ার বাঁশি, সিংহ মামার আমি, চাঁদ দেখতে গিয়েছিলাম, পদ্মফুলের পুকুর লাল, কবিতা– টেমস পাড়ের কাব্য, তবুও তোমার আওয়াজ শুনি। গল্প– তান্দুরি সমাচার, রঙ্গলীলা। উপন্যাস– টেমস পাড়ের উপাখ্যান।

সালেহা বড় লস্কর। গল্পকার। বই 'কুসম্ভা, হৃদয়ে পদ্মা অদূরে টেমস। কবিতার বই 'বলাকারা চিরদিন ওড়ে'।

সৈয়দ দুলাল। গীতিকবি। গ্রন্থঃ হিংসাখোরের জবানবন্দি, কী মায়া লাইগাইলায়।

সৈয়দ শাহীন কবি ও গল্পকার। বইঃ ঘর ছাড়া ঘর, উজানে স্বজন খুঁজি।

দিলু নাসের। মূলত ছড়াকার। বই বিষ কামড়, বিশ্বগ্রাম, মুজিব নামের অর্থ, রাজাকারনামা, শাহবাগের ছড়া, ছড়ায় ছন্দে বাংলার ইতিহাস।

আনোয়ারুল ইসলাম অভি। কবি। 'ঝাউগাছ কান্দে ঘরকন্যার লাগি, ভ্যালেন্টাইন।

নজরুল ইসলাম বাসন। সাংবাদিক। বই– শিকড়ের স্মৃতি, অলৌকিক রিপোর্টার, লন্ডনে মওলানা ভাসানী।

শাহ্ শামীম আহমদ। কবি। কবিতার বই 'জলরঙাদিন'।

শাহনাজ সুলতানা। কবি। বই– শূন্য করতল, ছায়া সংহিতা।

আবু তাহের কবি ও নাট্যকার। গ্রন্থ– মার শালাদের মার, তদবির, সংবর্ধনা, বিয়ের ঘণ্টা, পদই বাবু, রাজরোগ রাজভোগ, দূরতর গ্রহজীবন।

মোসাইদ খান– কবি। গ্রন্থ– জলের পেরেক, তালপাতার ঘোড়া, ভুলে ঘণ্টা।

শামীম আহমদ– কবি। তার লেখা কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তুষারে জঠরে অগ্নিবীজ, বাতাসের পায়ে শব্দের ঘুগুর, বিন্দু থেকে বৃত্ত, নপংসক নগরে,পথিক।

এ কে এম আব্দুল্লাহ্ মূলত কবি ও অনুগল্পকার। তার কবিতার বই 'মাটির মাচায় দণ্ডিত প্রজাপতি, যে শহরে হারিয়ে ফেলেছি করোটি, ইমেইল বডিতে সময়ের অনুবাদ, শাজরাত কাঠের ক্যারাভান ও আত্মার ফ্লেক্সিলোড। উপন্যাসঃ ক্ষুধা ও সৌন্দর্য, গল্পঃ টি ব্রেকের গল্প, শিশুতোষঃ ইঁদুরের শহরভ্রমণ (ইংরেজি ভার্সন)।

মুনিরা চৌধুরী। কবি। বইয়ের নাম 'নয় দরজার বাতাস', মৃতের মাতৃমঙ্গল।

উদয় শংকর দূর্জয়। গদ্য লেখক। বই 'লিখে রাখি বিশুদ্ধ আত্মার রাত্রিদিন', জমা রাখি নির্যাতিত নক্ষত্রের অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থঃ ওয়েস্টার্ন অ্যাভিনিউর অরণ্যদিন।

আরাফাত তানিম। মননশীল লেখক। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা বই 'রমজানে গণহত্যা' কবিতা 'রাত্রির শেষ পৃষ্ঠা।

তৌহিদ শাকীল। কবি। বই নঞ্চর্থক মেঘ তুমি ছুঁয়ে যাও।

শাহেদা ইসলাম শেলী। কবি। গ্রন্থঃ আমার এই জন্মই প্রিয়।

সৈয়দ আফসার। কবি। গ্রন্থঃ যথা, কথকতা।

ফারুক যোশী। সাংবাদিক। গ্রন্থ– ব্রিটেনে বর্ণবাদ এবং আমরা, লন্ডনে বাঙালির বৃদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, স্বদেশ মনস্ক অনাবাসী কাল, কালচিত্র ও বিম্বিত চিন্তা, সন্ত্রাস মৌলবাদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, ব্রিটেনে বর্ণবাদ এবং আমরা, যুদ্ধাপরাধী দেশে-বিদেশে চার দশকের দায়।

ফারুক আহমদ রনি। কবি। কবিতার বই 'আমি এক নষ্ট যুবক', জ্বলছি অলীক অনলে।

কাজল রশীদ। কবি। কবিতার বই 'বৃষ্টির বীজপক্ষ, উত্তর মোলায়েম, বুকের ভেতরে উড়ছে ধুলো।

ফেরদৌস টিপু মূলত অনুবাদক। অনুবাদ গ্রন্থঃ রবার্ট লিন্ডসের'ব্রিটিশ ভারতে বঙ্গদর্শন', উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারের 'ভারতজীবন'।

সুমন সুপান্থ। কবি। বই 'নিশিন্দা মেঘের বাতিঘর'।

বিলাতে দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যচর্চা করে আসছেন আরো রয়েছেন কবি মোহাম্মদ মুহিদ, আসমা মতিন, তুহিন চৌধুরী, খয়রুজ্জামান খসরু, আবুল কালাম আজাদ ছোটন, মাজেদ বিশ্বাস, মোহাম্মদ ইকবাল, মুজিবুল হক মনিসহ আরো অনেকে।

এরপর আলোচনায় যেতে চাই যুক্তরাষ্ট্রের অনাবাসী সাহিত্যকর্মীদের নিয়ে। প্রথমেই যার নাম উচ্চারণ করবো তিনি খসরুজ্জামান চৌধুরী। একজন বিশিষ্ট গল্পকার। গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে– নির্বাচিত গল্প, যাহা বলিবে বুঝিয়া বলিবে-যাহা বুঝিবে তাহা বলিবে না, গল্প কি শুধুই গল্প ও মুখ খুলিলেই বিপদ।

তাহমিনা জামান গল্প লেখক। গ্রন্থ– এই রোদ এই বৃষ্টি, দি টয়বুলেন্ট ১৯৭১ঃ মাই ডায়েরী (যৌথ)

জোতিপ্রকাশ দত্ত কথা সাহিত্যিক। গ্রন্থ–সিতাংশু তোর সমস্ত কথা, হীম জীবন, বর্ণালি জীবনের কলকল, সুখবাস, জীবনে গল্প আছে, প্লাবনভূমি, বাছাই কিশোর গল্প, জীবনানন্দের খোঁজেঃ প্রবাসী জনের গল্প, যে আসে যে যায়। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি সত্তরের দশকে একটি নতুন ধারার জন্ম দিয়েছে বলে পাঠক ও বোদ্ধামহল চিহ্নিত করে থাকেন।

পুরবী বসু কথা সাহিত্যিক। প্রিয় পঞ্চ গল্প, দাম্পত্য জীবনের গল্প, কর্মে প্রেমে সংগ্রামে, নোবেল বিজয়ী নারী, নারীবাদী গল্প, নারী সৃষ্টি ও বিজ্ঞান। এই মিতভাষী কথা সাহিত্যিক বাঙালি পাঠক সমাজে প্রতিবাদী আলাদা অবস্থান তৈরি করেছেন।

শহীদ কাদরী কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। কবিতাগ্রন্থ–তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা, তোমার জন্যে এবং আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও। শহীদ কাদরী ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে কবিতার নতুন ধারার বার্তা নিয়ে নন্দিত হন।

আলী রীয়াজ মূলত প্রাবন্ধিক। গ্রন্থ–প্রবন্ধ-ভয়ের সংস্কৃতি, কবিতা–আমি নেই আমার না থাকা আছে, স্বপ্নগুলো জেগে থাকে, আমাকে অন্ধ করে দাও। আলী রিয়াজ পেশায় অধ্যাপক, রাজনীতি ও সমাজ বিশ্লেষক, গবেষণা কাজে ভিন্নস্বর নিয়ে অবস্থান তৈরি করেছেন। কাব্য চর্চায় প্রতিবাদী উচ্চারণ পাঠকদের মনোযোগ কাড়ে।

সুরাইয়া খানম কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। পরে যুক্তরাষ্ট্রবাসী হন। অকাল প্রয়াত এই কবির একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ : 'নাচের শব্দ'। আধুনিক চিন্তাচেতনার ধারক ও স্পষ্টভাষী সুরাইয়া খানম আশির দশকে আলোড়ন তুলেন তরুণ পাঠকমহলে।

অভিজিৎ রায় মুক্তচিন্তার লেখক। গ্রন্থ–আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজ, বিশ্বাসের ভাইরাস, সমকামিতা একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, অবিশ্বাসের দর্শন। এই বিজ্ঞানুসন্ধানী লেখক ঢাকার একুশে বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে মেলাস্থলের অদূরেই ২০১৫ সালে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে নৃশংসভাবে প্রাণ হারান।

তমিজ উদ্দিন লোদী কবি ও গল্পকার। কবিতা– কখনো নিঃসঙ্গ নই, নানা রঙের প্যারাসুট, চাঁদভষ্ম, অনিবার্য পিপাসার কাছে, আনন্দময় নৈরাশ্য ও ইস্পাত মানুষেরা, দৃশ্যকল্প ও কতিপয় রাতের রমণী। গল্প– হ্রেষাধ্বনি,ও বাক বদল, নিরুদ্দিষ্টের জলাবর্ত, হাডসন স্ট্রিটের সুন্দরী এবং।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করছেন এমন অনেক রয়েছেন– যাদের বই নিয়ে আলোচনা করার সম্ভাব থাকলেও সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তাদের মধ্যে অন্যতম কবি ও গল্পকার রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কাজী জহিরুল ইসলাম, লুতফুর নাহার লতা, মুজাহিদ শরীফ, ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, আহমেদুর রশীদ টুটুল, ফকির ইলিয়াছ, আবু বকর হানিফ, ফারহানা ইলিয়াছ তুলি, সুফিয়ান চৌধুরী, তাজুল ইমাম, হাসান আলআবদুল্লাহ,পলি শাহিনা, জুলি রহমান, আবদুস শহীদ, ইস্তিয়াক রুপু, ফারুক ফয়সল।

এ পর্যায়ে আসব কানাডাবাসী সাহিত্যকর্মীদের প্রসঙ্গে। কানাডা প্রবাসী লেখকদের মধ্যে ধীমান লেখক মীজান রহমান। মীজান রহমান গণিতজ্ঞ, বিশ্লেষক। গ্রন্থ– হাইপারজেমোট্রিক। দি লিটিল গার্ডেন ইন দি কমার। ১০টি গ্রন্থ রয়েছে বাংলা ভাষায়। এর মধ্যে তীর্থ আমার গ্রাম, লাল নদী, অ্যালবাম, প্রসঙ্গ নারী, অনন্যা আমার দেশ, আনন্দ নিকেতন, দুর্যোগের পূর্বাভাস, শুধু মাটি নয়, ভাবনার

আত্মকথন, শূন্য, শূন্য থেকে মহাবিশ্ব। জহিরুল ইসলাম বিজ্ঞান ও মননশীল লেখক। বিশেষ উন্নমানের ধান উদ্ভাবক।

তাজুল মোহাম্মদ মূলত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখক। তাঁর গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ–সোনার মলাট, সিলেটে গণহত্যা, সোনামিয়া এক তরুণের প্রতিকৃতি, সিলেটের যুদ্ধকথা, ভাষা আন্দোলনে সিলেট, সিলেটের দুইশত বছরের আন্দোলন, সিলেটের মুক্তিযুদ্ধের শহিদ স্মারক, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে, একাত্তরের স্মৃতি গুচ্ছ, একাত্তরে সিলেট স্মৃতি গুচ্ছ, ভাষা সংগ্রামীদের কথা, আল বদরের ডায়েরি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সন্ধানে, নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি বীর প্রতীক, এমন বর্ববরতা কখন দেখেনি কেউ, মেজর আবদুস সালেক চৌধুরী বীর উত্তম, হেনাদাস জীবন নিবেদিত মুক্তির প্রয়াসে, যোবায়দা খাতুন চৌধুরীঃ সংগ্রামী নারীর জীবনাল্লেখ্য, সংগ্রামী সাত নারী। বারীন দত্ত ও সংগ্রামমুখর দিনগুলো, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের খোঁজে কুড়িগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ।

ফেরদৌস নাহার কবি। গ্রন্থ–কবিতা–নেশার ঘোরে কবিতা ওড়ে, চারুঘাটের নৌকাগুলো, রূপান্তরের ঘোড়া, পাখিদের ধর্মগ্রন্থ, নাভি ও নন্দন। গদ্য– কফি সপ, পশ্চিমে হেলান দেয়া গদ্য।

নাহার মনিকা কবি ও গল্পকার। কবিতাগ্রন্থ– চাঁদপুরে আমাদের বর্ষা ছিল। গল্প– পৃষ্ঠাগুলো নিজের, জাঁকড়, দখলে দৌঁড়। উপন্যাস– বিসর্গ তান ও মন্থকূপ।

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল কবি।গ্রন্থঃ তোমার বাড়ি কত দুর, জাদুকর, হারিয়ে যেতে নেই মানা, কবিতা সমগ্র, নাটকঃ ওয়াণ্ডারল্যান্ড্র।

লুৎফুর রহমান রিটন ছড়াকার। ভূতের জাদু, বাঘের বাচ্চা, ছড়া সমস্ত, ধিতাং ধিতাং, বাচ্চা হাতির কাণ্ডকারখানা,একুশের ছড়া স্বাধীনতার ছড়া, আসুন কাকা এবার একটা শান্তি চুক্তি করি।

ইকবাল হাসান কবি ও কথাসাহিত্যিক। মূল্যায়ন গ্রন্থ– শহীদ কাদরী কবি ও কবিতা। অন্যান্য গ্রন্থ– ইকবালে হাসানের ১২টি গল্প, চোখ ভেসে যায় জলে, গল্পসমগ্র, আলো আঁধারে কয়েকটি সোনলি মাছ, একদা চৈত্রের রাতে, আশ্চর্য কুহক, ছায়ামুখ আশ্চর্য কুহক, প্রেমের কবিতা, কপাটবিহীন ঘর, মৃত ইঁদুর ও মানুষের গল্প, জলরঙে মৃত্যুদৃশ্য, আকাশপরী, নির্বাচিত গল্প, নির্বাচিত ১০০ কবিতা, রিমান্ড তেলেপোকা ও আকাশপরী, সুখলালের স্বপ্ন ও তৃতীয় চরিত্র, আর্কিটেক্ট, জোৎস্নায় চিত্রকলা, দীর্ঘশ্বাসের পাণ্ডুলিপি ও ছায়াসুখ।

আরো রয়েছেন অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক ও কবিদের মধ্যে মাসুদ খান, মহসিন বখত, সাদ কামালী, সালমা বাণী, শামীমা কালাম, আবদুল হাসিব, সুব্রত কুমার দাশ, দেলওয়ার এলাহি, অপরাহ্ণ সুস্মিত।

অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করেন আবেদ চৌধুরী। তিনি পাট-এর জীন উদ্ভাবক হিসেবে বিশ্বব্যাপী আলোচিত। তাঁর লেখার ক্ষেত্র বহুবিধ। গ্রন্থ– শৈবাল ও অন্তরীক্ষ, মানুষের গানে, অনুভবের নীল নকশা, দুর্বাশিশির,প্যাডাইম শিফট, স্বপ্ন সত্য নদী ও অন্যান্য। আরো রয়েছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আকাশ আনোয়ার ও অজয় দাশ গুপ্ত।

ফ্রান্সে রয়েছেন এমদাদ রহমান মূলত অনুবাদক ও গল্পকার। তার গ্রন্থ– পাতালভূমি ও অন্যান্য গল্প, পাখির ঠোঁটে দাগ, অনুবাদ গ্রন্থ– সাক্ষাৎকার: আইজাক বাশোভিস সিঙ্গার, চিমান্দা নগুজি আদিচির বক্তৃতা, দ্য গ্রেট ডিক্টেটর ছবিতে চ্যাপলিনের শেষ ভাষণ, নৈশব্দের সংলাপ, ফেদারিকো গার্সিয়ার গ্রন্থ-দন ক্রিস্তোবালের পুতুল নাচ ও অন্যান্য, ওয়াট হুইট ম্যানের সঙ্গে আলাপ সাদাকিনি হার্টম্যান, ফেডারিক নীটসের ভাবনাগুচ্ছ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

এই দীর্ঘ আলোচনার পরও লালিত মূল কথাটি মূলত আমার রয়ে গেছে। শুরুতেই আমি সামান্য উচ্চারণ করেছিলাম–যা ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। আমার কথা– বহির্বিশ্বে বাঙালি বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করলে সেই সাহিত্যকর্মীকে অনাবাসী বলতে পারেন, তবে সাহিত্যকর্মকে অনাবাসী বলবেন কীভাবে? কারণ ভাষাটাই তো প্রধান বাহন। ঢাকা বা কলকাতায় বা দুই বাংলাজুড়ে বাসকারীর সাহিত্যচর্চাকে মূলধারা বলে চিহ্নিত করার মানদণ্ডটা কেমন করে সঠিক? বিশ্বের মানচিত্রের যে কোনো ভূ খণ্ডে বাস করা বাংলাভাষী সাহিত্যস্রষ্টা তো অবশ্যই মূলধারার দাবিদার বা চিহ্নায়িত হওয়া উচিত। যেমন– সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক দীর্ঘদিন বিলেতে বসবাস করলেও তাঁকে কখনো অনাবাসী বলা হয়নি। এরকম সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এবং শামসুদ্দিন আবুল কালামকে চিহ্নিত করা হয়নি অনাবাসী লেখক। আরো বলতে গেলে সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা না-বললে কি হয়? তিনিও তো আফগানিস্তানসহ বহু দেশে বসবাস করেছেন। বাংলাদেশ ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশে জীবনযাপনও করেছেন। রয়েছেন বিলাতবাসী স্বনামধন্য লেখক শাহাদুজ্জামান ও সাগুফতা শারমীন তানিয়া। তারাও বাংলাদেশের মূলধারার লেখক হিসেবে নিজেদের পরিচিতি ধরে রাখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এছাড়া আলোচিত লেখকদের গ্রন্থসমূহ সামগ্রিকভাবে না হলেও সর্বাধিক বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ ক্ষেত্রে অনাবাসী শব্দটি তাদের পরিচয় নির্ধারণে আরোপ করার যুক্তি

কতটুকু? ভেবে পাই না। প্রবাসে থাকা বাঙালি লেখক কবি মূলত জীবন-জীবিকার সন্ধানে ভিনবাসী, কিন্তু তাদের জড় মূলত বাংলাদেশে। এছাড়া সাহিত্যকর্মও বাঙালি জীবন ও সমাজ ঘিরে।

তবে, যারা বাঙালি অথচ ভিন্ন ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেন বা ভিন্নভাষী কিন্তু সাহিত্যচর্চা করেন বাংলা ভাষায় তাদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভাবা উচিত ভিন্ন কিছু। আমরা দেখেছি– বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান একটি সূক্ষ্ম বিভাজন বা ভিন্ন রকম ভাবার কাজটি অগোচরে এমনকি সুকৌশলেই পাঠক ও লেখকদের কাছে সন্নিবেশিত করেই স্বস্তি পাচ্ছেন। এর প্রমাণ ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি প্রদত্ত ওয়ালিউল্লাহ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন যুক্তরাষ্ট্রবাসী কবি ইকবাল হাসান। কারণটা সহজে অনুমেয়– সহসা প্রবর্তিত এই পদকটির অর্থমান নির্ধারণ এমনভাবে করা হয়েছে– তা নিতান্তই নগণ্য– যা কথিত মূলধারার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কেউ এমন ভাবলে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে– এটা এক ধরনের করুণা।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকেরই দ্বিমত থাকতে পারে। এরপরও, আমি বিশ্বাস করি– এতে আমি অনেক বিষয়ই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। আমার নগন্য জ্ঞানমতে, অনেক লেখক, কবি ও সাহিত্যকর্মী এবং তাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করতে কার্পন্য করিনি।

ঋণ: [-১] তথ্যসূত্র:–কালি ও কলম, অষ্টম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, অভিবাসী সাহিত্যে উপমহাদেশীয় কণ্ঠ, সুরেশ রঞ্জন বসাক।

[-২] তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট এবং ব্যক্তিগত সংযোগ।

পাদটীকা: মূল লেখাটি ২০১৯ সালে লন্ডন বইমেলায় পঠিত। সংক্ষিপ্তাকারে মুদ্রিত।

সাম্প্রদায়িকতা ও আমাদের দায়বদ্ধতা

সুজাত মনসুর

অসাম্প্রদায়িক চেতনার একটি স্বাধীন সার্বভৌম স্বদেশ নির্মাণের স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পরই বিভিন্ন আবরণে ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অপশক্তির ভয়াবহ উত্থান বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীর শাসনামলে আমরা যেমন দেখেছি, তেমনি দেখেছি মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা, বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির শাসনামলেও। যার সর্বশেষ বহিঃপ্রকাশ দেখলাম গত শারদীয় উৎসব 'দুর্গা পূজা'র সময় কুমিল্লার একটি মণ্ডপে কোরআন অবমাননার কথিত অভিযোগকে কেন্দ্র করে, যার সমাপ্তি হয় রংপুরের পীরগঞ্জে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া, ভাঙচুর ও লোকজনের ওপর নির্যাতনের মাধ্যমে। যদিও কোরআন অবমাননাসহ অন্যান্য কথিত অভিযোগ যে বরাবরের মতোই মিথ্যা ও বানোয়াট তা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রমাণ করতে পেরেছিল কুমিল্লার ঘটনার মূল হোতা ইকবাল ও অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতার করার মধ্য দিয়ে। এদের আদৌ শাস্তি হয়েছে কি না আমার জানা নেই। আর হলেও তেমন কোনো লাভ হবে না। কেননা, ইকবালরা সব সময়ই সমাজে বিরাজমান। এ ধরনের হামলা নতুন কিছু নয় এর আগেও বহুবার হয়েছে, ভবিষ্যতেও হতে পারে, কেননা এ সমস্যাটি একটি ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি। শুধু আইনি প্রক্রিয়ায় তা প্রশমিত করা সম্ভব নয় তবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার মূলোৎপাটন একমাত্র সম্ভব রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে। আরেকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে শুধু ধর্মীয় কারণেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা আক্রমণ কিংবা সমাজে বৈষম্য হয় তা কিন্তু নয়। সাম্প্রদায়িকতার বিভিন্ন মাত্রার উপাদান সমাজে বিরাজমান। যেমন গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব, সাদা কালোর দ্বন্দ্ব, উচ্চ বর্ণ, নিম্ন বর্ণে দ্বন্দ্ব।

সনাতন ধর্মের লোকজনের ওপর হামলা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, ভাঙচুর করা ছাড়াও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তির ভয়াবহ রূপ আমরা দেখেছি ২০১৩ সালের ৫ই মে ঢাকার শাপলা চত্বরে দানবীয় ও নারকীয় তাণ্ডবের পর এ বছরের ২৬, ২৭ ও ২৮শে মার্চ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষ করে চট্টগ্রামের হাটহাজারী (হাটহাজারী হল হেফাজতে ইসলামের মূল কেন্দ্র), ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং তৎপরবর্তী সোনারগাঁও-মওলানা মামুনুল হকের রিসোর্ট কাণ্ডে। আর সবই হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কয়েকটি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের মোর্চা হেফাজতে ইসলামের ব্যানারে। অন্যদিকে, হেফাজতে ইসলামের পিছনে জামাতসহ আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দলের যে প্রত্যক্ষ মদদ ছিল তা স্পষ্টত প্রতীয়মান এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কেননা, তাদের সবার লক্ষ্য তো এক, যেভাবেই হোক বর্তমান সরকার পতন ঘটানো ও দেশটিকে পূনরায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে ফিরিয়ে নেওয়া।

সাম্প্রদায়িক অপশক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রে বহু মাত্রায় বহুরূপে বিরাজমান। বিস্তারিত আলাপ করতে গেলে অনেক সময় ও বিস্তর পরিধি দরকার। সুতরাং শুধু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ও আমাদের অর্থাৎ প্রগতিশীল রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির ব্যর্থতার বিষয়টি আলোচনা করতে চাই। ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সূত্রপাত ব্রিটিশ শাসনামলের শেষভাগে। বলা যেতে পারে মুসলিম লীগ গঠনের মধ্য দিয়ে এবং এর পিছনে যে ব্রিটিশ শাসকদের ইন্ধন ছিল না তা বলা যাবে না। এরপর জামাতে ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, হিন্দু মহাসভা, শিব সংঘ প্রভৃতি। হিন্দু মহাসভা ও শিব সংঘ-এর পরিবর্তিত রূপ হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় পার্টি বিজেপি, যারা 'ধর্মনিরপেক্ষ' রাষ্ট্র ভারতকে অত্যন্ত দাপটের সাথে ভারত শাসন করছে এখন। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে তারা পরাজিত হলেও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিক কমিউনিস্টরা শাসন করেছেন। তারপর এখন মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস, যে দলটি মূলত কংগ্রেসের ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কংগ্রেস শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সমগ্র ভারতেই অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, কিছু কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত। এই ব্যর্থতা কমিউনিস্টদেরও। রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট বা বামরা যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলো যেমন লেখক, সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি ও নাট্যকর্মীরাও ব্যর্থ হয়েছেন।

এক সময়ের সমাজতন্ত্রী ও মানবতাবাদী শিল্পী ভূপেন হাজারিকা বা এককালের নকশাল মিঠুন চক্রবর্তী কেন বিজেপি বনে যায় তা চিন্তা ও ভাবনার বিষয় নয় কি? কিন্তু কেন? সমস্যাটি কোন জায়গায়? শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তো ভারত পিছিয়ে নেই। তাহলে কেন এই পশ্চাৎমুখী প্রবণতা?

একই প্রশ্ন, একই চিন্তাভাবনা কি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? যদিও বাংলাদেশ ও ভারতের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। আবার অনেক মিলও রয়েছে। অমিলের জায়গাটি হল, ভারত হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে বহুজাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে ভাগ-বাঁটোয়ারার মাধ্যমে। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রায় চব্বিশ বছর আন্দোলন-সংগ্রামে পরিপুষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলভিত্তি হলো অসাম্প্রদায়িক চেতনা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্র কাঠামো গঠনে রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তির যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি ভূমিকা আছে অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল সামাজিক শক্তিগুলোর। যা আজ অনেকটাই ক্ষীণ ও গৌণ। অথচ পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট জাতির জনককে হত্যা করার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোর গড়ে তোলার যে প্রক্রিয়া শুরু হয় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়, তা প্রতিরোধে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে আওয়ামী লীগের পাশাপাশি অন্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। কিন্তু আজকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমাজ রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মানুষের মননে ও চিন্তায় পৌঁছে দেওয়া ও একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মানের অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও আমরা তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারছি না কেন? সমস্যাটি কোথায়?

অনেকেই বলেন, ৭২ সালের সংবিধান পুরাপুরি বলবৎ না করলে অর্থাৎ সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বাদ না দিলে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠন সম্ভব নয়। যুক্তির খাতিরে মেনে নিলেও বাস্তবতা কিন্তু তা নয়। ভারত তো সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, তাই বলে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কি কমেছে? না কমেনি বরং বেড়েছে বলেই আজ বিজেপি এক যুগেরও অধিক সময় ধরে ক্ষমতায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম

ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অসাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা কম। যদি না হতো তাহলে আওয়ামী লীগ একটানা এক যুগ ক্ষমতায় থাকতে পারত না। জামাতি-হেফাজতিরা কবেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নিত। বছর খানেক আগে হেফাজতের ভয়ে মানুষ কম্পমান বলে মনে হলেও এখন কিন্তু নয়। আজকের হেফাজত আর কয়েক মাস আগের হেফাজত কি এক? এখন তাদের অবস্থা 'ভিক্ষা চাই না কুত্তা সামলা'। আর এ অবস্থার জন্য কৃতিত্বের দাবিদার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। যারা অনেকেই বঙ্গবন্ধু কন্যাকে হেফাজতের প্রতি আপসকামী বলে দোষারোপ করেছেন, বলেছেন ভোটের রাজনীতির জন্য তিনি ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ হেফাজতের প্রতি দুর্বল। কিন্তু একবারও তারা বিষয়টি বিবেচনায় নেননি, তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা। তিনি পিতার স্বপ্নের অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ মে বৃষ্টিস্নাত বিকেলে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। বারবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। আর ভোটের রাজনীতি? যে রাজনৈতিক দল ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতায় যেতে চায় সেই দল জেতার জন্য কৌশলী হবে সেটাই তো স্বাভাবিক। কৌশল আর আপস দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ, ভিন্ন অর্থ। শেখ হাসিনা যদি কৌশলী না হতেন তাহলে মহাজোট গঠন করে বিএনপি-জামাতের ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার ষড়যন্ত্র রুখতে পারতেন না। ২০০৮ সালের নির্বাচনেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করাও অসম্ভব হতো। আর শেখ হাসিনা ক্ষমতায় না আসলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় যেমন কার্যকর হতো না, তেমনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও রায় কার্যকর হতো না। আজকের যে উন্নয়নের মডেল বাংলাদেশ তাও কি আমরা পেতাম? না পেতাম না।

সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলায় সরকারের আন্তরিকতা ও চেষ্টায় তেমন কোন ঘাটতি আছে বলে মনে করি না, যদিও কোন কোন জায়গায় প্রশাসনের কারও কারও মনোভাব এই অপশক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল। সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলায় সবচেয়ে দুর্বলতার জায়গা হলো রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির জোরালো ভূমিকার অভাব। সাম্প্রদায়িকতার মত ভয়াবহ রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি মানুষের মনন -চিন্তা থেকে উপড়ে ফেলতে হলে মানুষের আত্মশুদ্ধি প্রয়োজন। আত্মশুদ্ধির জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। আর রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার দায়টা আমাদের, যারা জ্ঞান,

গরিমা, চিন্তা ও মননে অগ্রসরমান। অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির। শুধুমাত্র ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বক্তৃতা, বিবৃতি, সমাবেশ করে নয় কিংবা সরকারের ওপর দায় ও দোষ চাপিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের মানসিকতা থেকে নয়। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের দায়বদ্ধতা থেকেই এ দায়িত্ব পালনের কোন বিকল্প নেই। মনে রাখবেন এখনই সময় সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে সমূলে উপড়ে ফেলার, কেননা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায়। অমিরা ঐক্যবদ্ধ ও দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে যে বিজয়ী হতে পারি তার প্রমাণ পাকিস্তান আমলে যেমন দিয়েছি। তেমনি দিয়েছি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ও শহিদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে চরম বৈরী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশে।

তথ্যচিত্রে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রবাসীদের কৃতিত্ব ছিনতাই

ফারুক আহমদ

'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা' শিরোনামের একটি তথ্যচিত্র, ২০১৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর, বুধবার রাতে, ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় আগরতলায় উন্মোচন করেন। খবরটি আগরতলা ও বাংলাদেশের সব ক'টি দৈনিক কাগজে বড় বড় শিরোনাম দিয়ে প্রচারিত হয়। এই তথ্যচিত্রে দেখানো হয়, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'য় জড়িয়ে দেওয়ার পরে, ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ তার হয়ে বড় ব্যারিস্টার খুঁজতে আগরতলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র *জাগরণ*-এর মালিক-সম্পাদক জিতেন পালকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন।

সাংবাদিক মানস পাল লিখেছেন:
জিতেন পালকে কলকাতায় পাঠানো হয় প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও কমিউনিস্ট নেতা স্নেহাংশু আচার্যের কাছে, যাতে তিনি ঢাকায় গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে মামলা লড়েন। মি. স্নেহাংশু আচার্য রাজি হননি। কারণ তাতে ভারতের সম্পৃক্ততা প্রমাণ পেয়ে যেতো পাকিস্তান। তাই তিনি ইংল্যান্ডে নীরদ সি. চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় শেখ মুজিবের হয়ে ঢাকায় মামলা লড়তে আসেন টমাস উইলিয়াম্‌স।[১]

অথচ এটা মানস পালের একটি ভিত্তিহীন, বিভ্রান্তিকর আরোপিত দাবি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার প্রত্যেকটি বক্তৃতা-বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে তার পক্ষে আইনি লড়াইয়ের জন্য বার বার বিলাতবাসী বাঙালিদের কথাটি বলেছেন, অন্য কারও কথা

---

০১. অমিতাভ ভট্টশালী, 'শেখ মুজিবুর রহমান কবে গিয়েছিলেন আগরতলা'? বিবিসি বাংলা, কলকাতা, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৫।

নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, স্নেহাংশু আচার্য ইংল্যান্ডে নীরদ সি চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কীভাবে? তিনি তো তখনো ইংল্যান্ডে আসেননি, এসেছেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আরো পরে, ১৯৭০ সালে।

বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য এবং কলকাতার লেখক-সাংবাদিক কমবেশি প্রায় সকলেই জানেন যে, নীরদচন্দ্র চৌধুরীর কোনো লেখায়ই বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে ইতিবাচক কোনো কথা নেই। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী। বাংলাদেশকে 'তথাকথিত বাংলাদেশ' বলেই উল্লেখ করতেন। চাঁদ যেমন সূর্যের আলো গ্রহণ করে আলো ছড়ায়, তিনিও তেমনি তার ইংরেজ মুনিব রুডিয়ার্ড কিপলিঙ, মালনিবাবরার প্রমুখ লেখকের বাঙালি-বিদ্বেষকে ধার করে বাঙালিদের আত্মঘাতী বাঙালি হিসেবেই সম্বোধন করতেন। ইংল্যান্ডে তার খ্যাতিও এসেছিল এই পথ ধরে। সংগত কারণে এখানে নীরদ সি চৌধুরী বাংলাদেশ সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করতেন সে সম্পর্কে তার আপন ভাতিজির বরাতে, কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৯৯৯ সালের ১ আগস্ট মারা যান। মারা যাবার পর তার ভাতিজি কৃষ্ণা বসুর স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখা কলকাতার *দেশ* পত্রিকায় ছাপা হয়। এতে কৃষ্ণা বসু তার কাছে মেজকাকা নীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখা অনেকগুলো চিঠির বিবরণ হুবহু তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণা বসু লিখেছেন:

মেজকাকা বিতর্কিত মতামত অনেক সময় আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিত। ... বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আর একবার আমরা মেজকাকার প্রতিবাদী মতামতের জন্য মুশকিলে পড়লাম। সকল বাঙালি যখন বাংলাদেশের মানুষের জন্য কাতর ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তখন মেজকাকা বলতে লাগলেন এই যুদ্ধ পূর্ব বাংলার ক্ষতি করবে, পূর্ব বাংলা ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি লিখলেন–

–কল্যাণীয়াসু কৃষ্ণা ... আজ দশ দিন ধরিয়া পূর্ববঙ্গের অবস্থা ভাবিয়া আমি কাজ করিতে এমন কি ঘুমাইতে পারিতেছি না। এমন করিয়া কেহ আত্মহত্যা করিতে পারে তাহা আমি ভাবিতে পারি না। এরকম ব্যাপার যে হইতে পারে আমি অনুমান করিয়াছিলাম ... কিন্তু যাহা হইয়াছে ভয়াবহ, টিভি'তে যাহা দেখিতেছি তাহা ভুলিতে পারিব না। এখানকার প্রেস ও বিবিসি অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিতেছে – এ বিষয়ে চিন্তা করিতেও ইচ্ছা করে না ... দেশ সম্বন্ধে আর কত সহ্য করিব।[২]

---

০২. "বর্ণময় বাঙালিয়ানার এই শেষ", কৃষ্ণা বসু, দেশ, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ.৩৪-৩৫।

কৃষ্ণা বসু এর পরে লিখেছেন:
আমরা তখন কলকাতায় বসে মুক্তিযুদ্ধের কাজে ছড়িয়ে পড়েছি, সীমান্তে ফিল্ড হসপিটাল খোলা হয়েছে, নেতাজি ভবনে বীণা দাস (ভৌমিক)-এর নেতৃত্বে দিন-রাত মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য কাজ চলছে। এসব শুনে মেজকাকা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

"কল্যাণীয়াসু কৃষ্ণা এইমাত্র তোমার চিঠি পেলাম। তা পড়ে মনে হচ্ছে তোমরা পূর্ববঙ্গে কী হয়েছে, কেন হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে তার কিছুই জান না। এখানেও জানা সহজ হয়নি কারণ সমস্ত ব্রিটিশ কাগজ পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের পক্ষ হয়ে খবর দিয়েছে, কী পরিমাণ মিথ্যা খবর প্রচার করেছে ও কত মূর্খের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করেছে তা বলার নয়। বিবিসি ততোধিক। আমি সেদিন বিবিসি-র টেলিভিশনে এক হারামজাদাকে যে ধমক দিয়েছি– বিবিসি'র একটি ব্রডকাস্ট-এ আমি ব্রিটিশ সংবাদদাতাদের পূর্ববঙ্গের এই ব্যাপারের জন্য দায়ী করেছি।

"পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের তর্জন-গর্জন কাপুরুষের যারা নিজেরা ভারত গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু করতে ভরসা পায় না তারা যে অন্যের মৃত্যুতে গৌরববোধ করে তা আমার কাছে অমানুষিকতা বলে মনে হয়।

"আমার ক্রমশই ধারণা জন্মেছে, বাঙালির সামরিক বীরত্ব ও পৌরুষ সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। হানিবল থেকে সেদিন সম্রাট হিরোহিতো পর্যন্ত সকল সত্যকার বীর যখনই দেখেছে তখনই অপমান বা কষ্ট যতই হোক যুদ্ধ বন্ধ করেছে। একটি লোককেও মরতে দেয়নি। ...

"তুমি লিখেছ পৃথিবী কি পূর্ববঙ্গকে ধ্বংস হয়ে যেতে দেখবে। পৃথিবী কি করতে পারে? আমি যতদূর জানি সমস্ত পৃথিবীর প্রেস পূর্ববঙ্গের পক্ষে গিয়েছে। তাতে পূর্ববঙ্গের অনিষ্ট বই ইষ্ট হয়নি। এখন চুপ করে থাকাই ভালো।"[৩]

এর পরে কৃষ্ণা লিখেছেন:
মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর কিছুদিন পরে মেজকাকা বাবাকে লিখলেন:

"শ্রীচরণেষু দাদা ... স্বাধীনতার এই ফল হইবে তাহা ভাবি নাই। মুসলমানের প্রতি ভালোবাসা যদি ১৯২০ হইতে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত থাকিত তবে বাংলাদেশ ভাগ হইত না।"[৪]

---

০৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪-৩৫।
০৪. প্রাগুক্ত। পৃ.৩৪-৩৫।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম থেকে আরম্ভ করে এই মামলার সঙ্গে জড়িত এমন কোনো আইনজীবী নেই যাদের লেখায়, বক্তৃতা-বিবৃতিতে টমাস উইলিয়াম্‌সকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর ব্যাপারে প্রবাসী বাংলাদেশি বাঙালি ছাড়া অন্য কারও সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা; অথচ আগরতলার বাঙালিরা নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মতো একজন স্বাধীনতা-বিরোধীকে দিয়ে, যিনি তখনো ইংল্যান্ডে আসেননি, কৃতিত্বটা নিজেদের ভাগে নিয়ে যাবার নিস্ফল চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালিরা লেখক-গবেষক-ঐতিহাসিক কেউ এ নিয়ে একটি কথাও বলেছেন এমন তথ্য পাওয়া যায় নি। এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাস চর্চা।

ধ্রুপদী জার্মান সাহিত্য

ড. মুকিদ চৌধুরী

সম্রাট প্রথম ফ্রায়েডরিখের সময় সাহিত্যধারণকে মধ্যযুগীয় ধ্রুপদী জার্মান সাহিত্য বলা হয়। মধ্যযুগীয় ধ্রুপদী জার্মান সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত : (ক) উচ্চ জার্মান সাহিত্য (৭৫০-১০৫০); (খ) মধ্য-উচ্চ জার্মান সাহিত্য (১০৫০-১৩৫০); (গ) নবজাগরণ জার্মান সাহিত্য (১৩৫০–১৫০০)।

টিউটোন উপজাতির মাধ্যমে জার্মান মৌখিক কাব্য শুরু হয়। এই সময়ের কোনও জার্মান কাব্যসাহিত্যের লিখিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি; কারণ, লিপিবদ্ধ করে রাখার পদ্ধতি তখনো টিউটোন সমাজে শুরু হয়নি, মৌখিকভাবেই কাব্যচর্চা করা হতো। টিউটোন উপজাতির মতো বিভিন্ন জার্মানিক উপজাতি বিচ্ছিন্নভাবে ইউরোপের বিশাল ও বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এসব জার্মানিক উপজাতির মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হয়ে ওঠে তাদের ভাষা এবং সামাজিক রীতিনীতি। তাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল পৌত্তলিক বহুবিদ দেবতার উপাসনা। জীবনের বিভিন্ন স্তরে ও কর্মধারার সঙ্গে এসব দেবতার অস্তিত্ব যুক্ত। তবে তারা সর্বশক্তিমান দেবতার ওপরও স্থান দেয় নির্মম ও রহস্যময় নিয়তি বা অদৃষ্টকে। তাদের বিশ্বাস মানুষ শেষ পর্যন্ত নিয়তি বা অদৃষ্টের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য। তবে এসব জার্মানিক উপজাতির কাছে মানুষই প্রধান। মানুষই সংগ্রামী। মানুষই যোদ্ধা। মানুষের মহত্তর গুণ সে সাহসী। সে উপজাতি নেতার প্রতি আনুগত্য। তার মর্যাদাবোধ রয়েছে। তার নিয়তি বা অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করার উপযোগী সহিষ্ণুতা রয়েছে। ধর্মগত ও নীতিগত এই আদর্শের প্রতিফলন ঘটে টিউটোন মৌখিক কাব্যসাহিত্যে; যেমন— দেবতার মহিমা কীর্তন স্তোত্র; রাজার প্রশস্তি গীত; মহৎ কর্মের কিংবা অদৃষ্টের উত্থানপতনের বিবরণ সংবলিত বীররসাত্মক বীরগাথা বা মহাকাব্য। টিউটোন মহাকাব্য জনপ্রিয় হয়ে উঠার কারণ, এই সময় বিভিন্ন জার্মানিক উপজাতি এক জায়গা থেকে অন্যত্র গিয়ে বসবাস স্থাপন করত। বিভিন্ন

জার্মানিক উপজাতি ইউরোপ জুড়ে যত্রতত্র আনাগোনা করত। তারা বিরোধী শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতো।

উচ্চ জার্মান সাহিত্য (৭৫০–১০৫০) : বিজয়গাথা ও পরাজয়ের কাহিনি অবলম্বন করে বিশিষ্ট যোদ্ধাকে নিয়ে পৌরাণিক উপাখ্যান বা পুরাণকথা কিংবা কিংবদন্তিমূলক গৌরবগাথা রচিত হয়। পরবর্তীতেও এসব উপাদান সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ জার্মান সাহিত্যের পুরাণকথা বা বীরগাথা বা মহাকাব্যের উদাহরণ—*হিলডেব্রানডের কীর্তন*। *হিলডেব্রানডের কীর্তন* : বহু বহু পূর্বে এক সেনাবাহিনীর প্রধান হিলডেব্রানড রণক্ষেত্র থেকে স্বদেশে ফিরার পথে সীমান্তে তার পুত্র হাডুব্রানডের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। হিলডেব্রানড যখন যুদ্ধযাত্রা করেন তখন তার এই পুত্র ছিল শিশু। ফলে হিলডেব্রানড ছিলেন তার পুত্র হাডুব্রানডের কাছে অপরিচিত, তার ওপরই ছিল দেশরক্ষার দায়িত্ব। তাই হাডুব্রানড তার পিতাকে তার দেশে প্রবেশ করতে নিষেধ করে। পিতার সব কথা ও যুক্তি হাডুব্রানডের কাছে ভ্রান্ত ও চতুরতাপূর্ণ বলে মনে হয়। পুত্রের অবিশ্বাস পিতাকে নৈতিক মূল্যবোধের এক মর্মান্তিক দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়। বীরোচিত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই দ্বিধার অবসান ঘটানো হয়। পুত্রের প্রতি পিতার মমতার চেয়ে নিজের সম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষা প্রধান হয়ে ওঠে। তাই তিনি তার স্বীয় সম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে তার পুত্রকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করেন। দ্বৈতযুদ্ধে নিহত হয় পুত্র। পুত্র তার মৃত্যুর সময় অজ্ঞাত পিতার মর্যাদাবোধ ও সাহসিকতার ভূয়সী প্রশংসা করে।

ক্যারোলিঞ্জীয় (ফ্রাংকীয়) যুগে রোমান ক্যাথলিক যাজকগোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার শুরু করে। ফলে খ্রিষ্টধর্ম খুব দ্রুত প্রসারলাভ করতে থাকে। জার্মানিক জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধে একরকম খ্রিষ্টধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি জার্মান জাতি ও একটি জার্মান ভাষা সম্বন্ধে বোধ ও বিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে। একটি রাজনৈতিক সীমারেখাও টানা হয়ে যায়। জার্মান ভাষা উন্নত হতে থাকে। জার্মান সাহিত্য আধ্যাত্মিক সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়; মঠবাসী সন্ন্যাসীরাই একমাত্র লেখাপড়ায় সচেতন থাকায় জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসারিত হয় তাদের মাধ্যমেই। প্রাচীন জার্মান ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয় লাতিন বা প্রাচীন রোমক ভাষায়। তারপর এটি সাহিত্যিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর ব্যবহৃত হয় বাইবেলের অনুবাদে এবং প্রার্থনা বিষয়ক ধর্মীয় গীতে। সন্ন্যাসী অট ফ্রায়েড ফন ওয়েসেনবুর্গ কর্তৃক ৮৬৩ ও ৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয় *ইভান জেলিয়েন হার্মনি*। তারপর বিজ্ঞ ধর্মযাজকরা ক্যারোলিঞ্জীয় (ফ্রাংকীয়) সম্রাটদের সহযোগিতায় লাতিন বা রোমান সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে

তুলতে থাকেন। লাতিন ভাষা ব্যবহারের কারণে উচ্চশ্রেণির সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এভাবে আদি জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতির উচ্চমান প্রস্তুত হয়। জার্মান সাহিত্যের বুনিয়াদ রচিত হয়।

মধ্য-উচ্চ জার্মান সাহিত্য (১০৫০–১৩৫০) : ১১৩০ থেকে জার্মান সাহিত্যে শুরু হয় পার্থিব বিষয়ের বিবিধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কাজ। এসব বিবরণ খ্রিষ্টীয় অনুশাসন অনুসারেই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি। লক্ষ্য : জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা। সেজন্যই এসবে উচ্চবিত্ত জীবনের সুখ ও সম্ভোগের কাহিনিই এতে রাখা হয়। ১১৭০-এ মধ্যযুগীয় জার্মান সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ শুরু হয়। হোহেনস্ট্যুফেন রাজবংশের সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক (বারবারোসা) তার ক্ষমতার ও ঐশ্বর্যের শীর্ষে পৌঁছেন। তার সময়ের ধ্রুপদী জার্মান সাহিত্যের মধ্য-উচ্চ জার্মান সাহিত্যের বিকাশ লাভ করে। মধ্য-উচ্চ জার্মান সাহিত্যের লক্ষ্য : খ্রিষ্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের অনুশাসন থেকে মুক্ত করে জীবনকে আলাদা এক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা। সেইসঙ্গে দেশজ নীতিগত মতবাদও চরিত্র গঠনে প্রভাব বিস্তার করা। তাছাড়া নিজস্ব আদর্শ, যা খ্রিষ্টীয় প্রভাব থেকে বিশেষভাবে মুক্ত ছিল না, তা প্রতিষ্ঠা করা। এই নিজস্ব আদর্শ : প্রবৃত্তিকে সংযত রাখা, সবরকম পরিস্থিতির মধ্যেও নিজেকে স্থির রাখা, যুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শন ও অসাধু পন্থা অবলম্বন না করা, গরিব ও দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন, একাগ্রতা ও আনুগত্য রক্ষা করা; জীবনের মাত্রাজ্ঞান রক্ষা করা; জীবনের পরমানন্দ লাভের জন্য আত্মসংযম ও আত্মশিক্ষণ। হোহেনস্ট্যুফেন আমলেই আরো একটি সাহিত্যধারা হয়ে ওঠে পার্থিব ব্যাপার সম্বন্ধে খ্রিষ্টীয় ধারণার বৈপরীত্য জয় করার প্রবণতা। বৈপরীত্যসমূহ : ইহকাল ও পরকাল, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্য্যবোধ ও আনন্দনবোধ। এসব বৈপরীত্য পরাভূত করার চেষ্টাই দেখা যায় হোহেনস্ট্যুফেন যুগের জার্মান ধ্রুপদী সাহিত্যে। দ্বিতীয় ফ্রায়েডরিখ (১২১১–১২৫০) ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ছয়টি ভাষা—লাতিন, সিসিলীয়, প্রুশীয় (জার্মান), ফরাসি, গ্রিক ও আরবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সিসিলীয় কাব্যসাহিত্যের উন্নয়নে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন।

বীরযোদ্ধার মহিমা নিয়ে মহাকাব্য সর্বপ্রথম লিখিত হয় রণপতি ও কবি হার্টম্যান ফন আউ[৫] (১১৬০–১২২০) দ্বারা। তিনি ছিলেন একজন জার্মান রণপতি, কবি এবং

---

০৫. Hartmann von Aue (1160 – 1220).

সুরকার। মধ্য-উচ্চ জার্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যিক কবি। চারটি আখ্যানমূলক *এরেক*[৬] (১১৮৫), *ইভাইন*[৭] (১২০৩), গ্রেগোরিয়াস[৮] (১১৯০), ডার আরমে হাইনরিচ[৯] (১১৯০) কাব্যে তিনি যোদ্ধাদের আচার-আচরণের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। একইসঙ্গে তিনি নিষ্ঠা ও চেষ্টায় যে জীবন গড়ে তোলা হয় উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমের জন্য সেই জীবন কীভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাও ব্যক্ত করেছেন।

এরেক : এরেক রাজা অ্যারথুস (অ্যার্থার) -এর রাজসভায় একজন রণপতি হয়। তারপর সে এনাইটকে জয় করে। অতঃপর সে তার স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক ভক্তির মাধ্যমে, একজন রণপতি হিসেবে তার কর্তব্য অবহেলা করে। অতঃপর সে তার ত্রুটি উপলব্ধি করে। সে এনাইটের আনুগত্য পরীক্ষা এবং নাইটহুডের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে।

ইভাইন : ইভাইন তার কাকাতুতো ভাই ক্যালোগ্রেন্যানটের প্রতিশোধ নিতে চায়। ক্যালোগ্রেন্যানট ব্রোসেলিয়ানডের জঙ্গলে এসক্লাডোসের কাছে পরাজিত হয়। এসক্লাডোসকে ইভাইন পরাজিত করে। তার বিধবা লাউডিনের প্রেমে পড়ে। লাউডিনের ভৃত্য লুনেটের সহায়তায় সে লাউডিনকে জয় করে। তাদের বিয়ে হয়। অতঃপর রণপতি দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য লাউডিনকে পিছন ফেলে যেতে। লাউডিন এক বছর সময় বেঁধে দেয়। ইভাইন তার অভিযানে মুগ্ধ হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে ভুলে যায়। লাউডিন তাকে প্রত্যাখ্যান করে। ইভাইন দুঃখে পাগল হয়ে যায়। একজন অভিজাত দ্বারা নিরাময় হয়। নিজেকে পুনরায় আবিষ্কার করে। লাউডিনকে জয় করার একটি উপায় খুঁজতে থাকে। এক অনুগত সঙ্গী ইভাইনকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে পেতে সাহায্য করে।

গ্রেগোরিয়াস : মধ্য-উচ্চ জার্মান সাহিত্যের বর্ণনামূলক কবিতা। গ্রেগোরিয়াসের মা ও বাবা অল্প বয়সে অবৈধ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে তার জন্ম হয়। তার বাবা ছিল একজন জমিদারের অনাথ সন্তান। পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়ায় সে ইউরোপ থেকে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রায় চলে আসে এবং এখানে তার মৃত্যু হয়। একজন বৃদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তি গ্রেগোরিয়াসের মাকে ছোট নৌকায় একটি কাঠের বাক্সে শিশুটিকে রেখে সমুদ্রে

---

০৬. *Erec*, Hartmann von Aue.
০৭. *Íwein*, Hartmann von Aue.
০৮. *Gregórius*, Hartmann von Aue.
০৯. *Der arme Heinrich*, Hartmann von Aue.

ভাসিয়ে দিতে বলে, ঈশ্বর শিশুটির যত্ন নেবেন বলে আশ্বস্ত করে। মা দায়িত্বের সঙ্গে এটি করে, বাক্সে বিশ টুকরো স্বর্ণখণ্ড রাখে, আর একটি পত্রে তার জন্মবিবরণ লিপিবদ্ধ করে দেয়। সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য মঠ থেকে আসা দুইজন জেলে নৌকাটি আবিষ্কার করে। তারা ফিরে এসে বাক্সটি মঠের কাছে হস্তান্তর করে। মঠপ্রধান বাক্সটি খোলার পর, শিশুটিকে আবিষ্কার করে। একজন জেলে শিশুটিকে তার ছেলে হিসেবে গড়ে তোলার ইচ্ছে ব্যক্ত করে। মঠপ্রধান শিশুটিকে জেলে দিয়ে দেয়; কিন্তু বাক্সটি মঠেই রেখে দেয়। ছয় বছর বয়সে, গ্রেগোরিয়াস মঠের নির্দেশনায় শিক্ষা শুরু করে। কৈশোরের শেষদিকে নিজেকে আবিষ্কার করে যে, সে একজন পালক পুত্র। দত্তক পরিবার তার নিজের নয়। সে মঠেই তার মায়ের পত্রটি আবিষ্কার করে। তার পিতামাতার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়। একজন রণপতি হিসেবে বীরত্বপূর্ণ জীবনযাপন করার জন্য সে মঠ ত্যাগ করে। তার রণপতির দক্ষ কর্মকাণ্ডের কারণে একটি অবরুদ্ধ শহরের উপপত্নীকে জয় করে। তাদের বিয়ে হয়। একদিন সে শিকারে গেলে, একজন ভৃত্য তার স্ত্রীকে তার মায়ের পত্রটি দেখায়। তার স্ত্রী পত্রটি চিনতে পারে। সে আবিষ্কার করে যে, সে শুধু তার স্ত্রী নয়, মাতাও। এই কথা শুনে, গ্রেগোরিয়াস তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে নির্বাসিত করে।

ডার আরমে হাইনরিচ (দরিদ্র হাইনরিচ) : হাইনরিচ সোয়াবিয়ার একজন তরুণ ফ্রেইহার (ব্যারন)। সে সম্পদ এবং সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদায় আসীন। যখন ঈশ্বর তাকে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত করেন তখন তার চারপাশের লোকজন ভয় ও ঘৃণার সঙ্গে তাকে পরিত্যাগ করে। সে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে যায়। কিন্তু তারা তাকে সাহায্য করতে অক্ষম হয়। অবশেষে একজন বিখ্যাত ডাক্তার তাকে জানায় যে, একমাত্র নিরাময় হচ্ছে বিবাহযোগ্য কুমারীর রক্ত, যে স্বাধীনভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে রক্তপ্রদান করবে। স্বাধীনভাবে নিজেকে উৎসর্গ করবে। হতাশাগ্রস্ত হয়ে সে সকল আশা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। তার সম্পত্তির বৃহত্তর অংশ আত্মীয়স্বজনকে বিলিয়ে দেয়। একটি খামারের তত্ত্বাবধায়কের বাড়িতে বসবাস করতে যায়। এখানে এক কৃষকের মেয়ে তার একনিষ্ঠ সঙ্গী হয়। হাইনরিচ তাকে বধূ বলে ডাকে। তিন বছর কেটে যায়। মেয়েটি জানতে পারে হাইনরিচের নিরাময়ের কাহিনিটি। সে তখন তার জীবন বিলিয়ে দেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসেবে তার আত্মত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হয়। কিন্তু ডাক্তার যখন মেয়েটির হৃৎপিণ্ড কেটে ফেলতে চলেছে, তখন হাইনরিচ হস্তক্ষেপ করে। সে এই উদ্যোগের ভয়ংকরতা সম্পর্কে সচেতন হয়। তার কুষ্ঠরোগকে ঈশ্বরের ইচ্ছে বলে মেনে নেয়। মেয়েটি তাকে মরতে না দেওয়ার জন্য হাইনরিচকে তিরস্কার ও কাপুরুষ বলে ঠাট্টা করে। যখন তারা বাড়ি ফিরে আসে,

তখন হাইনরিচ অলৌকিকভাবে নিরাময় হয়ে যায়। তাদের সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য সত্ত্বেও দুজন বিয়ে করে। হাইনরিচ তার সামাজিক অবস্থান ফিরে পায়। হাইনরিচ এবং মেয়েটি চিরন্তন ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়।

ভলফ্রাম ফন এশনচেবাখ[১০] (১১৬০–১২২০)-এর মহাকাব্য *পারজিভালো*[১১] (১২১০)-এ একজন যোদ্ধার ধর্মনিরপেক্ষতার গুণ ও ঈশ্বরের প্রতি তার আনুগত্য—এই দুই বিপরীত মনোভাবের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। যোদ্ধার জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ এই মহাকাব্যে রয়েছে। একইসঙ্গে এই কাব্যটি ভীষণ ধর্মভাবাপন্ন। ঈশ্বরের অন্বেষণে পারজিভালের বিশ্বপরিক্রমা ও আত্মোন্নয়নের যে বিবরণ রয়েছে তার চিরকালীন একটা আবেদন রয়েছে। পারজিভালো হচ্ছে যুদ্ধনিহত একজন যোদ্ধার পুত্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাকে তার মা লালনপালন করেন। সে তার মাকে পরিত্যাগ করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন যোদ্ধার জীবনলাভের জন্য সে লালায়িত হয়ে ওঠে। বাল্যকালের অনভিজ্ঞতার কারণে সে অনেক গর্হিত ভুল করে। অবশেষে গুরনেম্যানজ নামক একজন যোদ্ধা তাকে যোদ্ধাজীবনের আদর্শ ও আচরণ সম্বন্ধে অবহিত করেন। গুরনেম্যানজের উপদেশ—

শোনো, সব মহত্ত্বই মহৎ উদ্দেশ্য সবই বৃথা
শালীনতা হতে ভ্রষ্ট নয় যদি হৃদয় তোমার।
উদ্ধত অশিষ্ট আচরণে বলো কী কাজ, কী কাজ
জীবনের আহরিত গৌরবের সুবর্ণ উষ্ণীষ।
যদি খসে খসে পড়ে পাখির পালকের মতো
সে জীবনে কোন মূল্য, জীবিতের সে নরকবাস।
দেখে মনে হয় তুমি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত একজন
অবশ্যই হবে তুমি একদিন বলিষ্ঠ নায়ক।
মনে রেখো, মহত্ত্বের অবনতি না হয় কখনো,
ক্রমে উর্ধ্বে উঠে যেন সে মহত্ত্ব হয় অভ্রভেদী—
গরিবজনে দয়া রেখো, দুঃখীজনকে হোয়ো করো না,
শিষ্টাচার রেখো মনে, দাক্ষিণ্যও চাই-যে অপার।
জীবনের শ্রেষ্ঠ পুঁজি জেনে রেখো, বিনয় নম্রতা।[১২]

---

১০. Wolfram von Eschenbach (1160 – 1220).

১১. *Parzival,* Wolfram von Eschenbach.

১২. *Parzival,* Wolfram von Eschenbach.

পারজিভালো পথের সন্ধান পায়। অতঃপর পারজিভালো রাজা অ্যারথুস (অ্যার্থার)-এর রাজসভায় সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। এখানে যোদ্ধাদের যাবতীয় পার্থিব আদর্শই অনুসরণ করা হয়। কিন্তু একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে পারজিভালের বিরুদ্ধে হোলিগ্রেল প্রাসাদে যোদ্ধাদের এক সমাবেশে অভিযোগ ওঠে। বলা হয় যে, পারজিভালের বাইরের আচরণই কেবল একজন যোদ্ধার উপযোগী, কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বভাবগত নৈতিক ব্যবহার প্রতিপালনে সে উদাসীন। ফলে হোলিগ্রেল প্রাসাদ থেকে সে নির্বাসিত হয়। তারপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার মনে সংশয় দেখা দেয়। সে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে শুরু করে। তবুও বিশ্বপরিভ্রমণের সময় তার ইচ্ছা ও আগ্রহ হতে থাকে— আবার কী করে ঈশ্বরকে ফিরে পাওয়া যায়। অনেক বছর পরিভ্রমণের পর, ট্রেভরিৎয়োনট নামে এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয়। ট্রেভরিৎয়োনট তাকে বুঝিয়ে দেয় যে, কোথায় তার দোষ ও ত্রুটি রয়েছে। ঈশ্বরের মহিমা সম্বন্ধেও উপদেশ সে পায় ট্রেভরিৎয়োনটের কাছ থেকে। ট্রেভরিৎয়োনট তাকে দেখিয়ে দেয় যে, খ্রিষ্টান যোদ্ধার উপযোগী পথ কোনটি। কিছুটা শুদ্ধ ও পরিশুদ্ধ হয়ে সে ফিরে আসে কৃপা ও করুণার পীঠস্থান হোলিগ্রেল প্রাসাদে। এখানে তার বিয়ে হয়। অতঃপর সে একজন রাজা হয়। সে তার পরম লক্ষ্যে পৌঁছে— একটি সম্মানিত জীবনে। এই জীবন পৃথিবীর অধিবাসীর কাছে মর্যাদার জীবন। এই জীবন যোদ্ধাদের ঐতিহ্যবাহী ও ঈশ্বরের অনুমোদিত।

এই সময়ের আর-একটি মহাকাব্য হচ্ছে *ডার নিবেলুংগ লিয়েট*[১৩] (লেখক অজানা, আনুমানিক ১২০০)। এই মহাকাব্যের ভিত্তি প্রাচীন জার্মান টিউটোন কাব্য। বিষয়বস্তুও জার্মান টিউটোন সাহিত্য প্রাধান্য— বীরোচিত মনোভাব ও বিয়োগান্তক দৃষ্টিতীক্ষ্ণ। এই মহাকাব্যটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম পর্ব : শিগুরোর[১৪] আসে ভোরমসে, রাজা গুনথারের ভগিনী রাজকুমারী ক্রিয়েমহিলডের পাণিগ্রহণের জন্য। রাজা গুনথার শর্ত দেয়, শিগুরোর যদি তাকে যোদ্ধারানি বরোনহিলডকে তার পত্নী হিসেবে অর্জন করতে সাহায্য করে তাহলে সে তার ভগিনীকে অর্পণ করবে। শিগুরোর শর্ত রক্ষা করে এবং ক্রিয়েমহিলডকে বিয়ে করে। অতঃপর রাজা গুনথার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে শিগুরোরকে হত্যা করে। হত্যাকারী হ্যাজেন। দ্বিতীয় পর্ব : বিধবা ক্রিয়েমহিলড আবার বিয়ে করে রাজা এৎজেলকে। ক্রিয়েমহিলড তার সাবেক স্বামীর হত্যাকারী হ্যাজেন ও রাজা গুনথারকে হত্যা করে। এই মহাকাব্যে যোদ্ধাদের

---

১৩. Der Nibelunge Liet (The Nibelungenlied, The Song of the Nibelungs).

১৪. Sigurðr (Sigurd).

জীবনের নবীন উপলব্ধি এবং খ্রিষ্টীয় মনোভাব পৃথক পৃথকভাবে দেখানো হয়, তবে বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই। প্রেমপ্রণয়কে কেন্দ্র করে যোদ্ধাদের জীবননীতি এলোমেলো হয়ে যায়। এই মহাকাব্যের পরিণতি করুণ। আরও একটি মহাকাব্য হচ্ছে *কুড্রুন*[১৫] (লেখক অজানা, আনুমানিক ১২৫০)। এই এই মহাকাব্যের ভিত্তিও প্রাচীন জার্মান টিউটোন কাব্য। এই মহাকাব্যে মূলত তিনটি গল্প রয়েছে : রাজা হ্যাজেনের দুঃসাহসিক অভিযান; রাজা হ্যাটেলের হিলডকে জয়লাভ এবং রাজকন্যা কুড্রুনের বিচার ও বিজয়।

বিবাহিত জীবনের বাইরে নর-নারীর যে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, যোদ্ধাদের একটি সংঘ তার অনুমোদিত ও নিয়মনিষ্ঠার রূপ দেয়। এর একটি হচ্ছে মিনেডিয়েস্ট[১৬] (প্রেমিকের সেবা প্রতিষ্ঠান)। এই প্রতিষ্ঠানের কাব্যিক রূপ হচ্ছে প্রেমগীতি[১৭]। এই সেবা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট নারী সদস্যকে উচ্চতর সামাজিক মর্যাদার মহিলা হতেই হবে। এখানে যোদ্ধা এ মহীয়সী মহিলাকে প্রেমনিবেদন করবে। যোদ্ধা তাকে নিজের বান্ধবী বলে মনে করবে। এসবই যোদ্ধা করবে মহিলার সেবা করে। এই মহিলা যদি তাকে স্বাগত জানায় তখন সে নিজেকে পুরস্কৃত মনে করবে। গৌরবান্বিত হবে। কারণ, নারীকে জয় করা তার উদ্দেশ্য নয়, তার সেবা করে নিজেকে উন্নীত করাই উদ্দেশ্য। এখানের মহিলারা সাধারণ বিবাহিত হয়ে থাকেন। যোদ্ধা তার বান্ধবীকে আদর্শরূপে মনে করে। তার যোগ্য হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। এই প্রতিষ্ঠানটির একটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য হচ্ছে— যোদ্ধাদের শিক্ষাদানই এর অভিপ্রায়। এজন্যই এর একটা সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। একজন সর্বগুণসম্পন্ন যোদ্ধা গড়ে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। প্রেমগীতি হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটির অন্তর্গত যোদ্ধাদের আত্মকথা বিবৃত করা। আত্মপ্রতিকৃতি চিত্রিত করা।

সুকুমার শিল্পের একটি মাধ্যম হিসেবে প্রেমগীতি কাব্যিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভলথার ফন ডার ফগেলভাইডা[১৮] (১১৬৮–১২৩০)। তিনি ছিলেন মধ্য-উচ্চ জার্মান সাহিত্যের সর্বপ্রধান গীতি[১৯]-কবি। তিনি *পুয়েলা বেলার*[২০] সাতটি কবিতা একটি মেয়ের উদ্দেশে রচনা করেন। ভালোবাসার যে ব্যক্তিগত আনন্দ ও বেদনা তা তার

---

১৫. Kudrun.
১৬. Minnedienst.
১৭. Minnesang.
১৮. Wálther von der Vógelweide (1168 – 1230)
১৯. Minnesänger.
২০. *Puella Bella*, Wálther von der Vógelweide.

কবিতায় ব্যক্ত হয়। তিনি রাজনৈতিক কবিতায়ও তার কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত, নিখুঁত কাব্যিক মেজাজ প্রদর্শন এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছেন।

তোমার জন্য জন্য দুঃখ হয়, হে জার্মান জাতি,
মর্যাদার আসরে তোমার স্থান কোথায়?
তোমার সার্বভৌমত্ব যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষীয়মান
তখন রুখে দাঁড়াও, পথ পরিষ্কার করে নাও।[২১]

কিংবা

আমি শুনতে পেলাম জলের তোড় ও তোলপাড়
আমি দেখতে পেলাম সাঁতার কাটছে মৎসরা।
আমি পৃথিবীর আরও অনেক ব্যাপার দেখতে পেলাম–
মাঠে, ময়দানে, বনে, জঙ্গলে, গাছের পাতায়,
নল খাগড়ায় এবং ঘাসে ঘাসে
যারা বুকে ভর দিয়ে চলে, যারা চলে উড়ে,
কিংবা মাটিতে পায়ের ভর দিয়ে যারা চলে
সকলকে আমি চিনতে পেরেছি,
তোমাদেরকে চিনিয়ে দেবো তাদের।[২২]
কিংবা
বিদেশি শাসকদের রাজমুকুটের ছায়া পড়েছে এখানে
রাজবেশি অনুগত প্রজার দল তোমাকে ঠেলে ফেলতে চাইছে,
সম্রাটের রাজমুকুট নিজের মাথায় তুলে নাও,
এবং ওদের পাঠিয়ে দাও, তাদের নিজ নিজ জায়গায়।[২৩]

হোহেনস্ট্যুফেন সম্রাট চতুর্থ কনরাডের আমলেই ভেরনহয়ার ডিয়ার গ্যারটেনায়ার[২৪] তার মহাকাব্য *মেইয়ার হেলমব্রেচৎ*[২৫] (১২৫০) রচনা করেন। এই মহাকাব্যে যোদ্ধাদের দেখানো হয় যে, তারা যেন লুঠেরা আসামি। সাধারণভাবে, মধ্যযুগীয় মহাকাব্যে এই ধারণ তেমন দেখা যায় না। এই মহাকাব্যের বাহ্যিক রূপ কিছুকাল

২১. *Poems of Wálther von der Vógelweide*, Edwin H Zeydel, 1952.
২২. *Poems of Wálther von der Vógelweide*, Edwin H Zeydel, 1952.
২৩. *Poems of Wálther von der Vógelweide*, Edwin H Zeydel, 1952.
২৪. Wérnher der Gartenaere (Gärtner).
২৫. *Meier Helmbrecht*, Wernher der Gartenaere.

বহাল থাকলেও বক্তব্য ও বিষয়—নৈতিক মূল্যবোধ—বেশিদিন মর্যাদা পায়নি। এই মহাকাব্যে রয়েছে অতিরঞ্জিত বিষয়বস্তুর বিস্তার। বক্তব্যে স্থায়ী উপাদানের অভাব।

নবজাগরণ জার্মান সাহিত্য (১৩৫০–১৫০০) : চতুর্থ কার্লের রাজত্বকাল (১৩৪৭–১৩৭৮)-এই মধ্যযুগীয় আধ্যত্মবাদ ও সমাজবাদের ঐকীকরণ শুরু হয়। মধ্যবিত্তশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। সৃষ্টি হয় নবজাগরণ জার্মান সাহিত্য। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার ও পুনর্জীবনের মানবিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। এই নবজাগরণ জীবনকে নতুন মূল্যবোধে নির্ধারণ ও বিচার করে। হাইনরিচ ভিটেনভিলার[২৬] (১৩৭০–১৪২০) ৯৬৯৯ লাইনের ব্যঙ্গাত্মক কবিতা *আংটি* (অনুমানিক ১৪১০) রচনা করেন। ওসভালোড ফন ভোলোকেনস্টাইন[২৭] (১৩৭৬–১৪৪৫) ছিলেন একজন কবি, সুরকার এবং কূটনীতিক। তার উল্লেখযোগ্য রচনা জেরুজালেমের পবিত্র সেপুলচারের অশ্বারোহী আদেশ (১৪২৫); জারের আদেশ (১৪৩২); ড্রাগনের আদেশ (১৪৪০)।

তৃতীয় ফ্রায়েডরিখ (পিসফুল)-এর রাজত্বকাল (১৪৩৯–১৪৯৩)-এ ইয়ানজেস ফন সাৎজ[২৮] (টেপল, ১৩৫০–১৪১৫) তার *ডার অ্যাকেরম্যান অ্যাউস বোহম্যান*[২৯] (বোহেমিয়ার সেই চাষি, ১৪৭০) রচনা করেন। জার্মান নবজাগরণ সাহিত্যের নতুন মনোভাবের দলিল। এটি হচ্ছে *বোহেমিয়ার সেই চাষি*র মৃত্যুর সঙ্গে বিবাদ। মৃত্যু এসে তার পত্নীকে হরণ করলেই এই সংঘাত সৃষ্টি হয়। একদিকে, *বোহেমিয়ার সেই চাষি* জোরালোভাবে বাঁচার অধিকার ও জীবনের সুন্দরতা নিয়ে তার অভিমত প্রকাশ করে। "ধিক, ধিক তোমাকে [মৃত্যুকে], নির্লজ্জ দুরাত্মা! মানুষের মতো মহৎ জীব তুমি কীভাবে ধ্বংস করো, তাকে অসম্মান করো, তার অমর্যাদা করো! সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষই ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে ভালোবাসার জিনিস, তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা ঈশ্বরকেই আঘাত করার তুল্য। যেভাবে তুমি কথা বলছ তাতে আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, তুমি মিথ্যাবাদী, এবং স্বর্গরাজ দ্বারা তুমি সৃষ্ট হওনি। স্বর্গেই যদি তোমার জন্ম হতো তাহলে তুমি অবশ্যই জানতে পারতে যে, ঈশ্বর মানুষ এবং এই জগৎকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার এই সৃষ্টিকাজ সকলের মঙ্গলের জন্যই। তিনি মানুষকে স্থাপন করেছেন সবার ওপর, সকল বস্তুর ওপর। মানুষকে আধিপত্য করার

---

২৬. Heinrich Wittenwiler.
২৭. Oswald von Wolkenstein.
২৮. Jan ze Žatce (Johannes von Tepl, 1350 – 1415).
২৯. *Der Ackermann aus Böhmen*, Jan ze Žatce.

অধিকার তিনি দিয়েছেন। মানুষর পায়ের কাছে নতিস্বীকার করার জন্যই তাদের জন্ম। এসবের কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষই সকলকে শাসন ও আধিপত্য বিস্তার করে চলবে—পৃথিবীর সকল প্রকার জীবজন্তু, আকাশের পাখি, সমুদ্রের মাছ এবং সকল লতাপাতা ও ফলফুলের ওপর। তুমি যেমন বলছ, মানুষ যদি তেমন নিচ, তেমন দুষ্টপ্রকৃতি ও নষ্ট চরিত্রের হতো, তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেই গলদ আছে, এবং সে সৃষ্টি অর্থহীন।"[৩০] অন্যদিকে, মৃত্যু স্পষ্টভাবে বলে যে, জীবন অসার। মৃত্যু প্রমাণ করে মানুষের দুর্বলতা কোথায় এবং কতখানি। এখানে দুটি বিপরীত যুক্তির অবতারণা করা হয়— পৃথিবী সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় নেতিবাচক মনোভাব এবং নবজাগরণের যুগে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয়বোধ। উপসংহারে ঈশ্বরের রায়, "তোমরা দু'জনেই বেশ ভালোমতো লড়াই করেছ; এইজন্যে সম্মানটি প্রাপ্য বাদির এবং জয় মৃত্যুর। প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে মরণের অধীনে জীবন সমর্পণ করা, তার দেহটি পৃথিবীকে অর্পণ করা এবং তার আত্মাকে আমাদের হাতে সঁপে দেওয়া।"[৩১]

---

৩০. *Der Ackermann aus Böhmen,* Jan ze Žatce.
৩১. *Der Ackermann aus Böhmen,* Jan ze Žatce.

বই : সৃজনশীল মননের চিরকালীন সঙ্গী

উদয় শংকর দুর্জয়

বিখ্যাত মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ এবং বিজ্ঞান লেখক কার্ল সেগান বলেছেন– 'হাজার বছর ধরে লেখকরা মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর নিরবে পরিষ্কার ভাবে কথা বলে যাচ্ছেন। লেখকরা আসলে জাদুকর, যারা কেউ কোনো দিন একজন আরেক জনকে চিনত না বা জানত না, বই তাদের সময়ের শৃঙ্খল ভেঙে দূরত্বকে ছেঁটে দিয়েছে। মানবসভ্যতার মধ্যে সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন হলো বই, কারণ বই-ই পেরেছে আলোর পথ দেখাতে।'

বই মানবজীবনের, মনুষ্য পরিচয়ের এবং সভ্যতা বিকাশের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। লেখক সেরি বার্নেল বলেছেন– 'Books and storytelling have long been part of our human identity.' আপনার আমার পরিচয় যাই হোক না কেন গল্প সবার জন্য। গল্প চলে আসছে সেই আদিম কাল থেকে এবং সেই গল্পকে আজীবন ধরে রাখার জন্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়, গুহা, গাছের ছালের কাছে; পাথরে খোদাই করে ছবি এঁকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে দিতে মানবসমাজ একেকটি অধ্যায় পার করে আজ ভার্চ্যুয়াল যুগে এসে পড়েছে। এখন একটি ক্লিকের মাধ্যমে অসংখ্য তথ্য এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছানো যাচ্ছে নিমিষে। মানবসভ্যতার এত দ্রুত অগ্রগতির পিছনে রয়েছে 'গল্প'। সব ঘটনার পিছনে যেমন গল্প থাকে তেমনি সেই গল্পকে ধরে রাখার জন্যই 'গল্প' তৈরি হয় মনুষ্য জীবনের ইতিহাস; সভ্যতা, আধুনিকতা সবকিছু গল্পের মতো করেই মানুষ মনে রাখে। বই সৃষ্টির হওয়ার আগে মানুষের কাছে শুধুমাত্র 'গল্প'ই ছিল। ৬০০ সালের দিকে হাতে আঁকা ছবি দিয়ে এক প্রকার বইয়ের সূত্রপাত ঘটে। আরো পরিষ্কার করে যদি বলতে হয় তাহলে কাগজে লিখিত প্রথম বই প্রকাশিত হয় চায়না থেকে; ব্যবহার করা হয়েছিল তুঁত, শণ, ছাল এবং এমনকি মাছও। প্রথম মুদ্রিত বই হিসেবে 'দ্য এপিক অফ গিলগামেশ'র নাম উঠে আসে। 'দ্য এপিক অফ গিলগামেশ' হলো ইতিহাসের

একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পৌরাণিক পুনরুত্থান। উরুকের রাজাকে নিয়ে আবর্তিত আক্কাদীয় ভাষায় লেখা মেসোপটেমীয় মহাকাব্য।

সৃজনশীল ইতিহাসের পিছনেও রয়েছে অনেক বড় কালো অধ্যায়। বিশ্বসাহিত্যের অনেক ক্ল্যাসিক বইয়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা, দাশপ্রথা, ধর্মীয়-স্পর্শকাতরতা বা যৌনাচারের ধুয়ো তুলে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে রয়েছে মার্ক টোয়েনের মতো লেখক; রয়েছে জেম্‌স জয়েসের 'ইউলিসিস' থেকে শুরু করে গালিলিওর 'বিশ্ববিধান সম্পর্কে কথোপকথন', জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিমল ফার্ম', ব্রেট অ্যাস্টন এলিসের 'অ্যামেরিকান সাইকো'সহ বহু বই। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজও বাদ যাননি নিষিদ্ধ দীর্ঘ তালিকা থেকে। মুক্তচিন্তাবিদদের ওপর নিষেধাজ্ঞার খড়গ নামাতে শিল্প-সংস্কৃতির স্বর্ণভূমি ফ্রান্সও বাদ পড়েনি; যেখানে মুক্তচিন্তার ওপর আঘাত এসেছে বারবার। নিষিদ্ধ হওয়ার বইয়ের তালিকা শুধু দীর্ঘতরই হয়নি, বিচারের মুখোমুখি হতে হয়েছে বহু প্রগতিশীল লেখক এবং প্রভাবশালী মুক্তচিন্তকদের। ইতালীয় বিখ্যাত লেখক দান্তে অ্যালিগিয়েরির 'ডে মনার্কি' এবং 'ডিভাইন কমেডি'র মতো ক্ল্যাসিক সাহিত্যও উগ্রবাদের রোষানল থেকে বাদ পড়েনি। জ্যাঁ পল সাত্রেঁর মতো আধুনিক প্রভাবশালী চিন্তবিদদের অন্যতম অস্তিত্ববাদী ফরাসি দার্শিনিক যাকে কমিউনিস্টপ্রীতির কারণে অভিযুক্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ডাস ক্যাপিটালের লেখক কার্ল মার্ক্সের কথাই ধরা যাক, সমাজতন্ত্রের কথা বলে যিনি আলোচিত এবং সমালোচিত হয়েছেন একাধিকবার বা আজও হচ্ছেন। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এই কার্ল মার্ক্স যার মৃত্যু হয়েছিল শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে কিন্তু তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছিল পুলিশের অস্বাভাবিক অত্যাচারে। বেলজিয়াম থেকে ফ্রান্স, তারপর জার্মানিতে, সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে আবার ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ফ্রান্সেও বেশিদিন থাকতে পারেননি, সর্বশেষ লন্ডনে এসে থিতু হন, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানে থেকে যান।

চিকিৎসক, মনস্তাত্ত্বিকবিদ এবং লেখক সিগ্‌মন্ড ফ্রয়েড বলেছেন, 'মানুষ ততক্ষণ আত্মবিশ্বাসী থাকে যতক্ষণ তাঁর নিজের বক্তব্য প্রতিনিধিত্ব করে। এর বিরোধিতা করলে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে'। ফ্রয়েড 'দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম্‌স' বইটি লিখে প্রথম দিকে পাঠকের কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া পান না। নিউরোলজিস্ট হিসেবে স্নায়ুরোগে ভোগা রোগীদের চিকিৎসা করতে গিয়ে তাদের অবচেতন মন আর সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে যে অনাকাঙ্ক্ষিত তথ্য তিনি জানতে পারেন তা

ফ্রয়েডকে এক নতুন পথ দেখাতে সাহায্য করে। অর্থাৎ ফ্রয়েড সাইকো-অ্যানালাইসিস বা মনোসমীক্ষণের এক নতুন অধ্যায় আবিষ্কার করেন। মানুষ যখন অবচেতন মনকে জানতে শুরু করল তখন ফ্রয়েডের এই বইটি পাঠক দারুণভাবে সংগ্রহ করতে শুরু করল। তার আগে বহুবার সমালোচিত হয়েছেন ফ্রয়েড। শুনলে অবাক হতে হয় প্রথম নয় বছরে বইটি বিক্রি হয়েছিল মাত্র ছয়শ' কপি। জেনে অবাক হতে হয়, ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরতম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হিটলারের শ্যেনদৃষ্টি যখন শিল্প সংস্কৃতির ওপর এসে পড়ে তখন লেখক বুদ্ধিজীবীদের চেতনা আর বিশ্বাসকে নস্যাৎ করার জন্য লেখক সাহিত্যিকদের ঘরবাড়ি দখল করা হয়, পাঠাগার পুড়িয়ে দেয়, এমনকি, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত পর্যন্ত করে দেয়া হয়। 'Against soul-shredding overvaluation of sexual activity' আখ্যা দিয়ে সিগমন্ড ফ্রয়েডের ১৯৩৩ সালের পূর্বে প্রকাশিত সমস্ত বই যখন পুড়িয়ে দেয়া হয় তষন তিনি ইংল্যান্ডে এসে শেষ আশ্রয় নেন।

'তবে ইতিহাস তোমাদেরকে কিছুই শেখায়নি, যদি মনে কর যে, তোমরা তাঁদের চিন্তাচেতনাকে হত্যা করতে পার'। ১৯৩৩ সালে জার্মানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা, হিটলারের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে বিশ্বের সব নামী লেখক যেমন সিগমন্ড ফ্রয়েড, হেইস. জি ওয়েলস, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জ্যাক লন্ডন, থমাস ম্যানের বইয়ের সাথে নিজের বইও যখন পুড়িয়ে দেয় তখন আমেরিকান লেখক হেলেন কেলার, জার্মান শিক্ষার্থীদের কাছে একটি খোলা চিঠিতে এসব লেখেন। আরো লেখেন 'তোমরা আমার বই এবং ইউরোপের উৎকৃষ্ট মননের বইগুলো পুড়িয়ে ফেলতে পারো, তবে সেসব লেখকদের চেতনা লক্ষাধিক চ্যানেলের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা অন্যদের মনকে প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত করবে।'

জনপ্রিয় উপন্যাস 'ললিতা'র কথা কারও অজানা নয়। ভ্লাদিমির নবোকভের বিখ্যাত উপন্যাস 'ললিতা'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কী এমন ঘটনা ছিল যে রাতারাতি বইটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। বারো বছরের এক কিশোরীর সাথে মধ্যবয়স্ক পুরুষের যৌন সংসর্গের ঘটনা মূলত সভ্য সমাজের উচুতলার লোকেদের রক্তচক্ষুর কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৫ সালে প্যারিস, ১৯৫৮ সালে নিউইয়র্ক এবং ১৯৫৯ সালে লন্ডন থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর অশ্লীতার দায়ে প্রকাশকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। উপন্যাসের মূল চরিত্রে রয়েছে বারো বছরের কিশোরী ললিতা এবং ললিতার মধ্য বয়সি স্টেপ ফাদার অর্থাৎ বিপিতা ড. হাম্বার্ট। ললিতার সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, ললিতাকে পাওয়ার অভিলিপ্সায় ড.

হাম্বার্ট, ললিতার বিধবা মাকে বিয়ে করেন। এই উপন্যাসের লেখক ভ্লাদিমির নবোকভ দেখিয়েছেন যে ড. হাম্বার্ট কিছুটা মানসিক রোগে ভুগছেন এবং চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হচ্ছেন। আরো দেখিয়েছেন ড. হাম্বার্ট তাঁর নিত্যদিনের জীবনযাপনের সব কথাবার্তা ডায়রিতে লিখে রাখছেন। ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসটি প্রথমে ইংরেজি ভাষায় লেখেন এবং পরে রুশ ভাষায় নিজেই অনুবাদ করেন। ১৯৯৮ সালে নবোকভের এই ললিতা উপন্যাস টাইম ম্যাগাজিনের লিটারেরি লিস্টে চতুর্থ স্থান দখল করে নেয়। ভ্লাদিমির নবোকভ জন্মগ্রহণ করেন রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে ১৮৯৯ সালের ১০ এপ্রিল। পড়াশোনা করেন কেইম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে; প্রথমে প্রানি বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেও পরে ফরাসি এবং রুশ সাহিত্য নিয়ে পড়েন। ট্রিনিটি কলেজে পড়াকালীন তিনি ইংরেজি এবং রুশ ভাষায় বেশকিছু কবিতাও লেখেন। ১৯২৩ সালের দিকে তাঁর কবিতার বই ‘দ্য ক্লাস্টার অ্যান্ড দ্য এম্পিরিয়ান পাথ’ প্রকাশিত হয়।

সাতাশ বছরের অশ্লীলতার দায় থেকে মুক্তি পাওয়া উপন্যাস ‘ট্রপিক অফ ক্যান্সার’ লেখা হয়েছিল ১৯৩০ সালের দিকে, ঘটে যাওয়া কিছু বেদনার্থক ঘটনা নিয়ে। ঔপন্যাসিক হেনরি মিলার মূলত আত্মজীবনীমূলক খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে তুলেছেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে ক্ল্যাসিক উপন্যাস হিসেবে আলোচিত হলেও তা একসময় নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকাতেই ছিল। ১৯৩৪ সালে ফ্রান্সে বইটি প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হলেও সেন্সরশিপের কারণে আমেরিকাতে বইটি প্রকাশ হতে অপেক্ষা করতে হয় ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। ‘ট্রপিক অফ ক্যান্সার’ উপন্যাসটিতে রয়েছে জীবন দর্শনের টুকরো টুকরো অনুভূতি যেখানে দরিদ্রতা থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের খুঁটিনাটি বিষয়। ঔপন্যাসিক তাঁর যৌনতার বিভিন্ন ঘটনার রসালো অনুচ্ছেদ সামনে আনতে গিয়ে নিজের জীবনের খোলামেলা বিষয়কে আরো বেশি উন্মুক্ত করেছেন। নিজের স্ত্রী মোনার পাশাপাশি অন্য নারী সঙ্গীদের সান্নিধ্য লাভ করার অসংখ্য উচ্ছ্বসিত, রসালো এবং জমজমাট কাহিনি উঠে এসেছে তাঁর এই আখ্যানে।

নিষিদ্ধ এবং উল্লেখযোগ্য আরো অনেক বইয়ের মধ্যে রয়েছে উইলিয়াম টেইন্ডাল অনূদিত ‘বাইবেল’, অব্রে মেনেনের ‘দ্য রামায়ণ অ্যাজ টোল্ড’ এবং সালমান রুশদির ‘দ্যা স্যাটানিক ভার্সেস’, ব্রেট এস্টন এলিসের ‘অ্যামেরিকান সাইকো’, মার্ক টোয়েনের ‘ইভ্‌স ডায়েরি’ ও ‘হাকলবেরি ফিন’, বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর ‘বিশ্ববিধান সম্পর্কে কথোপকথন’ অন্যতম। নিষিদ্ধ করা হয় বিখ্যাত লেখক আর্নেস্ট

হেমিংওয়ের 'দ্য সান অলসো রাইজেজ' বইটিও। আরো অবাক হওয়ার বিষয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং সম্মানিত ইংরেজ কবি পার্সি বিসি শেলিকেও নিরীশ্বরবাদের ছুঁতমার্গ দেখিয়ে 'দ্য নেসেসিটি অফ এথিসম' বইটির জন্য অপমান করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। অথচ ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েল্‌স জুড়ে প্রায় ৬০০ বাসের বিলবোর্ডে লেখা 'There's probably no God... now stop worrying and enjoy your life'. দেখতে পাওয়া। শেলি বইটির মধ্যে লিখেছিলেন– 'The mind cannot believe in the existence of a God'. এই উক্তির জন্য পাশপাশি তাঁর বন্ধু এবং সহযোগী লেখক হিসেবে থমাস জেফারসন হগও অভিযুক্ত হন। সাহিত্যজগতের বাইরে আদতে শেলী একজন এথিস্ট এবং মুক্ত-আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার মানুষ ছিলেন। সাহিত্যের বাইরে তিনি কিছু প্রগিতিশীল রাজনৈতিক ধ্যানধারণা থেকে বেশকিছু রচনাও লিখেছেন, তার মধ্যে দীর্ঘ একটি রচনা 'এ ফিলোসফিক্যাল ভিউ অফ রিফর্ম' যা, লেখার একশ' বছর পর অর্থাৎ ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর আগে, সোভিয়েত ইউনিয়নে, ফরাসি দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী জঁ-জাক রুশোর দার্শনিক চেতনার সব বই পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে ফ্রানৎস কাফকার বই চেকোস্লোভাকিয়াতে নিষিদ্ধ করা হয় কারণ তিনি চেক ভাষায় লিখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় হিটলারের নাৎসি বাহিনী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও কাফকাকে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করে।

'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার', বিশ্বসাহিত্য অঙ্গনে অশ্লীলতার দায়ে যত বই নিষিদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং বৃহৎভাবে পঠিত এই উপন্যাস। এই উপন্যাসে মূলত জৌবিক চাহিদা এবং কামকলা নৈপুণ্যের এক সুনিপুণ চিত্রায়ন রয়েছে। যৌন তৃপ্তি লাভের অন্বেষণ যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে তখন উচ্চ বিলাসিতাময় সংসার আর সামাজিক মর্যাদার পরব্যাপ্তি তখন সংকীর্ণ হয়ে আসে। ঔপন্যাসিক ডি. এইস লরেন্স এমনই এক সংজ্ঞা এই জগৎ সংসারকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যৌন আকাঙ্ক্ষা বা সম্পর্কিত যৌনজীবন মানুষের মনন এনং দর্শনের ইন্দ্রিয়কে আরো প্রখর এবং অনুভূতিশীল করে তোলে। তার উপন্যাস থেকে প্রেম সম্পর্কের বহু আবেগময় কথোপকথন পাওয়া যায় যেমন– 'We've got to live, no matter how many skies have fallen'. উনিশ শতকের রক্ষণশীল অভিজাত পরিবার বিবাহ বহির্ভূত সে যৌন সম্পর্ক মেনে নেবেইবা কেন, যতই পুরুষ স্ত্রী সঙ্গমে অক্ষম হোক! পুরুষশাসিত সমাজ তো চায় নারীর কোনো আকাঙ্ক্ষা না থাকুক; নারী শুধু উপভোগের বস্তু হোক, উপভোগের অংশীদার না হোক। লরেন্স উঁচু তলার ঐ

সমাজকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছেন; তিনি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন– ‘শরীরবিহীন মনোমিলনের যে অহেতুক এবং অর্থহীন সম্পর্ক তেমনি মনের সম্পর্ক ব্যাতিরেকে দৈহিক মিলনও জৈবিকতা ছাড়া অন্যকিছু নয়’। রক্ষণশীল সমাজ আর যাই হোক পুরুষের অক্ষমতাকে সমাজে প্রমাণিত হোক বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ সমাজ তা কোনোভাবেই চায়নি। অগত্যা যূপকাষ্ঠে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় ‘লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার’। ‘লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে, ইতালিতে এবং ১৯২৯ সালে ফ্রান্সে। ইংল্যান্ডে প্রথম ছাপার অভিযোগে প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন বুক্সকে আদালতে দাঁড়াতে হয়। মামলা চলতে থাকে বহু বছর ধরে; ১৯৬০ সালে বইটি নতুন করে প্রকাশের অনুমতি মেলে। শুধু তাই নয় লরেন্সের আরেকটি উপন্যাস ‘দ্য রেইনবো’র জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগে তদন্ত শুরু হয় এবং উপন্যাসটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। প্রতিটি জীবনের প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্কের মধ্যে যৌন আকাঙ্ক্ষার যে অকপট এবং স্পষ্ট আচরণ রয়েছে তারই প্রতিফলন এসে পড়েছে ‘দ্য রেইনবো’ উপন্যাসে। ১৯১৫ সালের ১৩ নভেম্বর বো স্ট্রীটের ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায় অনুযায়ী ‘দ্য রেইনবো’ নিষিদ্ধ হয়ে যায়; ১০১১ কপি বই সেই দিনই বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রায় ১১ বছর ধরে বৃটেনে বইটি নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা থেকে নাম কাটাতে পারেনি। ১৯২০ সালে তারই সিক্যুয়াল অর্থাৎ ‘দ্য রেইনবো’র দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে লরেন্স লেখেন ‘উইমেন ইন লাভ’ উপন্যাস। ‘দ্য রেইনবো’র নেগেটিভিটির জন্য প্রকাশক প্রথমত ‘উইমেন ইন লাভ’ প্রকাশে অপারগতা দেখালেও পরে অবশ্য তা প্রকাশ পায়। ডি. হেইস লরেন্স যেমন সমালোচিত হয়েছেন তেমনি উচ্চ প্রশংসিতও হয়েছেন। রবার্ট ম্যাকক্রাম লরেন্সের ‘দ্য রেইনবো’র ওপর পাঠ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় লিখেছেন ‘...Similarly, in The Rainbow and Women in Love, the sexuality of his characters throbs through the narrative like a feverish pulse. No one writes better than Lawrence about the complexity of desire, especially homosexual desire’.

‘দ্য স্যাটানিক ভার্সেস’ আর ‘লজ্জা’ উপন্যাসের কথা কমবেশি সবারই জানা। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, সৃজনশীল ইতিহাসের সবচেয়ে সমালোচিত এবং আলোচিত এই দুটি বইয়ের লেখক তাঁরা তাদের জন্মভূমি থেকে সম্ভবত চিরদিনের জন্য উৎখাত হয়েছেন। ১৯৮৮ সালে সালমান রুশদির ‘দ্য স্যাটানিক ভার্সেস’ প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার দায়ে একবছর পরই বইটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী বছরে ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি সালামান

রুশদির বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি ক'রে মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। ১৯৯৫ সালে নিষিদ্ধ হয়েছিল প্রথা বিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদের 'নারী' গ্রন্থ।

সিরিয়ান লেখক হায়দার হায়দারের কথা হয়তো অনেকের অজানা নয়। তাঁর উপন্যাস 'ওয়ালিমাহ লি আআশাব আল-বাহর' মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশে নিষিদ্ধ করা হয়। ২০০০ সালে মিশরে বইটি পুনঃমুদ্রণের পর প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে ক্ষোভ এবং বিদ্বেষ দেখা দেয় এবং আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে উপন্যাসটির সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ২০১৭ বাংলাদেশের শিল্প সাংস্কৃতির প্রেক্ষাপট বদলের কিছু সূচনা লক্ষ করা যায়। একদল উদ্গ্রবাদীদের আন্দোলনের মুখে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যবই থেকে প্রায় ষোল জন লেখকের লেখা সরিয়ে নেয়া হয় এবং পাঠ্যবইগুলো আবার নতুন করে ছাপানো হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে হুমায়ুন আজাদ, সত্যেন সেন, জসীমউদ্‌দীন, লালন শাহ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ আরো বেশ কয়েকজন। এঁদের লেখাপত্র পাঠ্যবই থেকে বিদেয় করে দিলেই কি তাঁদের মস্তিষ্কের সুচিন্তনের কথা কি নিঃশ্চিহ্ন করে দেয়া যায়? আলোকে কখনোই রোধ করা যায় না, একদিন না একদিন অন্ধকার ভেদ করে নিজেকে জানান দেবেই।

এখন আসা যাক বইয়ের বর্তমান পাঠকের পাঠ অভ্যেস এবং অন্যান্য প্রসংগ নিয়ে। লেখক ই. বি হোয়াইটের মতে সুখ বা কষ্টের যে কোনো সময়েই বই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু। তিনি বলেছেন– 'Books are good company, in sad times and happy times, for books are people –people who have managed to stay alive by hiding between the covers of a book'. তবে বইয়ের আকার, আঙ্গিক বা পাঠের মাধ্যম এবং অভ্যেস অনেকটা বদলে গেছে। শুধু যে মাধ্যম বদলে গেছে তা নয়, এতো এতো ভিজ্যুয়াল ইন্টারটেনমেন্টস্‌এর কবলে অক্ষরে মোড়ানো বই পড়ে নিজেকে আনন্দ দেয়ার সময় কোথায়! সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে ইউটিউব আর নেটফ্লিক্সের জগতে মানুষ যেন বইয়ের গল্প ভুলতে বসেছে।

বর্তমানে প্রিন্টেড অর্থাৎ ছাপা বইয়ের কিছুটা ভাটা পড়েছে এতে কোনো সন্ধেহ নেই, সেটা যান্ত্রিক জীবনে সবকিছু এখন ডিজিটালাইজড হয়ে যাচ্ছে। ছাপা বইয়ের বদলে প্রকাশ হচ্ছে অডিও বুক, ই-বুক, পিডিএফ ভার্সন,ওয়েভসাইট বা ডেক্সটপ ভার্সন, ওয়ার্ড ফাইলসহ বিভিন্ন মাধ্যমে। অন্যদিকে মানুষের ঘরে বসে টেবিল চেয়ারে বসে বই পড়ার সময় বের করা বা অবসর খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই চলার

পথে, পার্কে, অফিসে কাজের অবসরে অথবা অন্য কোনো লেজার টাইমে পড়ার জন্য ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করছে। ব্যস্ত জীবনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে মানুষ এখন পড়ার জন্য বেছে নিয়েছে, মোবাইল ফোন, কিন্ডল, আইপ্যাড, অনিক্স বুক্স নোট, কোবো, জোয়ান, ওয়াকমসহ বিভিন্ন ট্যাবলেট, যাকে এক কথায় বলে রিডিং ডিভাইস। তবু ছাপা অক্ষরের বইয়ের বিকল্প নেই। অক্ষরে ছাপা বইয়ের শরীরে এক অসাধারণ ঘ্রাণ থাকে যা পাঠককে মোহিত করে। ছাপা বইয়ের মাধ্যমে পাঠ আনন্দ যতটা উপভোগ করা যায় ভার্চ্যুয়াল পাঠে ঠিক তেমনটা হয় না।

বই মানবজীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। বাড়িতে একখানা পড়ার বই নেই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে। প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য ভালো বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। একেক লেখকের একেক রকম মতাদর্শ থাকতে পারে, ভিন্ন মতামত থাকতে পারে, সচরাচর চিন্তার বাইরে আলাদা কোনো ভাবনা থাকতে পারে। সে মতাদর্শ যখনই কোনো সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করে তখন তা নিষেধাজ্ঞার সারিতে চলে যায়। তবুও পাঠক এক সময় সে মতবাদ খুঁজে খুঁজে পড়ে এবং ভেতরকার খুঁটিনাটি পাঠাহরোন করে নেয়। একটি ভালো বই একজন মানুষের চিন্তাচেতনাকে বদলে দিতে পারে, দিতে পারে নতুন এক আলোর সন্ধান। লেখক ডেল কার্নেগীর মতে– 'If I knew your thoughts, I would know what you are, for your thoughts make you who you are. By changing our thoughts, we can change our lives'. সাম্প্রতিকালের সবচেয়ে আলোচিত লেখক, হ্যারি পটারের স্রষ্টা জে. কে রোলিং বলেছেন– 'If you don't like to read, you haven't found the right book'. সত্যি তাই, আনন্দবোধের জন্য ভালো বই খুব দরকার তা না হলে মূল্যবান সময় পণ্ড হয়ে যেতে পারে। যেমন সালমান রুশদি বলেছেন– 'A book is a version of the world. If you do not like it, ignore it; or offer your own version in return'. অবশ্যই একটি ভালো বই হোক চিরদিনের সঙ্গী।

রেফারেন্সঃ

১. ফ্রয়েডের 'ইন্টারপ্রিটেশন অফ ড্রিম্স': স্বপ্নে যেভাবে কথা বলে অবচেতন মন, বিবিসি নিউজ, বাংলা, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭

২. ভ্লাদিমির নবোকভ বায়োগ্রাফি, মেলিসা আলবার্ট, লিটারেচার, ব্রিটানিকা ওয়েবসাইট।

৩. ট্রপিক অফ ক্যন্সার, দ্যা এডিটর অফ এনচাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ব্রিটানিকা ওয়েবসাইট।

৪. পার্সি বিসি শেলী - পয়েম্স, বুকস অ্যান্ড লাইফ - বায়োগ্রাফি, বায়োগ্রাফি ওয়েবসাইট

৫. Lady Chatterley's Lover, Study Guide Available at https://www.coursehero.com/lit/Lady-Chatterleys-Lover/quotes/

৬. বিখ্যাত যেসব গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়েছে, মাহফুজ রাহমান, available at https://follow-upnews.com

৭. The 100 best novel: No 43- The Rainbow by DH Lawrence(1915) by Robert McCrum, The Guardian, 14 July 2014

৮. A little history of reading: How the first books came to be by Cerrie Burnell published on 03 December 2019 on booktrust.or.uk. Available at https://www.booktrust.org.uk/news-and-features/features/2019/december/a-little-history-of-reading-how-the-first-books-came-to-be/

৯. যা আমাদের পড়তে দেয়নি, সমুদ্র সৈকত, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭

১০. https://quotestats.com/topic/books-can-change-your-life-quotes/

১১. There's probably no God... now stop worrying and enjoy your life': Atheist group launches billboard campaign by DAILY MAIL REPORTER

১২. Carl Sagan on books, Cosmos by Carl Sagan, reddit, Available at https://www.reddit.com/r/books/comments/p4niq/carl_sagan_on_books/

১৩. Sigmund Frued, Author(s): United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC Available at https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/sigmund-freud

১৪. Nazi Book Burning, How H.G. Wells Threatened Hitler by Caroline Byrne, published on The Hub Broadcasting, updated on Nov 25, 2021 Available at: https://www.thehubcast.co.uk/post/nazi-book-burning

কবিতা

(প্রথম পর্ব)

তৃতীয় বাংলা ৫৯

সূচি

৬১ স্বপ্নায়ন — শামীম আজাদ
৬২ আবার ফিরবে না — মাজেদ বিশ্বাস
৬৩ বিধ্বস্ত সময়ের অলিখিত আখ্যান — ফারুক আহমেদ রনি
৬৫ নারী ও নাড়িনক্ষত্র — মাশুক ইবনে আনিস
৬৬ সব জল সমুদ্রে যায় না — ইকবাল হোসেন বুলবুল
৬৭ জলের আয়না — শাহ্ শামীম আহমেদ
৬৮ নাট্য-দৃশ্য — টি এম কায়সার
৬৯ আপস — সারওয়ার-ই-আলম
৭০ ধানের ঈশ্বর — মুজিব ইরম
৭১ মানুষ তুমি — ফারাহ্ নাজ
৭৩ পাপদ্বয়ের কথোপকথন — কামরুল বসির
৭৪ সহস্রাব্দের সহিসে যুথবদ্ধ ইতিহাস — সাইম খন্দকার
৭৫ বেদনার মানচিত্র — লুৎফুন নাহার
৭৬ রক্ত ঝরাও, রক্ত গড়াও — সৈয়দ আফসার
৭৭ ভালোবাসার কোনো তালাক হয় না — সৈয়দ রুম্মান
৭৮ দৃশ্য ও অন্ধকার — কামরুন নাহার রুনু
৭৯ মেঘ কানন — নূরজাহান শিল্পী
৮০ ভালোবাসা চির রঙিন — আজিজুল আম্বিয়া

স্বপ্নায়ন

শামীম আজাদ

নদীর সিফন ফুঁড়ে গাছগুলো উঠে উঠে
বেঁকে বেঁকে যায় জোঁক হয়ে যায়
আলোরা ফড়িংয়েরা চুলে জড়াজড়ি করে
ক্রান্তি উঠে আসে মানুষের কাঁদায়।

অতি পুরাতন এসব উপেক্ষা করে
স্থবির অন্ধকারে
একবার দাঁড়িয়ে গেলে দেখি
প্রেমাক্রান্ত মেঘদের ছোটাছুটি
বায়ুর বুননে ভেজা হাত
হাতে লেগে থাকা চাঁন্দের রুহানী
রৌদ্র কচকচে বাড়িঘর
আর আমি নড়ি না কণ্ঠা থেকে এক পা ...

আবার ফিরবে না

মাজেদ বিশ্বাস

কেউই আবার ফিরে আসবে না অতীত জীবনে খেলায় উৎস প্রাণ। পরিচিত রাস্তায় কিংবা অতিচেনা ঠিকানায় কখনো ফিরবে না সেই অচিন মায়ার পাখি। হিমাভাসে হেমন্তে পাতা ঠিকই ঝরবে ধূসর সংগীত। সৃষ্টি কারিগরের রহস্য ক্রীড়া বিশ্ব উঠোন ইচ্ছা স্বাধীন।
ভোরের মিষ্টি রোদে ফুলের হাসি বিনিময় ঘটবে না অতি ফানুস জীবন।
পূর্ণিমার ধবল জোছনায় গোসল করবে না অতি চেনা শরীরগতর হৃদয় বাড়ি।
মহাকালের স্রোতে ভাসবে জীবনের আয়োজন উল্লাস-উৎসব। সবকিছু জেনেও চোখ সম্মুখে সোনার মেডেলের আশায় প্রতিযোগী চূড়ান্ত খেলা।
চারদিকে তাকিয়ে দেখবে সবই শূন্য মহাশূন্য আকাশ। অরণ্য সাগরে
হুইসেল ধ্বনি বাজে জন্মাবধি অন্তরে অন্তরে রঙিন অলিম্পিক।
জীবনে জীবনে কোলাহলে শেষ অবধি মানুষ নিঃসঙ্গ একাকী চাঁদ।
সকলের চলে যাওয়ার মতো আমরাও চলে যাব একা
অজানা ক্রীড়া মাঠ মুখোমুখি প্রধান রেফারি।

পৃথিবীর মায়ায় জীবন অস্তগামী সেই রহস্য রেফারির মুখোমুখি হতে হবে একদিন।

বিধ্বস্ত সময়ের অলিখিত আখ্যান

ফারুক আহমেদ রনি

নদী দেখলেই ভেতরে জলকেলি উৎসব
একদিন তুমি বলেছিলে;
এই নদীতে একটা সাঁকো হলে
একসাথে পারাপার হব, উৎসবে রঙিন হব,
তোমার জন্য পাঁজরের হাড় আঁটিয়া সাঁকো বানালাম
অস্থি চিড়গোড় করে তুমি হেঁটে যেতে,
জলকেলি উৎসব হয়নি কখনো,
তবুও জলোচ্ছ্বাস ভেঙেছে নদীর দু'পাড়।

আমরা তখন বিরামহীন চঞ্চল হৃদয়
চুলের সিঁথির মতো সরু পথ, দুধারে কাঁটাকুঞ্জ
সন্ধ্যা দুপুর হাতের মুঠোয় স্বপ্নমায়ায়
বিপন্ন সময় করেছি পার
এক মাঘীপূর্ণিমায় তুমি বলেছিলে;
আকাশজুড়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হবে, তুমি তাই হলে;
আমি যুগিয়েছি তোমার শরীরজুড়ে বিকিরণ রশ্মি;
তবুও, আমি অমাবস্যার অন্ধকারে বিশ্বাস কুড়োই।

তুমি বলেছিলে;
পাহাড় চড়বে, উদরে ভাসবে মেঘমল্লিকা
শিরদাঁড়া উঠের পিঠের মতো মেরুদণ্ড কুঁজো করে
সিঁড়ি করে দিয়েছি, শুধু তোমার জন্য,
তর তর করে ওঠে গেছো উপরে
তোমার নাভিপদ্ম আজ ভাসমান সমুদ্র,
আমি এখনো মেরুদণ্ড সোজা করতে পারিনি,
সময়গুলো যেন আজ কষ্টের ভেতরে বুকেহাঁটা
বিষধর সরীসৃপ।

আমরা তখন শুধুই স্বপ্ন দেখি;
ভিখিরির চোখে শস্যের দানার মত
উদাসীন এক অবিমিশ্র বিকীর্ণ স্বপ্ন,
চলন বিলে পদ্মপাতায় ভেসে যাওয়া উষ্ণ আলিঙ্গন।
ক্লান্ত সময় পেরিয়েছি বীতস্পৃহ
মহানগর চষেছি উদভ্রান্ত নেশায়
আজ বুকের শহর ট্রয়যুদ্ধের কুরুক্ষেত্র
রক্তশিরার রন্ধ্রপথে হাহাকারের তপ্তজ্বালা।

তবুও, তোমার জন্য এখনো ভ্রান্তপথে আমি, একেলা
তুমিতো সব পেয়েছ, পেয়েছ চাঁদের ঠিকানা
আমার জন্য শুধুই বর্ষার বেনোজলে সাঁতার কাটা।
তোমার যজ্ঞযাত্রায় শ্রীক্ষেত্র উন্মোচিত হলো
অবশেষে তুমি সার্থক প্রান্তিক চাষি
জয় করছ পার্থিব স্বাপ্নিক খেয়াল
আমি আছি এখনো, অনীহায় বেঁচে থাকা
নাভিশ্বাসের চরম গ্লানিতে শুধু কষ্টের প্রহর তাড়াই
নষ্ট সময়ের প্রতিকৃত, এক বিপন্ন মানব।

নারী ও নাড়িনক্ষত্র

মাশূক ইবনে আনিস

তোমার নাকের বিন্দুসম নাকফুলে
আমার চোখ গেঁথে আছে,
আমি কী ভুলে যাব-অবয়ব নক্ষত্রের আলো
স্পর্শের জলফুটা
আনকোড়া চুম্বন
অপরিশীলিত আলিঙ্গন
আহাময় উচ্ছ্বাস
ছোট ছোট নির্দেশনা
অদম্য জড়িয়ে থাকার প্রাচীন কৌশল,
কায়মনো কামনার বিকীর্ণ পদ্মকুসুম

তোমার শিরা-উপশিরার কম্পন আমার চোখে বিঁধে আছে
–কী ব্যাকুল সেই আর্তি,
সেই বেদনা,
সেই তৃপ্ত মনস্ক অপলক ভীষন তীর্যক চাহনি
তুমি, দুই চোখ জুড়ে আছ
বিধেয়; আমি সম্পূর্ণ অন্ধজন...

সব জল সমুদ্রে যায় না
ইকবাল হোসেন বুলবুল

সব জল সমুদ্রে যায় না
পাখির পালকে করে কিছু জল উড়ে যায় শূন্যের ভেতর
শাড়ির আঁচল ধরে কিছু জল চলে আসে উঠোনের রোদে
কিছু জল নিজেকে সঁপিয়া দেয় পাঞ্জাবির সুতোর মায়ায়

সব জল সমুদ্রে যায় না
তীরের আদর নিয়ে কিছু জল হারিয়ে ফেলে ঘরের ঠিকানা
দুষ্টুমি করতে গিয়ে লুকিয়ে থাকে বালিকার চুলের বেণীতে
চোখে এঁকে আকাশের আলিঙ্গন কিছু জল মেঘ হয়ে যায়

সব জল সমুদ্রে যায় না
কিছু জল গান গেয়ে হয়ে যায় সফেদ ফেনার ফুল;
বালুচরে বসে বসে হাসে শেষ হাসি।
কিছু জল প্রাণ খুলে নৃত্য করে নৌকার গলুই ধরে; রোদ্রকে জড়িয়ে বুকে বলে
ভালোবাসি।

জলের আয়না

শাহ্ শামীম আহমেদ

পালাচ্ছে ঘরবাড়ি নদী ও নারী, নিসর্গের শাড়িপরা জলপাই গ্রাম;
আর চলন্ত ট্রেন থেকে তুমি জানালায় বাড়িয়েছ গ্রীবা;
কী নাম তোমার শাহজাদী? বিষণ্ন আর উজ্জল দুটি চোখ তোমার।
মুহুর্মুহু বিস্ফোরিত কবির হৃদয়ে, মুখখানি তৃষ্ণার্ত কবির চোখে
জলের আয়না! হাওয়ায় উড়ছে চুল, খোলা চুল কল্পচোখ খোলে।
এরকম চিত্রকল্প আমি ও দেখেছি।
ছেঁড়া মেঘের মতো ভাবনাগুলো ছিল বড় এলোমেলো বেগুনী ও নীল।
তাই দ্বিধার হাতখানি বাড়িয়েছি বড়ই দেরিতে।
শেষ বিকেলের ট্রেন তখন ফোরাত নদীর উপর;
সামনে ফোরাত নদীর উদারতা নারীকে কোমল করে।
তাই তুমি বাড়িয়েছ খোপের পায়রার নরম বুকের মতো ঠান্ডা ও উজ্জ্বল হাত।
এই হাতখানি আমি আজও রেখেছি আমার বুকের গভীরে।
একটু ঠান্ডা হলে এই হাতের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করি।
একটু উজ্জ্বল হলে– মনে পড়ে তৃষ্ণার্ত কবির চোখে জলের আয়না।

নাট্য-দৃশ্য

টি এম আহমেদ কায়সার

কিছু রক্ত সঞ্চয় করে রাখছি
পরবর্তী দৃশ্যের জন্যে—

এসব স্থূল ঝড় থেমে যাবার পর
এক শান্তম্লান মাস্তুল-নোয়ানো সন্ধ্যায়
আমাদের দেখা হবে
মাঝখানে কালো গহ্বরের স্থলে
একটা নদী থাকলে ভালো হয়
এতকাল আত্মদহনে যদি তোমার মুখখানা পুড়ে যায়;
মুছে যায় চিবুকের অপার্থিব জ্যোতির্ময় রেখাগুলো
একখানা মশাল বরং জ্বালিয়ে রাখতে পার
মুখের কাছে

পরের দৃশ্যে
একটা লুপ্ত ভ্রূণ ডুকরে কাঁদবে
ধূপের সব আগুন নিভে যাওয়া অব্দি;
তোমার চোখও ঝাপসা হয়ে যাবার কথা, ক্রমে
কিছু রক্ত সঞ্চয় করে রাখছি

আপস

সারওয়ার-ই আলম

আপসটা অনিবার্য আজ!
তাই ক্রমশ আপস করছি ভাবনা ও বিশ্বাসে,
চিন্তা ও আশ্বাসে,
আদর্শ ও আলাপনে।
আপস করছি দর্শনে–
জীবনের অমোঘ প্রয়োজনে।

যেন কোথাও নীতি নেই আজ!
তৎস্থলে আপসের উৎসব সমাজের স্বার্থে, বৈষয়িক অর্থে।
আপস আছে রাজনীতির প্রয়োজনে, রাষ্ট্রের আয়োজনে।
কখনো আপস করছি কেবলই আপসের আহ্বানে।

যেন কোথাও সাহস নেই আজ!
তৎস্থলে কেবলই আপসের কারবার,
সুযোগ নেই একাকী দাঁড়াবার।
আপস করছি মিলবার উসিলায়,
মিশবার সিলসিলায়।
কখনো আপস করছি কেবলই জীবনের প্রয়োজনে।

যেন কোথাও বিবেকের তেজ নেই আজ!
তৎস্থলে সবকিছু মেনে নিয়ে চলা চাই,
মাথাটাকে নত করে হাঁটা চাই।
সুযোগ নেই প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়াবার।
চোখ বুঁজে থেকে থেকে, বিবেককে ঢেকে রেখে সবকিছু মেনে নিয়ে চলা চাই!

যেন কোথাও দ্রোহ নেই আজ!
শিরদাঁড়া খাড়া নেই!
বুঝে বুঝে ন্যুজে ন্যুজে চলাটাই নীতি।
প্রতিবাদে জ্বললে, সত্যটা বললে
কোণঠাসা করা হবে– এইটাই রীতি।

আপসটা অহেতুক নয় আজ!
যেন জীবনেরই অংশ!
পদে পদে জয়ী হতে, স্বার্থে শান দিতে
আপসের কাছে সঁপে দিই বিবেকের সর্বাংশ!

ধানের ঈশ্বর
মুজিব ইরম

শেষ হলো সহি মনে কাদাজলে চাষ্‌সবুজ জায়নামাজ বিছিয়েছে মাঠবাতাসে এসেছে ভেসে আজানের সুর, আকামত হাঁকৃলকলকে চারা গাছ নিয়ত বেঁধেছেকে যেন ধরেছে সুর সুললিত সুরাগর্ভবতী ধানগাছ রুকুতে নেমেছে ঝিম ধরা নীরবতা জমিতে জমিতে পাকাপোক্ত ধান গাছ সিজদায় নত মুসল্লিরা রূপগ্রস্থ হাওরে বাঁওড়ে এসে গেছে ধানের মৌসুম ঘরে ঘরে বেড়ে গেছে জিকিরের ধুম মনে নাই কবেছিল নিদানের দিন মোনাজাতে ফুটে ওঠে ভাতের বলক, মোনাজাতে পাত ভর্তি রূপের ঝলক।

কে তবে দিয়েছে এনে সঙ্গমের রাত, কে তবে দিয়েছে বেড়ে সদ্যফোটা ভাত! এই বার ঘরনারী দিয়েছিল বর, এই বার পরিতৃপ্ত ধানের ঈশ্বর।

মানুষ তুমি
ফারাহ্ নাজ

হে পুরুষ!
তুমি প্রভু হও, পিতা হও,
পতি হও, প্রিয়তমেষু হও,
পুত্র হও কিংবা সহোদর ভাই।
না হয় কোনো অজানা প্রিয়জন,
সাথি বা কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু,
সহকর্মী না হয় সহনাগরিক,
মুনি-ঋষি হও, না হয় পীর-পয়গম্বর,
না হয় কোনো সাধারণ পথিক
একই পথে চলার।

হে পুরুষ,
তুমি তো কত কিছুই হতে পারো?
অথচ তুমি কি না হতে চাইলে ধর্ষক!
সমগ্র মানবিক গুণাবলিকে হীন করে,
তুমি অসুর সত্তা কেন প্রাধান্য দিলে?
যে মনুষ্যত্ব তোমাকে মানব বানাবে,
সে তাকেই তুমি বলি দিলে
তোমার পশুত্বের কাছে?

হে পুরুষ,
তুমি জেগে উঠো!
বধ করো তোমার ঐ ধর্ষক সত্তা,
নিরোধ করো সেই মনুষ্যত্বহীন প্রবণতা।
তুমি তো আমারই মতো 'আশরাফুল মাখলুকাত',
সৃষ্টির সেরা জীব,
আমি তো জেনে এসেছি তুমি

সত্য ও সুন্দরের পূজারি,
আমার মতোই আছে তোমার
সুন্দর মানবিক দিক।
আজ তবে কেনো চারদিকে
তোমায় নিয়ে এত ধিক্?

আমারই হাত ধরে তুমি হাল ধরেছো এই বিশ্বের।
পাড়ি দিয়েছ বিশাল প্রশান্ত, আরব সাগর
নীল নদ ও সিন্ধু নদী প্রান্তর,
গড়ে তুলেছ কতো মহা সভ্যতা অতি বিস্ময়কর।
পাহাড়ের বুকে তৈরি করেছ জনপদ সুবিন্যস্ত।
জল সেচে তুলে এনেছ রাশি রাশি সব মুক্ত,
নভোচর হয়ে পাড়ি দিয়েছ মহাকাশ সুবিশাল,
চলেছ জয় করে গ্রহ- উপগ্রহ
মহা সমারোহে, নির্ভার।
এনেছ জীবন ও জলের সন্ধান,
স্বপ্ন দেখেছ বিশ্ব জয়ের অতি দুর্বার!
হয়েছ তুমি মহিমান্বিত সকল শুভ সৃষ্টিতে,
কেনো মিছে বিনাশ করো মঙ্গলময় এই সত্তাকে?

আমার মতোই তুমি ধারক ও বাহক-
এই জীবনের কারিগর,
আমার মতোই তুমি নিবিড় সৃজনশীল।
এর চেয়ে বলো বড় কি আছে সত্য ও সৃষ্টিশীল?
জেগে উঠ তুমি বধ করে তোমার পশুত্ব
ধর্ষক নয়, মানবরূপে হয় মহিমান্বিত।

হে পুরুষ আমার,
মানুষ তুমি, জেগে ওঠ প্রিয় তাই,
তোমার মাঝে বরাবর আমি
একটি মানুষ দেখতে চাই।

পাপদ্বয়ের কথোপকথন

কামরুল বসির

সেদিন সন্ধ্যায় দুটো পাপ এসেছিল নিরবে হামাগুড়ি দিয়ে;
আমি তাদের দেখিনি, তবে কথোপকথনের ফিসফিস হলকায়
আমি উষ্ণতা আর গন্ধমের অপার্থিব ঘ্রাণ পেয়েছিলাম পুরোটা সময়ভর।
একটি পাপ কিছুটা সময় চাইল,
অন্য পাপটি বিবশ রইল সুনশান নীরবতায়–
সুখ আর যাতনার অভূতপূর্ব শিহরনে সে মুছে ফেলতে চাইলো পারিপার্শ্বিক কোলাহল;
কৈফিয়াতের স্বরে বল্লো: স্নায়ু এবং কল্পলোকের মাত্রাবিন্যাসে আমার দাহন।
রতি এবং বিপরীত কামনার মোহাচ্ছন্ন যজ্ঞে আমার অধিষ্ঠান–
তোমাকে দিতে পারি সর্বোচ্চ সুখের প্রমোদ নিকেতনের খোজ!
তার কথা শেষ হলে আমি প্রশ্ন করলাম: অতঃপর কী!
ক্ষরণ প্রমাদের পর আমার জন্য কী অবশিষ্ট রইবে–
অস্ফূটস্বরে সে বল্লো– আত্মগ্লানি!

আমি এবার অন্য পাপটির মনোযোগ আকর্ষণ করে
তার বক্তব্য শুনতে উৎসাহী হলাম–
দ্বিতীয় পাপটি কিছুটা যান্ত্রিক স্বরে আমাকে বলল:
বৈভব এবং সম্পদের মধ্যেই মানবজীবনের তাবৎ সফলতা–
তোমার গ্রীবা সমুদয় জগতের মহিরুহ হয়ে ছড়ি ঘুরাবে উদয়াচল এবং অস্তাচলে;
চোখের দুরবীনে তুমি হারুত আর মারুতের নিষিদ্ধ মুদ্রায় শাসন করবে
জীবনকাল! ঐশ্বর্য্যই পরম এবং প্রগাঢ় প্রাপ্তি!

কথোপকথন শেষে নেমে এলো আশ্চর্য নির্জনতা আবার।
আমি ম্লান হেসে পাপদ্বয়ের কাছে আমার অন্তিম প্রশ্ন ছুড়লাম–
অথচ আমি অমর হতে চেয়েছি–
আমি অঙ্কের ছক কাটিয়ে বার্ধক্যের চামড়ায় বুলাতে চাই অবিনশ্বর শ্বেতপল্লব!
আমি অনুভব করলাম, আমার ঘরে আর কেউ নেই।
অক্ষম পাপদ্বয় নিজেদের অক্ষমতা ঢেকে চলে গিয়েছে নীরবে।

সহস্রাব্দের সহিসে যুথবদ্ধ ইতিহাস

সাইম খন্দকার

শীত জ্যাকেটের ফোলানো কানকোটি বিস্মৃত হচ্ছিল
সদ্য অতিক্রান্ত হওয়া ওয়াটারলু'র অন্ধ গলিতে;
প্লাটফরমের ফর্সা বেদীতে তখনো সহস্র ফুলকপি:
জিপার এবং পকেট জুড়ে ঘনবদ্ধ হচ্ছিল তুষার কাঁকড়ারা।

দৌড়ানোর তরিকা মধ্যাহ্নেই শিখেছিলাম: ইয়র্কশায়ারের
অনুল্লেখ্য গেঁয়ো খরগোশগুলোর কাছে।
তাই সন্ত্রস্ত হতে পারাটাই ছিল শীর্ষ প্রণোদনা,
আর জুতসই শেষ লাফটিই আমাকে প্রোথিত করেছিল
শেষ কামরার পাটাতনে।

লাফানো হৃৎপিণ্ডকে পোষ মানাচ্ছিলাম, রান্নাঘরে রাখা বড়পাত্রের কৈ-এর মতো:
তাই চোখ দুটোও ছিল টার্গেট শূন্য।
আলোর প্রতিফলন সূত্র সক্রিয় হতে বেশিক্ষণ লাগেনি অবশ্য
বিপরীত চেয়ারে মূর্তিমান হতে থাকলেন: এক ইউরোপিয়ান আশ্চর্যবতী।
ক্রমশ দৃশ্যান্তরিত হওয়া ভুট্টার হলুদ,
খামার বাড়ির চিমনি আর ল্যান্ডস্ক্যাপের
বিরক্তিকর উপাদানে–
ক্লান্তিকর অজুহাত খুঁজছিলাম,
ফেলে আসা শৈশবের ভুলে যাওয়া জ্যামিতি প্রবল হলো
পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে দেখে নিচ্ছিলাম
আশ্চর্যবতীর চিবুক, তার স্বর্ণালী রোমশ রেখা।
প্রাচ্যের মাটির মতো এম্রোটিক চুল আর অবনত নাক নিয়ে আমিও বিস্ময়ের
বাষ্প উড়াচ্ছি– তার ব্যস্ত চৈতন্যে।

সহস্র প্রশ্ন নিয়ে দুজনই আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি খেলায় মত্ত,
মানুষ: তাই ধরা না খাওয়ার ফন্দিটিও আমাদের অনুকৃত।
অনুভূতির ধারাভাষ্যগুলো অনূদিত হচ্ছিল শব্দহীন দ্রুততায়,
কিন্তু নিজেকে অপ্রকাশের চলমান কৌশলে ভারাক্রান্ত হচ্ছিলাম আমরা।

ঘাম আর রক্ত গন্ধের অংশীদার আমরা, জোড়া পশু হয়েই উঠেছিলাম নুহের নৌকায়:
সহস্রাব্দের সহিসে পার হয়েছি যুথবদ্ধ ইতিহাস।
তবু কেন এই অনুচ্চার, প্রতিবন্ধকতার পেরেক?
তবু কেন আমাদের... নেই কোনো সবুজ সাঁকো?

বেদনার মানচিত্র
লুৎফুন নাহার

যার ভাবনায় বোঁদ হয়ে বয়ে গেল একটি রোদেলা দুপুর
নিক্কন থামিয়ে চুপ করে পড়ে রইল এক জোড়া সোনালি নূপুর
নিশ্চিত সে তুমি জানবে না কোনোদিন কতো নিশি জেগেছে আঁখি
তোমার আশার পথ চেয়ে বুকের ভেতর কেমন রব উঠেছে ত্রাহি ত্রাহি

বলতে না পারা শত অসমাপ্ত আখ্যান বলা হয়ে গেলে নীরবতায়
তুমিও বুঝে নেবে একদিন হৃদকম্পের তারতম্য
সেদিন চৈত্রের আকাশ-নীলে লীন হয়ে অজস্র নীল বেদনার মানচিত্র
ভোরের হাওয়া ভুল সংকেত দিবে তবু জানি তুমি ভোরের মতোই পবিত্র।

স্মৃতি জমা রেখে আঁধারের সোপানে বিস্মৃতির অতলে তলিয়েছে যা কিছু
এই সায়াহ্ন বেলায় তাকে খুঁড়ে এনে মিলবে যে স্কেলিটন
সেটার পর্যবেক্ষণে তোমার সত্তা নেই কোথাও, এ শুধুই এক অবজেক্ট।

রক্ত ঝরাও, রক্ত গড়াও

সৈয়দ আফসার

কাঁপছে বাতাস। রোদে পাতো হাত। ছায়ার বুকে হাত রেখে আমি আরও গহীনে যাব, প্রকাশ্যে তুমিও এসো গহীন বনে। আমাকে কাঁপাও বন্ধু, শুধু কাঁপিও না পুরানো ক্যাকটাস। কুড়িটি আঙুলের তোলপাড় ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ো ফায়ারবক্সে; আমাকে সারিয়ে তোলো পুরানো অসুখ! অপেক্ষা, বাতাসে উড়াও, বাতাসে দাঁড়াও। দশটি আঙুলে আলতা পরাও বাকি দশ আঙুলে জমাও অনুভব। জিজ্ঞেস করো কতটুকু ছুঁয়েছে পাতালের জল? পাতো হাত, যাপন করি আঙুলের হাড়গোড়, আয়নার বিপরীতে খুঁটি উষ্ণ নির্যাস। হাত না নাড়ালেও রক্ত সঞ্চালন হয়। হাত কাটলে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণা করে, এমনিতেই শুকায়। এটাই সহজ অভ্যাস। রক্ত ধরে নিজের কথা ভাবছি। কাঁপছে বাতাস কুড়িটি আঙুলের শ্বাস। কেবল রক্ত ঝরাও, রক্ত।

ভালোবাসার কোনো তালাক হয় না

সৈয়দ রুম্মান

একটুও মিথ্যে বলছি না
বুকে এক জগদ্দল বেদনা নিয়ে দেখি
প্রতিরাতে আমিহীন তুমি কী নিঠুর সঙ্গমরত,
রোলারকোস্টারে চেপে যাচ্ছে তোমার সময়, ঘাম, কাম... ধানমণ্ডি, বেরিবাঁধ,
কালেঙ্গার পাহাড়..

সেখানে আমার হাতগুলো দূরে,
সেখানে আমার কণ্ঠে নেই শীৎকার;
এ কেমন নির্মম বৈক্লব্যে চেয়ে থাকা তোমার দিকে...!

আর পৃথিবী বিদীর্ণ করে বলা–
বিচ্ছেদ হয় শুধু সঙ্গমের
ভালোবাসার কোনো তালাক হয় না।

দৃশ্য ও অন্ধকার

কামরুন নাহার রুনু

আমাদের পরিচয় পর্ব সাড়ার আগেই চোখে চোখে দেখেছিলাম দুজনের সুঁই সুতো জীবন। এখন তুমি কাটছো সাঁতার মাছের এঁদো পুকুরে আর আমি জন্মের ওপাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর বুকে আত্মসমর্পণ করেছি মাত্র। আমাদের এই ছাড়াছাড়ি পর্বে শুধু বেড়িয়ে আসে পড়শির বাগাড়ের ঘ্রাণ, বাতাসে ভেসে আসে নিছক ক্ষয়ক্ষতির অঙ্ক, দৃশ্য ও অন্ধকারের মাঝখানে ঝুলে থাকে কিছু অব্যক্ত ছুঁয়াছুঁয়ি শিল্পের উষ্ণতা।

তুমি তো জানোই, পূর্ণিমায় গৃহস্থ ঋণ ভুলে গিয়ে পাকা লেবুর মতো রোদ পোহায়। আমাদেরও ফুল কিংবা বৃষ্টির অনুষঙ্গে উদগত হতে পারত মাছরাঙ্গা স্বপ্ন। বৈদগ্ধ অভিলাষে সবুজে ভরে উঠতে পারত বুকের চারপাশ। চলো না আর একবার শুক্লা দ্বাদশীর পূর্ণ চাঁদে জ্যোৎস্নায় পূর্ণতা পাই...

মেঘ কানন

নূরজাহান শিল্পী

রৌদ্র নিভে গেলে নক্ষত্রেরা মেখে যায় আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
মোহাচ্ছন্ন পৃথিবীতে নৈঃশব্দ্যের দেয়াল সেঁধিয়ে
উঁকি দিয়ে যায় কাস্তরি চাঁদ।

আঁধার শেষে আলো আসে আলো হারায় আঁধারে
সাতকাহনের উপখ্যানে জীবনটা বাঁধা নোঙরে।

দূরদৃষ্টিতে থেকে যায় অদেখা কিছু–
আবার কিছু সত্য পথ হারায় অচেনা বন্দরে।

আঁধারে মন পিদিম জ্বেলে চাঁদকে বন্ধক রেখে যাই জোছনার চিরচেনা আলোয়।
শহরের রাতজাগা তারায় নিজেকে খুঁজে নেয়ার ব্যর্থহীন প্রয়াসে,
আমার আমি কে খুঁজে বেড়াই এক আপেক্ষিক সূত্রের ধ্রুমজালে।

আষাঢ়ি ঢল নামে নিভৃত নয়নে
জলপাই রঙ জড়িয়ে আঁচলে
সপ্তর্ষি আলো খুঁজে মেঘ কাননে।

ভালোবাসা চির রঙিন

আজিজুল আম্বিয়া

আমার শহরে এখন দিন তাই ভালোবাসা চির রঙিন,
তোমার শহরে অল্প মেঘ তাই এখানে পায় না স্বপ্ন আপন রূপ।
এই পৃথিবী স্বপ্ন দেখায়, স্বপ্নের মতো মানুষ বানায়,
আমার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায় পায় না প্রাণ আপন আলোয়।

আমার শহরে এখন দিন তাই ভালোবাসা চির রঙিন,
ভালোবাসার অচিনপুরে রাজকুমারী হাসে
দিনের আলো থাকলেও প্রেমিক পায় না মনে সুখ,
ভালোবাসার এই সময়ে প্রেমিকরা নিশ্চুপ।

আমার শহরে এখন দিন তাই ভালোবাসা চির রঙিন,
তোমার কারণে জ্যোৎস্না রাত এতো মধুময় হয়,
রোম নগরী ধ্বংস হয়, আশাহত হয় জীবন।
অবোধ মানুষ কখনো গলায় লাগিয়ে দেয় পাশ।

আমার শহরে এখন দিন তাই ভালোবাসা চির রঙিন,
তুমি আগুন, তুমি পানি
তুমি মানব, তুমি দানব,
তোমার শরীরে তাই ভালোবাসার চিরচেনা রূপ খুঁজি,
তোমার কাছেই আলো খুঁজি, তুমিই স্বপ্ন তুমিই মহাকাশ।

আমার শহরে এখন দিন তাই ভালোবাসা চির রঙিন,
ভালোবাসি তাঁকে যে মূল্য দিতে জানে,
ভালোবাসি তাঁরে যে পারে না, আমায় ভুলতে
ভালোবাসি তাঁরে যে আমার ভাগ্যবিধাতা হয়ে আছে।

গল্প
(প্রথম পর্ব)

সূচি

৮৩ পরিচয় – কাদের মাহমুদ
৮৫ উট – কামাল রাহমান
১০১ আবু জাহেলের প্রত্যাবর্তন – দিলু নাসের
১০৮ মেন্দি মেন্দি ভালোবাসা – লুনা রাহনুমা
১১৪ একটুকরো সেলফায়িত রিফলেকশন – এ কে এম আব্দুল্লাহ
১২১ না মানুষ – মিল্টন রহমান
১২৮ আব্দুল জলিলের জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত জটিলতা – সাগর রহমান

পরিচয়

কাদের মাহমুদ

দুপুর বেলা।

শহীদুল আলম ঢাকা থেকে ফুলবাড়িতে ফিরছিলেন। সেখানে তাঁর বাড়ি।

শ্রীধামপুরের পরে, ক'জন যাত্রীকে নামানোর জন্যে বাসটা থামল। বাসের জানালা দিয়ে শহীদ তাকিয়েছিলেন। সহসা দেখলেন, পথের পাশেই আলু ক্ষেতের কিনারায় কিছু একটা পড়ে আছে। মড়া কী?

একটা শিয়াল টানাহ্যাচরা করছে। কয়েকটা কাক ভিড় করে আছে, নিরাপদ দূরত্বে। আশেপাশে জন-মানব নেই। শহিদের বুকটা ধক্ করে উঠল।

'ড্রাইভার! আমাকে নামতে দাও!' বলে তিনি নিজের ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে হুড়মুড় করে নেমে পড়লেন। কেউ কিছু খেয়াল করলো না। বাসটা হুস করে চলে গেল।

শহীদুল আলম ছুটে অকুস্থলে গেলেন।

তিনি সজোরে 'হৈই, হৈই!' করতেই শিয়ালটা পালালো। কাকগুলো কেবল দূরে সরে গেল।

কাছে গিয়ে তিনি বুঝলেন, তাঁর আশঙ্কা সত্যি। শেষকৃত্য হয়নি বলে কোনো মানব সন্তানের পড়ে থাকা লাশ পশুপক্ষীতে খেয়েছে।

বিশাল প্রান্তরের মাঝ দিয়ে গেছে পাকা সড়কটি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শহিদ দেখলেন, চরাচরে তিনি একাকী। আগের যাত্রীরা উধাও। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

রোদ পড়ে এলে, দূরে দুজন কৃষককে দেখা গেল। হাত ইশারায় তাঁদের ডেকে আনলেন।

ব্যাপারটা বুঝবার পর, তাঁরা নিজ গ্রামে ফিরে গেলেন। কয়টা কোদাল ও একটা চাটাই, দড়ি ইত্যাদি হাতে-হাতে করে তারা ফিরে এলেন: সাথে আরো কয়েকজনা।

একজন মৌলভী সাহেবও। তিনিই সবার আগে, লাশটা দেখতে গেলেন। ছিন্নভিন্ন লাশের গতরে তখনো যে লুঙ্গি-গেঞ্জি তা ময়লা ও ছেঁড়া। হতদরিদ্র লোকটির চেহারা চেনা দায়। তবে তিনি পুরুষাঙ্গটি দেখলেন, তার সুন্নত করা হয়নি।

ফিরে এসে বললেন, ‘মূর্দা হিন্দু- মুসলমান নয়। জানাজা হবে না।’ এই বলে তিনি নিজ মনে ফিরে গেলেন।

তবে গ্রামবাসীরা রয়ে গেলেন। তারা বললেন, তাদের আশেপাশে কোনো হিন্দুর বসবাস নেই। ডোম পাওয়া যাবে না।

পচা মানুষের দুর্গন্ধ বড়ই দুর্বহ। সবাই গামছা দিয়ে নাক মুখ ঢাকলেন। শহীদুল আলম নাকে রুমাল চাপবার চেষ্টা করছেন।

তিনি ও কয়েকজনে মিলে মড়াটা চাটাইয়ের মোড়কে বেঁধে ফেললেন। অন্যরা কোদাল দিয়ে সড়কের ঢালে একটি গর্ত খুঁড়লেন। কিছুটা সময় তো লাগলই। ঘামও ঝরল।

তারপর, বিনা আচারেও বিনা মন্ত্র উচ্চারণে নাম-অজ্ঞাত পরিচয়-অজ্ঞাত মানুষটির মরদেহটি মাটি-চাপা দেয়া হলো।

সন্ধ্যার বিধুর আলোয় সবাই সড়কে উঠে এলেন। কিছু দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল।

শহীদ অপেক্ষায় আছেন, যদি পরের বাসটা আসে। গ্রামবাসীরা তখনও যাননি, হয়তো তাঁকে বিদায় দেবেন বলে।

তাদেরই একজন শহীদকে মোলায়েম স্বরে বললেন, ‘ভাই, আপনি ছিলেন বলেই, পথের ঐ লোকটার মাটি হলো। এ বড় ভালো কাজ হয়েছে। ... তবে কিছু মনে করবে না, আপনি হিন্দু, না মুসলমান?’

এ কী প্রশ্ন! শহীদ যেন আঁৎকে উঠলেন। এমন সময় এমন প্রশ্নও কেউ করতে পারে! মানুষের ঔসুক্য কী বিচিত্র!

তখনি বাঁক থেকে হঠাৎ একটা বাসকে আসতে দেখা গেল। তৎক্ষণাৎ শহীদ হাত নাড়তে লাগলেন। বাসটাও এসে থামল তাঁর কাছে। গ্রামবাসীদের দিকে সামান্য হাত নেড়েই, শহীদুল আলম দ্রুত বাসের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। যেন দেরি করলে তাকে ছাড়াই বাসটা ছেড়ে চলে যাবে।

একটা আসনে বসে মনে মনে বেঁচে গেলেন শহীদুল আলম।

উট

কামাল রাহমান

মরুবাসী ওরহান সালেমের জীবনের শুরুর দিকের দিনগুলোর স্মৃতি এখনো হালকা মেঘের মতো ওর মনের ভেতর মাঝে মাঝে উড়ে আসে। আরো একটু স্পষ্ট করে বললে ওর হাঁটতে শেখার দিনগুলোর স্মৃতি প্রায়ই উঁকি দিয়ে যায় ওর গোধূলি আকাশে। ওর মনে হয় সেই তখন থেকে সে পেরিয়ে চলেছে এক সীমাহীন মরুপ্রান্তর। রুক্ষ, নির্মম, উষ্ণ, নিষ্প্রাণ, এসব দিক থেকে ভেবে দেখলে গোবি, সিনাই অথবা নেভাদা বা সাহারা প্রভৃতি সব মরু হয়তো একই রকম। বালিয়ারি, বাতাস, পাথর এসব হয়তো হতে পারে কিছুটা ভিন্ন। মরুজীবনের প্রতি অথবা নিজেরই প্রতি এক অজানা অবজ্ঞায় সে হেঁটে চলেছে উদ্ভ্রান্তের মতো। প্রতিকূল কোনো পরিস্থিতি রোধে সামান্য কোনো আয়োজনও নেই ওর। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটা মাদী উট, অসম্ভব কোনো বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য জোর করে গছিয়ে দেওয়া কয়েকটা মোহর, আস্তিনের নিচে লুকিয়ে রাখা ছোট্ট একটা চাকু, সামান্য কিছু শুকনো খাবার, জলের দুটো মশক, উটের পিঠে চাপানো ছোট্ট একটা তাঁবু, অন্তরে ধরে রাখা মায়ের কিছু উপদেশ, এই-ই সব ওর চলার পথের পাথেয় অথবা বেঁচে থাকার উপকরণ। মরুজীবনের আরো একটা দিনের শুরুতে দূরের দিগন্ত রেখায় চঞ্চল প্রাণের চিহ্ন দেখে সঙ্গী উটটাকে বসিয়ে দেয় সে বালিয়ারির ভেতর। মুখে এক ধরনের অদ্ভুত শব্দ 'উখ্‌ট, উখ্‌ট' করে শান্ত থাকতে বলে ওকে। নিজেও লুকিয়ে পড়ে বালুর খাদে। কঠিন মরুচারী জীবনে ক'টা বিষয় এড়িয়ে চলে সে খুব যত্ন করে। প্রথমটা মানুষের ছায়া, দ্বিতীয় মরীচিকা ও তৃতীয়টা হল ঝুমঝুমি সাপ। ভাগ্য হয়তো ভালো নয় আজ। লুকিয়ে পড়ার আগেই ওকে দেখে ফেলেছে ওরা। ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসে ওরা ওর দিকে। দৃষ্টিসীমার ভেতরে এলে ওদের দেখে খুব সুবিধের মনে হয় না। মলিন জোব্বার পকেটে হাত ঢোকায় সে। ছোট্ট একটা চাকু মাত্র ওখানে যা দিয়ে দৈনন্দিন টুকটাক কাজ মেটানো যায়। ওটা দিয়ে কোনোভাবেই একটা ডাকাত দলের সঙ্গে লড়া যায় না। মনে মনে ভাবে সে যে

কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারবে এটা দিয়ে। প্রথমে চেষ্টা করে এড়িয়ে যেতে যা সে বরাবর করে থাকে। ওকে নিস্পৃহভাবে বসে থাকতে দেখে ঐ দলের সর্দার লম্বা শিংওয়ালা একটা ভেড়া লেলিয়ে দেয় ওর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে সে যে একটা খারাপ সময়ের মুখোমুখি হয়েছে সে। একটু ভাবে। ওর মনে হয় যে শুরুতেই এটা শেষ করে দেওয়া দরকার। চট করে হাতে নেয় ছুরিটা। প্রথমে দ্বিধা হয় একটু। এত ছোট এটা যে ভরসা হয় না। একটা ডুয়েল হয়তো লড়া যায় এটা দিয়ে। এক দল মানুষ সামলানো অবশ্যই কঠিন। নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে ঐ প্রাণিটার শিং আঁকড়ে ধরে সে। গলনালীর ভেতর সেঁদিয়ে দেয় ছুরিটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে এসে চোখমুখ ভাসিয়ে দেয় ওর। মুহূর্তের ভেতর ওটার সামনের একটা পা হাঁটু থেকে কেটে নেয়। ওটা নিয়ে দৌড়ে এগিয়ে যায় ছোট্ট দলটার দিকে। এত দ্রুত এসব ঘটে যে হতভম্ব হয়ে পড়ে ওরা। এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজটা শেষ করে ফেলায় ওরা বুঝতে পারেনি যে একটা সাধারণ মানুষ সে। দৈত্যদানো ভেবে আতঙ্কে দ্রুত পিছিয়ে যায়। নিজের এমন বীরত্বে একটু অবাক হয় সে। মজাও পায় কিছুটা। ওদেরকে আরেকটু ঘাবড়ে দিতে গলা ফাটিয়ে এক ধরনের অদ্ভুত শব্দ করে। তীব্র ঐ উ-লা লা-লা-লা ধ্বনি খোলা প্রান্তরে মরুঝড়ের আর্তনাদের মতো শোনায়। আরো জোরে দৌড়ে পালাতে থাকে ওরা।

ঐ দলটার অনেক পিছনে ওদের একজনকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে এগিয়ে যায় সে। ওরা হয়তো ভেবেছে সে কোনোভাবে আহত করেছে ওকে। মুহূর্তের ভেতর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে যায় ওরা।

ওকে এগিয়ে যেতে দেখে উঠে বসে লোকটা। শরীরের ধুলো ঝেড়ে বলে, ‘ঠিক আছি আমি।’

চোখ ধারালো করে বলে ওরহান, ‘তা তো জিজ্ঞেস করিনি তোমাকে!’

ওর কাছ থেকে কিছুটা সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করে সে। বলে, ‘না, ভাবলাম মাটিতে পড়ে আছি দেখে হয়তো ভেবেছ যে কিছু একটা হয়েছে আমার।’

কণ্ঠে রুক্ষতা ধরে রেখে বলে ওরহান, ‘তা ভেবেছি। উঠে দাঁড়াও তো এখন সোজা হয়ে। সঙ্গে অস্ত্রটস্ত্র কী আছে বল দেখি?’

‘না, কিছু নেই। এই দেখো, ঝাড়া হাত পা।’ এক চক্কর ঘুরে ওর শরীরটাকে দেখায় সে।

নিশ্চিত হতে পারে না ওরহান। বলে, ‘সন্দেহ হচ্ছে।’

প্রতিক্রিয়ায় একটু আহত শোনায় কালো মানুষটার কণ্ঠ। বলে, 'সব খুলে ন্যাংটো হব?'

'না। শুধু জোব্বাটা খুলে নিচে রাখো। আর পিছিয়ে দাঁড়াও কয়েক পা।' আদেশের সুরে বলে ওরহান।

ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দেখে ওটা ফেরত দেয় সে লোকটাকে। ওর ফন্দিটা বোঝার চেষ্টা করে। বালুতে ঘষে পরিষ্কার করে কোমরে গুঁজে রাখে ওর ছুরিটা। দুম্বার কাটা পা ছুড়ে ফেলে ওটার পাশে। কষ্ট হয় এখন ঐ প্রাণীটার জন্য। নিজেকে রক্ষা করতে যেয়ে একটা প্রাণ কেড়ে নিতে হল! বিকল্প কিছু ছিল না আর। ভয় না দেখিয়ে জয়ী সে হতে পারত না ওদের সঙ্গে। শারীরিক সংঘর্ষটা এড়ানোর কোনো উপায় ছিল না। পালিয়ে বাঁচার কোনো পথও নেই এই মরুভূমিতে। প্রাত্যহিক জীবনের এই সব নৃশংসতা থেকে দূরে থাকার জন্য লোকালয় ছেড়ে এসেছিল সে। অথচ এখানেও এই অকারণ রক্তারক্তি! ভালো লাগে না এসব।

মনে মনে ভাবে সে, 'ঐ লোকটার বিষয় শেষ করে দিতে হয় এখন।' ওকে জিজ্ঞেস করে, 'যদি কিছু না হয়ে থাকে তোমার তাহলে মাটিতে পড়ে রয়েছিলে কেন?'

তর্জনী ও মধ্যমা তুলে দেখায় সে। বলে, 'দুটো জবাব আছে এটার।'

একটু অবাক হয় ওরহান। বলে, 'ভণিতা না করে প্রথমটা বলো।'

সরাসরি এবার সে তাকায় ওরহানের চোখের দিকে। বলে, 'মুহূর্তের জন্য তোমার চোখ দুটো দেখতে পেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি যে অকারণ কোনো অত্যাচার নেই ওখানে। ভয় পাইনি তোমাকে।'

একটু কৌতুকের স্বরে বলে ওরহান, 'বাহ্, তুমি তো এক অসাধারণ মানুষ হে! চোখ দেখেই বুঝতে পার।'

চোখেমুখে একটু হাসির ভাব ফুটিয়ে বলে সে, 'মানুষের মনের আয়না হল চোখ।'

ওর বিষয়ে একটু ভাবে ওরহান। মনে মনে কোনো ফন্দি আঁটছে কিনা বোঝার চেষ্টা করে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'তোমার দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ কেন?'

কয়েকটা মাত্র বাক্য বিনিময় হয়েছে ওদের মধ্যে। এতেই কিছুটা নৈকট্যভাব এসেছে ওদের ভেতর। পারস্পরিক সন্দেহ ও ভীতি ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। কালো মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে সে বলে, 'আমি পালিয়েছি।'

অবাক হয় ওরহান। জিজ্ঞেস করে, 'কেন?

মুখের রেখায় ঐ হাসিটা ধরে রেখে বলে সে, 'ওটা হল তোমার প্রশ্নটার দ্বিতীয় জবাব।'

একটু খটকায় পড়ে ওরহান। বলে, 'মনে হয় প্যাঁচাচ্ছ। সোজাসুজি বলো কেন পালিয়েছ ওদের কাছ থেকে?'

বিষয়টা যেন আবার অন্য দিকে ঘুরে না যায় তাই সরাসরি বলে সে, 'ঐ দলের কেউ না আমি। সামান্য এক দাস।'

স্বগতোক্তির মতো বলে ওরহান, 'হুম... সামান্য এক দাস!'

দু'জনেই চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ওরহান, 'দাসদের পালানোর শাস্তি কী জানো?'

নির্বিকারভাবে জবাব দেয় সে, 'জানি, এই দেখো।'

জোব্বা খুলে ওর পিঠ দেখায়। উরু ও পশ্চাৎদেশ দেখায়। সব জায়গায় লোহার আগুনে ছ্যাঁকা দেওয়ার বীভৎস চিহ্ন। কষ্ট পাওয়া চোখে ওগুলো দেখে ওরহান। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'আবার পালিয়েছ যে তাহলে?'

একটু সময় নিয়ে জবাব দেয় সে, 'প্রথমবার পালানোটা ছিল সত্যিকারের। মনিবের দেওয়া শাস্তি পেয়ে শোধ হয়ে গেছে ওটা। তারপর ওদের সঙ্গে চুক্তি হয় আমার। দাসত্বের মূল্য শ্রম দিয়ে শোধ করে দিলে ওরা মুক্তি দেবে আমাকে। জীবন হাতে রেখে শ্রম দিয়েছি শুধু মুক্তির আশায়। অথচ আমার ঐ মনিব এই দস্যুদলের কাছে দ্বিতীয়বার বিক্রি করে দেয় আমাকে।'

ওকে জেরা করা অব্যাহত রাখে ওরহান। জিজ্ঞেস করে, 'আহত হওয়ার ভান করে যে প্রতারণা করলে? ওরা তো কিনে নিয়েছে তোমাকে।'

হেসে বলে সে, 'প্রতারণা করিনি। সামান্য অভিনয় করেছি। জীবনের জন্য এটুকু না করলে হয়তো জীবন থেকে মুক্তিই পেতাম না কোনোদিন।'

কিছুটা নমনীয় হয়ে বলে ওরহান, 'যুক্তি দাঁড় করাচ্ছ এখন তোমার অন্যায়ের বিপক্ষে।'

মাথা দুলিয়ে বলে সে, 'হয়তো। তবে কোনো না কোনোভাবে অভিনয় না করে এমন কে আছে এ জগতে?'

ওর এ যুক্তিটা শাঁসালো মনে হয় ওরহানের কাছে। মরুদিগন্তে চোখ মেলে বলে সে, 'ভাবার বিষয় বটে।'

এবার সে কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করে, 'দক্ষিণে চলে যাওয়ার জন্য একটা সুযোগ খুঁজছিলাম। ভালোভাবেই জানতাম যে ওখানেও কঠিন শ্রম বিক্রি করে জীবনযাপন করতে হবে। তবে একটু ভিন্নতা ছিল ওটায়। ওখানে অন্যের দাস নয়, নিজের।'

ওকে থামিয়ে দেয় ওরহান। বলে, 'পৃথিবীতে সবাই দাস। হয় অন্যের, নয় নিজের!'

'না হয় প্রভুর।' উপরের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলে সে।

মেনে নেয় না এটা ওরহান। সে বলে, 'না। প্রভুর কোনো দাস নেই। দাসের প্রয়োজন হয় না প্রভুর। কোনো প্রয়োজনই নেই তাঁর। দাস লাগবে কেন?'

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সে, 'তাহলে ওরা যে বলে আমি প্রভুর দাস?'

জোর দিয়ে বলে ওরহান, 'ওটা সত্যি না। নিজেদের লোভের দাস ওরা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সে। এক মুঠো বালু হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নেমে যেতে দেয় ওগুলো। মরুভূমিতে বাতাসের কোনো প্রবাহই নেই এখন। বালুগুলো সব ঝরে যাওয়ার পর হাত ঝেড়ে বলে সে 'তোমাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে বলে ওরহান, 'এই মুহূর্তে।'

ওর দিকে তাকিয়ে বলে সে, 'হয়তো পরেও লাগবে।'

অকারণ এসব বাক্য বিনিময় ভালো লাগছে না ওরহানের। বলে, 'থাক ওসব।'

একটু ভেবে জিজ্ঞেস করে সে, 'একটা প্রস্তাব রাখব তোমার কাছে?'

ওর দিকে তাকায় ওরহান। মুখ দেখে কিছু অনুমান করতে পারে না সে। বলে, 'বলো।'

কথাগুলো গুছিয়ে নেয়ার জন্য একটু থামে সে। তারপর বলে, 'বন্ধু হিসেবে একজন দাস নেওয়া কঠিন। একজন স্বাধীন দাস হিসেবে নেবে আমাকে? দাম দিতে হবে না। কিছুদিন তোমার সঙ্গে থাকার অনুমতি দিলেই হবে। নিরাপদ একটা জায়গা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব আমি।'

এটা চায় না ওরহান। একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে পথে নেমেছে সে। কোনো ঝামেলায় জড়ানোর সামান্যতম ইচ্ছেও ওর নেই। সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে সে। বলে, 'না। প্রয়োজন থেকে দাস কেনে মানুষ। আমার তা নেই। আগেও একবার বলেছি ওটা। তাছাড়া তোমাকে সঙ্গে নিলে বন্ধু হিসেবেই নিতাম। দাস নয়। সবকিছু ছেড়ে এসেছি আমি একা থাকার জন্য। যা হোক, তোমার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ তোমাকে।'

ওরহানকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে না সে। বলে, 'ঠিক আছে। তুমি না চাইলে আমিও চাই না। চলে যাব এখুনি। তবে ঐ একাকিত্বের মর্ম বোঝার জন্য হলেও মনে হয় একজন বন্ধুর প্রয়োজন রয়েছে তোমার।'

ওর দিকে তাকিয়ে বলে ওরহান, 'হুঁ। শিক্ষিত মানুষের মতো কথা বলছ মনে হয়! ভালো কোনো মনিবের সঙ্গে ছিলে নিশ্চয়?'

মাথার কোঁকরানো চুলে হাত বুলিয়ে বলে সে, 'ভালো কিনা জানি না। তবে শিক্ষিত। পারিবারিক একটা পাঠাগার ছিল ওদের। বইপত্র গোছগাছ করে রাখতাম আমি ওখানে। মনিব আমাকে অক্ষরজ্ঞান দিয়েছিল যেন ওর প্রয়োজনীয় বইগুলো তাক থেকে খুঁজে দিতে পারি। তারপর বই পড়া শুরু করি ধীরে ধীরে। ঘুমানোর আগে কিছু কিছু পড়তাম প্রতিদিন। ঐ মনিব বেঁচে থাকলে হয়তো দ্বিতীয়বার বিক্রি করে দিত না আমাকে।'

কিছুটা নমনীয় হয় ওরহান। বলে, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি। তোমার কাহিনি না হয় পরে শুনব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হাসে সে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'ভাবার সময় আছে কী তোমার বা আমার?'

'একটু তো ভাবতে হবে নিশ্চয়। হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত না।' বলে ওর সঙ্গী উটটার দিকে তাকায় ওরহান। যেন ওর পরামর্শ চাইছে সে। দিগন্তে শূন্য দৃষ্টি মেলে আপন মনে জাবর কেটে চলেছে সে। কোনো কিছুতেই কোনো পরোয়া নেই ওর। তাই অনেকটা নির্বিকারভাবে বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে। একদিনের চুক্তি। ইচ্ছে হলে প্রতিদিন ওটা বাড়ানো যেতে পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় সে ওটা। বলে, 'ঠিক আছে। আমার দিক থেকেও তাই। যেদিন চলে যেতে চাইব সেদিনই চুক্তি মেনে নিতে হবে তোমাকে।'

'বলেছি ওটা।' সম্মতি জানায় ওরহান।

মাথার উপর দু'হাত তোলে ওরা। পরস্পরের করতলে আঘাত করে। তারপর কোলাকুলি করে। কেঁদে ফেলে লোকটা।

চোখ মুছে বলে, 'এই প্রথম একজন স্বাধীন মানুষ কোলাকুলি করেছে আমার সঙ্গে!'

ওরহান জিজ্ঞেস করে, 'কী নাম তোমার?'

আকর্ণ হেসে ওর ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো বের করে বলে, 'নাজার।'

ওরহান জিজ্ঞেস করে, 'নাজার?'

সে বলে, ‘হ্যাঁ, ওরা নাজ নামে ডাকে।’

মনে মনে ভাবে ওরহান। দাসদের নাম যত সংক্ষিপ্ত করা যায় ততই যেন সুবিধে ঐ মনিবদের! ওদিকে আর না এগিয়ে সে বলে, ‘আমার নাম ওরহান।’ একটু থেমে পুরো নামটাই বলে সে, ‘ওরহান সালেম। বাবা-মা ওরান নামে ডাকত আমাকে।’

মনে মনে হাসে ওরহান। আহা, শৈশব!

চুপচাপ বসে থাকে ওরা কিছুক্ষণ। উঠে দাঁড়িয়েছে উটটা। সতর্ক হয়ে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় দু’জনে। বিপদের কোনো দিকনিশানা নেই এই মরুদরিয়ায়। সংজ্ঞাও নেই। যেকোনো মুহূর্তে যা খুশি ঘটে যেতে পারে এখানে। ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে অতি তুচ্ছ কোনোকিছুও। এমনকি প্রাণহীন এই বালুকণাগুলোও। আপাতত কোনো বিপদ নেই বুঝতে পেরে আবার কথা বলা শুরু করে নাজার, ‘দূর থেকে একটা মাত্র উট দেখে ওরা ভেবেছিল তুমি কোনো দলছুট বেদুইন। অথবা পলাতক দাস।’

ওর কথায় সায় দেয় ওরহান। বলে, ‘এই নিষ্ফলা মরুভূমিতে বিনামূল্যে একটা উট আর দাসের লোভ সামলানো তো সত্যি কঠিন।’

‘সবার জন্যই এটা সত্য।’ বলে নাজার।

ঠোঁট চেপে বলে ওরহান, ‘হয়তো।’

নীরবতা নেমে আসে আবার। দু’জনেই ক্লান্ত ওরা। মৃত প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে বলে নাজার, ‘আমার ক্ষুধা পেয়েছে ওরহান। এক টুকরো মাংস নিতে পারি ওখান থেকে?’

মাথা হেলিয়ে সম্মতি দেয় সে। বলে, ‘পুরোটাই নিতে পার। মাংস খাই না অনেকদিন। ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর মনেও নেই ওটার স্বাদ।’

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করে নাজার, ‘কিছুক্ষণের জন্য ছুরিটা ধার দেবে তোমার?’

সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয় ওটা ওরহান, ‘নাও।’

যত্ন করে দুম্বার চামড়া ছাড়িয়ে নেয় নাজার। রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করার জন্য গুটিয়ে রাখে ওটা। রানের বড় এক টুকরো মাংস কেটে নিয়ে বাকি সবটুকু বালু দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে রাখে। জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বলে, ‘চল সরে পড়ি এখান থেকে। মানুষগুলো ভালো না ঐ দলের। ওদের উদ্দেশ্যটা তো বলেছি তোমাকে। হঠাৎ করে তোমার ঐ মারমূর্তি দেখে ভেবেছে যে ভয়ানক কোনো এক দলের সর্দার তুমি। কোনো কারণে হয়তো সামনে এগিয়ে এসেছ আর পিছনে রয়ে

গেছে তোমার দল। যে বিদঘুটে স্বরে উ-লা লা-লা ধ্বনি করেছিলে তাতে ওরা ভেবেছিল যে তোমার দলে পাঠানো কোনো সঙ্কেত ওটা! ভুল যদি আবার ভেঙ্গে যায় ওদের তাহলে বেরিয়ে পরবে তোমার খোঁজে।'

এক মুঠো বালু হাতে তুলে নেয় ওরহান। বালুঘড়ির মতো মুঠোর ফাঁক গলিয়ে ধীরে ধীরে নেমে যেতে দেয় ওগুলো। তারপর বলে, 'ওটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই নাজার। ওরা আর ফিরে আসবে না।'

সংশয় কাটে না ওর। জিজ্ঞেস করে, 'এত নিশ্চিত হলে কী করে?'

তখনো ওরহান তাকিয়ে রয়েছে মুঠোর ফাঁক দিয়ে নেমে আসা বালুকণার ক্ষীণ ধারাটির দিকে। ওরহানকে আস্বস্ত করতে বলে সে, 'কোনো কিছুরই নিশ্চয়তা নেই রে ভাই। কেন ভেবে মরো?'

বুঝতে চায় না নাজার। জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে কী হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব?'

ওরহানের মুঠোর বালুগুলো সব আবার মরুবালুর সঙ্গে মিশে গেছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'না। হাল ধরে বসে থাকবে নাজার। জীবন যেদিকে নিয়ে যায় তোমাকে যাবে সেদিকে। ধর, গতকাল কী ভেবেছিলে তুমি যে এখানে আমার সঙ্গে কাটাবে আজ? একটু আগেও ছিলে তুমি একজন দাস। এখন হয়তো স্বাধীন।' একটু থামে সে। তাকায় নাজারের মুখের দিকে। তারপর বলে, 'সুনসান এই মরুভূমিতে ঝড়ের মতো ঐ দলটা হঠাৎ এসে দাঁড়াবে আমার সামনে আর ওভাবে ওদের মুখোমুখি হব আমি তা এক মুহূর্ত আগেও কল্পনায় ছিল না আমার। সব কিছুই তো ঘটে গেছে। বল তো কীভাবে?'

'প্রভুর ইচ্ছা।' জবাব দেয় নাজার।

মেনে নেয় না এটা ওরহান। বলে, 'না। খামোকাই সবকিছুতে প্রভুকে টেনে এন না। এসব ঘটে জগতের নিয়মে। বা অনিয়মে।'

হেসে বলে নাজার, 'এখন ক্ষুধা পেয়েছে আমার। জানি না জগতের নিয়মে। না অনিয়মে।'

ওরহানও যোগ দেয় ওর নীরব হাসিতে। বলে, 'আগেও বলেছ ওটা। তোমাকে দেওয়ার মতো কোনো খাবার আমার কাছে থাকলে নিশ্চয় দিতাম।'

'আমি অবশ্য চাইনি। পরামর্শ চাইছি তোমার। কীভাবে কিছু খাবার সংগ্রহ করা যায়। কী খেয়ে থাক তুমি। মানে কীভাবে জীবন ধারণ করো।'

হো হো করে হেসে ওঠে ওরহান। বলে, 'হাসালে নাজার। আমি জীবনধারণ করি না জীবন আমাকে ধারণ করে আছে তাই তো ভেবে পাই না।'

নাজার বলে, 'ধর, দুটোই সত্য।'

দিগন্তের দিকে খুব সজাগভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ওরহান। তারপর বলে, 'কি খাবে তুমি তা ভেবে দেখিনি নাজার। কোনো এক সময় মনে হতো খাওয়ার জন্যই এ জীবন এত প্রিয় ও মধুময়। এখন না খেয়ে থাকার চেষ্টা করি। একটা রুটির চার ভাগের এক ভাগ আর একটা খেজুর খেয়ে দিব্যি একটা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। তৃষ্ণার প্রয়োজন মেটায় দু'ঢোক মাত্র পানি। অযথা শরীরের শক্তি ক্ষয় করি না কখনো। এমনকি জোরে হাঁটিও না। লক্ষ রাখি যেন শরীরের ঘাম বেরিয়ে না যায়।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে নাজার। হাসি থামলে বলে সে, 'এই তাহলে তোমার সাধনা!'

নির্বিকারভাবে বলে ওরহান, 'না। এটা শরীরের। মনের সাধনা ভিন্ন। ভারতবর্ষের ঋষিদের কাছ থেকে শিখেছি। মনকে শূন্য করে ফেলা। একমাত্র শূন্য মনেই পেতে পার তুমি নিজেকে। অথবা যদি ঈশ্বর বা পরমাত্মায় বিশ্বাসী হও, তাহলে ওটা।'

'পেয়েছ কখনো?' জিজ্ঞেস করে নাজার।

মাথা দোলায় ওরহান। বলে, 'না। সাধনা করছি।'

বিষয়টা আকর্ষণ করে নাজারকে। প্রথম মনিবের কাছে থেকে অনেক পড়াশোনা করেছে সে। ওদের লাইব্রেরিতে একটা উপনিষদও ছিল। ভারতবর্ষের ওরা ওটাকে পঞ্চম বেদ বা বেদের সারাংশ বলে থাকে। দার্শনিক প্রজ্ঞাবান ঐ গ্রন্থটা ওকে অনেক সদর্থক ভাবনার খোরাক যুগিয়েছে। ওরহানকে জিজ্ঞেস করে সে, 'আসলেই কী তোমার চিত্ত শুন্য করতে চাও তুমি না ঐ চিত্তকে পূর্ণ করার একাগ্র বাসনা লালন করে চলেছ তোমার মনের গোপন গভীরে?'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ওরহান, 'প্রশ্নই বটে এটা একটা।'

আবার জিজ্ঞেস করে নাজার, 'কী পেয়েছ তোমার ঐ তথাকথিত নির্মোহ সাধনা থেকে?'

হাসে ওরহান। হাত উল্টে বলে, 'কিছুই না। এটাই আমার সাধনা। কোনো কিছু পাওয়ার আশা না করা। ভেবে দেখো, তোমার দলের মানুষগুলো দৌড়ে এসেছিল এখানে কিছু পাওয়ার আশায়। অথচ ফিরে গেছে ওরা খালি হাতে।'

হেসে বলে নাজার, ‘তুমি হয়তো পেয়েছ কিছু।’

মেনে নেয় না ওটা ওরহান। বলে, ‘আমি মনে করি না।’

নাজার জিজ্ঞেস করে, ‘কারও বন্ধুত্ব?’

সরাসরি জবাব দেয় সে, ‘না।’

অবাক হয় নাজার। আবার জিজ্ঞেস করে, ‘না?’

দৃঢ়ভাবে আবারও ওরহান বলে, ‘না। ’

একটু খটকায় পড়ে নাজার। অনেকটা নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করে সে, ‘জীবনে যদি আশাই না থাকে তবে জীবন কোথায়?’

ওটার ব্যাখ্যা করে ওরহান। বলে, ‘ওটার সন্ধানেই তো বেরিয়েছি নাজার। সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে, আমি ঘুমাই, ঘুম থেকে আবার জেগে উঠি, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে ডুবে থাকি। প্রকৃতির নিয়মে চলছে সব। এসবের ভেতর আমার, একান্তই আমার জীবনটা কোথায়?’

চুপ করে থাকে নাজার। উষ্ণ বালু দিয়ে ওর পা দুটো ঢেকে দেয় নাজার যেন একটা গাছের চারা রোপণ করছে সে। কিছু একটা বলার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নেয়। তারপর হাত দুটো শব্দ করে ঝাড়ে। ওরহানের দিকে তাকিয়ে বলে, ‘যা সাধনা করে পেতে চাও তুমি, ওরহান, তা কী করে এমনিতেই রয়েছে আমার বল তো? সবসময়ই শূন্য আমার মন। অনেক চেষ্টা করেও কিছু ভাবতে পারি না। ভাবনার যেন কিছু নেইই আমার। সাধনা করে না খেয়ে বা কম খেয়ে বাঁচার চেষ্টা করছো তুমি। আর ওটা আমার জন্মগত, সহজাত। কোনো কারণে মনিব অসন্তুষ্ট হলে রশি দিয়ে বেঁধে রাখত আমাকে। দিনের পর দিন না খাইয়ে রাখত। এক ফোঁটা পানি স্পর্শ করতে দিত না। প্রথমবার পালিয়ে যাওয়ার পর ধরে এনে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল তিন দিন তিন রাত। মার খেয়ে ঠোঁটে জমাট বাঁধা নিজের রক্ত খেয়েছি চেটে চেটে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের জিভ চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাওয়ার দশা হয়েছে। হাতের চেটোয় ধরে নিজের প্রস্রাব পান করেছি। বিশ্বাস করেছ?’

ওরহান বলে, ‘করেছি।’

আবার বলে নাজার, ‘যদি বল তিন দিন না খেয়ে থাকতে, কোনো সমস্যা নেই আমার, পারব।’ বালুর ভেতর থেকে ওর পা দুটো টেনে বের করে। তারপর জিজ্ঞেস করে, ‘কিন্তু খাবার থাকতে তা করব কেন? আগুন জ্বালানোর কিছু আছে তোমার সঙ্গে? কোথাও বসে মাংসটা ঝলসে নেব তাহলে।’

মাথা দোলায় ওরহান। বলে, ‘আছে।’

উঠে দাঁড়ায় নাজার। বলে, ‘চল কিছুটা দক্ষিণে যাই। পশ্চিম সাগরে যাবে ওরা। ওদের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব তৈরি করে নেওয়া ভালো।’

হাঁটতে থাকে ওরা। ক্লান্তি নেই কারো। কঠিন শ্রম দেওয়া একজনের চেষ্টার্জিত। অন্যজনের জন্মগত অভিজ্ঞতা। যে মৌনতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল ওরহান তা নাজারের সান্নিধ্যে এসে ভেঙে পড়ে। ভালো একজন শ্রোতা পেয়ে নিজেকে মেলে দিয়েছে সে। বিনিময়ে জানতে পেরেছে অনেককিছু। দীর্ঘদিন শুধু নিজেকেই প্রশ্ন করেছে সে এবং জবাব খুঁজেছে। ধ্যানস্ত হয়ে যা সে পেয়েছে তা কোনো কিছু না ভেবেই বলে দেয় নাজার। মামুলি এক দাস মনে হয় না ওকে। ও শিখেছে জীবন থেকে। জীবনই শেখায়। শেখার কিছু নেই এই মরুভূমিতে। এখানে জীবন নেই। কিছুদিন ওর সঙ্গে কাটাতে মনস্থির করে ওরহান।

ধীরে ধীরে রাত নামে মরুভূমিতে। মরুঝোপ থেকে কিছু শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে নাজার। তাঁবু টানিয়ে ভেতরে ঢোকে দু’জনে। আগুন জ্বালিয়ে মাংসটা ঝলসে নেয় নাজার। ওরহানকেও খেতে বলে সে। মৌনতা ভেঙেছে ওরহান। একাকিত্ব ছেড়েছে। কিন্তু এটা না। কালই হয়তো চলে যাবে নাজার। কিন্তু ভোগলিপ্সাটা সঙ্গে নিয়ে যাবে না। অনেক কষ্টে এটা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে সে। একাই খাওয়া শুরু করে নাজার। ওরহান খেল কি খেল না তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই ওর। স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে সে পুরাপুরি। শরীরটাকে দাস বানিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল ওর মনিব। ওর ইচ্ছাকে নয়। অনুভূতিকে নয়। কোনো কিছুতেই পরোয়া নেই এখন ওর। সরাসরি বলে যে ওর কোনো দায় নেই। নিজে নিজেই সে শিখে। জীবন থেকে, প্রকৃতি থেকে। জন্মের পর যেমন একটা শিশু জেনে যায় কোথায় তার খাবারের উৎস, কীভাবে উঠে দাঁড়াতে হয়, হাঁটতে হয়, দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়, সেভাবে সবকিছু এসে যায় ওর সামনে, স্বাভাবিক নিয়মে। ভাবতেও পারে না সে যে এটার জন্য সাধনা করতে হবে। কি আছে শুধু হেঁটে যাওয়ার মধ্যে! ওরহানও বোঝাতে পারে না যে কেন হেঁটে চলেছে সে। ওর বরাদ্দ এক টুকরো রুটি, একটা খেজুর ও এক ঢোক পানি খেয়ে শুয়ে পড়ে আগামী দিনে আবার হাঁটার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য!

পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণে এগিয়ে যায় ওরা। পরিবার-পরিজন ছেড়ে আসার সময় ওরহানের পিতা উপদেশ দিয়েছিল ওকে অন্তত একটা বোবা প্রাণী হলেও সঙ্গে রাখার জন্য। পালন করছে ওটা সে সঙ্গী হিসেবে এই উটটাকে সাথে রেখে। গত ক’টা দিন

নাজারের সঙ্গে কথা বলে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে কিছুটা আবার। ওর অনুপস্থিতিতে উটটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় সে। জিজ্ঞেস করে ওকে, 'কেমন আছিস রে?'

দাঁত বের করে জাবর কাটে প্রাণীটা। ওটাই হয়তো ওর হাসি!

ক্রমাগত তিন দিন উষর মরু পেরিয়ে ছোট্ট একটা লোকালয়ের কাছে এসে পড়ে ওরা। কিছু সময়ের জন্য ওখানে যেতে চায় নাজার। চামড়াটা সঙ্গে নেয়। যত্ন করে শুকিয়ে বেশ ভালো একটা পণ্যে পরিণত করেছে ওটাকে। আর ক'দিনের খাবার কিনে আনার জন্য সামান্য অর্থ ও জলের একটা মশক দেয় ওকে ওরহান। লোকালয় থেকে দু'চারদিনের চেয়ে বেশি দূরত্বে সাধারণত যায় না সে। নির্মম এই মরুতে উদ্‌ভ্রান্ত পথচলায় প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে হয় ঘন ঘন।

সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসে নাজার। নেকাব ঢাকা অতি সুন্দরী এক নারী সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে! গত ক'দিনের বন্ধুত্বের বাঁধনে এতটা বাঁধা পড়েছে ওর সঙ্গে ওরহান যে কি বলবে ভেবে পায় না। মনে মনে ক্রোধ জমে ওঠে ওর ভেতর। নাজার বুদ্ধিমান। বুঝতে পারে বন্ধুর মনোভাব। বলে, 'চামড়াটা বিক্রি করে ভালো দাম পেয়েছি ওরহান। খাদ্য ছাড়া আরও একটা ক্ষুধা আছে আমার। তিন রাতের জন্য কিনেছি ওকে। যদি কিছু মনে না কর এবং অসম্ভব না হয় শুধু আজ রাতের জন্য তাঁবুটা ধার দিতে পার। কালই চলে যাব আমরা।'

চুপ করে থাকে ওরহান। চোখের ইশারায় সম্মতি জানায় সে। খুশি হয় নাজার। লেগে যায় রাতের আয়োজনে। উটের শরীর ঘেসে আপাদমস্তক কাপড় মুড়িয়ে শুয়ে থাকে ওরহান। শেষ রাতে ঠান্ডায় জমে যাওয়ার আগেই ওকে তুলে তাঁবুর ভেতর নিয়ে আসে নাজার। বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত সে। বলে, 'বিদায় জানাও বন্ধু। হয়তো আর কখনো দেখা হবে না এ জীবনে।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে ওরহান, 'জীবন একটাই। এ জীবনে না হলে আর হবে না কখনো।'

ক্ষণিকের নীরবতা নেমে আসে ওদের ভেতর। দিগন্তের দিকে চোখ মেলে বলে নাজার, 'হয়তো তুমিই ঠিক। কে জানে?'

ওরহান কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে না। নাজার আবার বলে, 'তুমি চাইলে দু'দিনের জন্য রেখে যেতে পারি ওকে। ওর সঙ্গেও হয়তো আর দেখা হবে না কখনো।'

প্রত্যাখ্যান করে সে ওটা। বলে, 'না। ওটার প্রয়োজন নেই আমার, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তাঁবুর দিকে তাকিয়ে বলে নাজার, 'হয়তো নেই। পুরাপুরি তৃপ্ত তুমি। কিন্তু শেখার মতো অনেক কিছু ওর কাছেও থাকতে পারে। খুব ভালোভাবেই জানি যে বিন্দুমাত্র কিছুও তোমাকে শেখাতে পারিনি আমি। অথচ বলেছ যে অনেক কিছু শিখেছ। ওকেও একটু দেখ না কেন? আশা করি কোনো ক্ষতি হবে না ওর দিক থেকে।'

তাঁবুর এক কোনায় অনেকটা সহজভাবে জবুথবু হয়ে বসে আছে মেয়েটা। শরীরে ক্লান্তি। অথচ আশ্চর্য মধুর ভঙ্গি! মুহূর্তের জন্য ওর চোখে চোখ যায় ওরহানের। দৃষ্টিতে ওর কামদেবের বর দেয়া কোমল শর। এমন কোনো বর্ম নেই পুরুষের যা দিয়ে তীব্র ঐ বাণ প্রতিহত করে। চুপ করে থাকে নাজার। উঠে দাঁড়ায় ওরহান। গোপন জায়গা থেকে একটা মোহর বের করে ওর হাতে দেয় সে। চমকে ওঠে নাজার। বলে, 'কী করছ ওরহান! গোটা একটা জীবন চলে যাবে আমার এ দিয়ে। না না, রাখ এটা তোমার কাছে। প্রয়োজনে আসবে একদিন।'

ফিরিয়ে নিতে চায় না সে ওটা। বলে, 'কোনো দিনও না। বাবা দিয়েছিল বলে সঙ্গে রেখেছি। ওটা নিয়ে যাও। তোমার কাজে লাগবে।'

মুদ্রাটিসহ ওর হাত ওহানের দিকে বাড়িয়ে দেয় সে। অনেকটা মিনতি করে বলে, 'তারপরও এটা নিতে চাই না আমি, ওরহান। এক দাসের জীবন আমার। অনোপার্জিত কোনো কিছু কেন সইবে আমাকে, বলো?'

ওর বাড়ানো হাত করতলে চেপে ধরে ওরহান। বলে, 'বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে বলছি নাজার। গ্রহণ কর এটা। এমনি এমনি খরচ করে ফেল না। সম্ভব হলে এটা ভাঙ্গিয়ে একটা ব্যবসা শুরু করো। শুরু করো একটা স্বাধীন জীবন।'

বন্ধুত্বের দিব্যি দেওয়ায় মেনে নেয় ওটা নাজার। বলে, 'চিরদিন মনে থাকবে তোমাকে, বন্ধু। যাবার সময় আরেকটা প্রশ্ন করি। উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। নিজেকেই শুধিও। জনমানবহীন কোনো মরু পাড়ি দিচ্ছ তুমি, না মানুষ, গাছপালা ও অন্যান্য প্রাণীতে গিজগিজে পৃথিবী?'

ওর কাঁধে হাত রাখে ওরহান। দীর্ঘ আলিঙ্গন করে ওরা। তারপর ধীরে ধীরে সে মিলিয়ে যায় নির্মম মরুর ঐ ধূসর দিগন্তে। তাঁবুতে ঢুকে দেখে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর চোখেও ঘুম। একটু পরে সেও ঢলে পড়ে গভীর ঘুমের জগতে। মরুর আকাশে প্রখর সূর্য ওঠার পর ঘুম ভাঙে ওর। তাঁবুর এক কোণে একেবারে পরিপাটি হয়ে বসে আছে মেয়েটা। মনেই হয় না যে সে রাতের অতিথি! ধীরে ধীরে ভাব জমিয়ে নেয় সে ওর সঙ্গে। আজ আর হাঁটা হবে না। সুন্দরী নারী কখনোই নিরাপদ

না এই মরুপথে। কিছুটা খাদের ভেতর থাকায় দূর থেকে চোখে পড়ে না এ জায়গাটা। নাজারের চলে যাওয়া পথের চিহ্নও মুছে গেছে মরুর এলোমেলো বাতাসে। মেয়েটার জীবনের গল্প শুনে সারাদিন কাটিয়ে দেয় ওরহান। সত্যি না মিথ্যে, সেই জানে। নতুন কিছু নয় ওটা। দারিদ্র্য ও পরিবারের উপেক্ষা ওকে ঠেলে দিয়েছে এ পথে। পরিশীলিত জীবনযাপনের সুযোগ নেই উদরনর্তকিদের। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের সঙ্গে রাত কাটাতে হয়। কোনো দুঃখবোধ নেই ওর। এভাবেই মেনে নিয়েছে জীবনটাকে। ওর নাম খৈফা। কোমরের অনেক নিচে বাঁধা ঘাগড়া দুলিয়ে বিভিন্ন নাচের মুদ্রা দেখায়। পেটের কম্পন দেখায়। উদরনৃত্য, শরাব, শিশা, এসব নতুন কিছু নয় ওরহানের কাছে। অতীত দিনের হালকা স্মৃতি। এখন কিছুটা রহস্যময়!

রাত ঘনিয়ে এলে ওকে আকুল করে তোলে খৈফা। নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় না ওরহান। ভেঙে পড়ে ওর সংযমের বাঁধ। ষোলকলার অতিরিক্ত আরো দুটো কলাও শিখিয়ে ছাড়ে ওকে। পরের দিন ও রাত কাটে ওদের তাঁবুর ভেতরই। অবশেষে নিজেকে ফিরে পায় ওরহান। ঘুম থেকে উঠেই প্রস্তুত হতে বলে ওকে। সত্যিই অনেক কিছু শিখিয়েছে ওকে এ মেয়েটা। মনে মনে নাজারকেও ধন্যবাদ জানায় এজন্য।

রুক্ষ ও অকরুণ মরুপথের তপ্ত বালুর উপর দিয়ে দিনের পর দিন হেঁটে এসেছে সে। কিন্তু এক উদরনর্তকির কোমল শরীর এমন কঠিন পথে অভ্যস্ত নয়। উটের পিঠে চড়িয়ে দেয় ওকে। এই প্রথম একজন সওয়ারি পেয়েছে উটটা। কিন্তু মরুপথে এভাবে চলা সত্যিই বিপজ্জনক। ভালোয় ভালোয় যাহোক, লোকালয়ের কাছে ফিরে আসে ওরা। আরেকটা মোহর বের করে দেয় ওকে। কেঁদে আকুল হয় মেয়েটা। লুটিয়ে পড়ে ওর পায়ের উপর। বুকে তুলে কিছুক্ষণের জন্য আলিঙ্গনে বেঁধে রাখে ওকে ওরহান। বিদায় চুমো দেয়। ছেড়ে দিয়ে বলে, 'পুরুষের পায়ে পড়ার জন্য নারী নয়। নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ। সঙ্গিনীর প্রয়োজন হলে হয়তো তোমাকেই চাইতাম। তুমি খুব ভালো, খৈফা। সম্ভব হলে নাজারকে খুঁজে নিও। সেও হয়তো ভালো মানুষ। সামান্য এ অর্থটুকু দিয়ে ওর ব্যবসার অংশীদার হতে পার তুমি। আশা করি তোমাকে সুখী করবে সে। ভালো থেকো। শুভ কামনা করি তোমার।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সে আবার শুরু করে ওর নিয়তি নির্ধারিত ঐ নির্মম পথচলা। বিচ্ছিন্ন এক উদ্যানের মতো গত পাঁচটা দিন ঊষর মরভূমি থেকে জেগে উঠে আবার মিলিয়ে গেছে কোনো এক অজানা রহস্যলোকে। আশ্চর্য একটা পরিবর্তন অবশ্য এসেছে ওরহানের ভেতর। ক্রমাগত হেঁটে আগের দিনগুলোয় সাধনা করেছে সে চিত্ত শূন্য হওয়ার। এখন ডুবে থাকে ভাবনার ভেতর। ভাবতে ভালো লাগে এখন ওর। হাঁটে আর ভাবে!

এই পথচলা যেন শেষ হয় না আর। ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসে ওরহানের। এখন আর মনে করতে পারে না কবে ও কখন থেকে হাঁটছে সে। দিন, তারিখ, মাস, চাঁদের পরিবর্তন, ঋতুবদল, সব যেন গুলিয়ে যেতে থাকে। বার্ধক্য মনে হয় এগিয়ে আসছে খুব দ্রুত।

মনে পড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় ওর মা বলেছিল, 'যদি কখনো এই নির্মম মরু পেরিয়ে যেতে পারিস, আর নিঃসঙ্গ ও সবুজ কোনো গাছের দেখা পাস, তাহলে থেমে যাবি।' পুবের কোনো দেশ থেকে ছিনিয়ে আনা ওর মায়ের ব্যতিক্রমধর্মী চোখ দুটো খুব মনে পড়ে এখন। পিঙ্গলবর্ণ ঐ চোখে ছিল ওর জন্মভূমির ছায়া। হয়তো ওটাই এখন খুঁজে চলেছে ওরহান। সারা জীবন ধরে খুঁজে বেরাবে ওটা। মাকে কখনো স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি ওর বাবা। যুদ্ধে পাওয়া মেয়েদের নিয়ে যা করে এসেছে ওর গোত্রের মানুষগুলো। কিন্তু ওরহানকে দিয়েছিল পুত্রের স্বীকৃতি।

মরুচারী মানুষেরা হয়তো বোঝে না যে শান্ত ও শীতল, সবুজ ও কোমল কোনো দেশের মানুষেরা কেমন করে জীবনযাপন করে। পুব দেশের এক ঋষির সঙ্গে একদিন আচানক দেখা হয়েছিল ওরহানের। অনেক কিছুই বলেছিল ওকে ঐ ঋষি। ওসবের একটা টুকরো বিদ্যুৎ বেগে ঢুকে পড়েছিল ওর অন্তর্জগতের ভেতর। 'জীবন নিয়ে কোনো ভাবনা যদি তোমার নাই থাকে তবে তুমি জানই না যে একটা জীবনযাপন করে চলেছ তুমি। জীবনের রং সবুজ। আর মৃত্যু বর্ণহীন। মরুময় ধূসর।' মনে আছে ওর মা ঐ ঋষিকে নিষেধ করেছিল এসব কথা ওকে বলতে। কিন্তু যা শোনার তা শুনে নিয়েছিল সে। এরপর জগৎ-সংসার ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে ঐ জীবন অথবা মৃত্যুর অকারণ অন্বেষণে!

মরুপথে হাঁটতে হাঁটতে এখন ওর দু'চোখ খুঁজে বেড়ায় একটা দীঘল সবুজ গাছ! কোনো একদিনের শুরুতে প্রথম পা ফেলতে যেয়ে দেখে দূরে একটা গাছের নিশানা। যত এগিয়ে যায় সে ওদিকে, মরীচিকার মতো পিছিয়ে যায় ওটা। সারাদিনের ক্লান্তিকর হাঁটার পর অবশেষে আকাশছোঁয়া ঐ গাছটার নিচে এসে দাঁড়াতে পারে সে। ওখানে কাটিয়ে দেয় ঐ রাতটা। ভোরে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় এবার শেষ হয়েছে ওর এই অন্তহীন পথচলা। প্রথমে মুক্ত করে দেয় উটটাকে। দীর্ঘদিনের সঙ্গী হিসেবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সে। কিছুতেই তাড়াতে পারে না ওকে। একটু দূরে যেয়ে ফিরে আসে আবার। শেষপর্যন্ত দূরের একটা মরুঝোপের কাছে ছেড়ে আসে অবুঝ ঐ প্রাণীটাকে। ক্লান্তিকর এই হেঁটে চলা এবার শেষ করতে হবে ওকে। ছায়া দেওয়া সবুজ ঐ গাছের সন্ধান হয়তো পেয়ে গেছে সে। মনে হয় শেষ প্রান্তে পৌঁছে

গেছে এ জীবনের। অশেষ ক্লান্তি ও চূড়ান্ত অবসাদ ছেয়ে ফেলে ওর সবকিছু। নাজারের ঐ প্রশ্নটা উঁকি দেয় মনের গহীন কোনে। প্রায় সারা জীবন হেঁটে কি পেরিয়ে এসেছে সে? মনে মনে ভাবে, ঐ গাছটার চূড়ায় উঠে হয়তো কিছুটা হলেও দেখা যাবে। শুরু করে ঐ গাছ বেয়ে উপরে ওঠা। কিছুদূর ওঠার পর বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটু বসে শক্ত একটা ডাল দেখে। অবাক হয় সে চারদিকে তাকিয়ে। মরুভূমির কোনো চিহ্নও নেই। অসংখ্য গাছ ঘিরে রয়েছে ওটাকে! উপরে উঠতে থাকে আবার। যত উপরে ওঠে সে তত বেড়ে যায় গাছের সংখ্যা। দিনের শেষে ঐ গাছের চূড়ায় উঠে মনে হয় এখানেই বুঝি সবকিছুর শেষ এ জীবনের! তামাম শুদ। ঐ মুহূর্তে মিলিয়ে যাওয়া অসংখ্য জীবনের সঙ্গে হয়তো এখনই মিশে যাবে আরো একটা জীবন। হতে পারে ওটা ওর নিজেরই। অবসাদ ও ক্লান্তির এক ঘুম নেমে আসে ওর দু'চোখ জড়িয়ে। চোখ মেলে তবু দেখার চেষ্টা করে চারদিকের সবুজ অরণ্য। বিস্তীর্ণ ঐ সবুজের ভেতর নিজেকে এখন মনে হয় ছোট্ট একটা ঘাসপোকা। ধূসর কোনো মরুতে নয়, শুয়ে আছে সে এখন আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ দূর্বাঘাসের এক নিঃসীম নৈরাজ্যে। ওখানে শুয়ে সে উপভোগ করে অনিঃশেষ নীল আকাশের অপরূপ শীতল মাধুর্য। রুদ্র কোনো সূর্য জেগে নেই এখন ঐ আকাশে। কখনো মনে হয় ভেসে রয়েছে সে আকাশের কোনো এক খণ্ড মেঘের ভেতর। মাটি ও আকাশের দূরত্ব হারিয়ে যায় এক সময়। ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসে ওর শরীর। অস্তসূর্যের নিবিড় আলো মুহুর্মুহু বদলে দেয় মেঘেদের রঙ। অথবা মেঘেরাই বদলে নেয় নিজেদের রূপ। একটু পরে হয়তো পৃথিবীর এ অংশ থেকে নিভে যাবে আলো। আকাশে তখনো থেকে যাবে ঐ মেঘগুলো। অথচ থাকবে না কোনো রঙ ওখান

আবু জাহেলের প্রত্যাবর্তন

দিলু নাসের

২০০৩ সালের ডিসেম্বরে তুষারাবৃত এক বিকেলে হিথ্রো বিমানবন্দরে পা রেখেই আবু জাহেল কিছুটা স্বস্তিবোধ করেন। গত কয়েকটা দিন ভীষণ অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন তিনি। যদিও চারপাশে ছিল রাজকীয় পাহারা, দলীয় বাহিনীর কড়া বেষ্টনী তবুও শান্তি ছিল না মনে, সারাক্ষণ অচেনা একটা ভয় তাকে ঘিরে রেখেছে। বারবার মনে হতো এই বুঝি কেউ তাকে চিনে ফেলবে, আর চোখ মুখ বেঁধে ধরে নিয়ে যাবে। এই ভয়ের কারণেই গত তিন যুগ তিনি ভিন্ন দেশে ভিন্ন পরিবেশে নির্বাসিত ছিলেন। জীবনে কোনোদিন আপন মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারবেন তা চিন্তাই করতে পারেননি তিনি। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরাত তাঁর অপার কৃপায় কী না হতে পারে! যে দেশের অসংখ্য মানুষকে আবু জাহেল নিজ হাতে বধ করেছেন, ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন, শত শত আওরাতকে পাকিস্তানি প্রভুদের হাতে তুলে দিয়ে নিজের জোশও চরিতার্থ করেছেন সেই দেশে আবারও রাজকীয় খাতিরে কয়েকটা দিন অতি আরামে কাটিয়ে এলেন।

আহা বাংলা স্থান।

৭১ সালে যখন বাংলা প্রেমীদের কাছে পেয়ারা পাকিস্তানের পতন হলো তখন কয়েকটি মাস খুবই বেদনায় কেটেছে তার। জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃসময় ছিল তখন। মুক্তি নামের বিচ্ছুদের কাছে ধরা পড়েও আল্লাহর অশেষ কৃপায় বেঁচে গিয়ে রাতের অন্ধকারে অনেক কষ্টে দেশান্তরী হয়েছিলেন।

বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে শেষপর্যন্ত বৃটেনে স্থায়ী আবাস গড়েন তিনি। এখানেও কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি তাকে। বাংলা প্রিয় শয়তানরা এখনো তার পিছু লেগে আছে। এখানকার মিডিয়াগুলোতে মাঝে মধ্যে তার অতীত কর্মকাণ্ড নিয়ে ঘাটাঘাটি হয়। কিন্তু আবু জাহেল এসব পরোয়া করেন না। এখানে পুরানো স্টাইলে ধর্মকে পুঁজি করে নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত আছেনি তিনি। যারা তার বিরুদ্ধে কথা বলে

আবু জাহেলের ভাষায় এরা সব আল্লাহর নাফরমান। মুরদাত, মুশরিক। দেশেও তাদের আস্ফালন ছিল খুব, কিন্তু এখন কিছুটা টাইট হয়েছে আরো হবে ইনশাল্লাহ।

সুদীর্ঘ কাল পরে আবার পূর্ব পাকিস্তানে পা রেখে বড়ই শান্তি লেগেছে তার।

বিমান থেকে নেমেই মনে মনে উচ্চারণ করেছেন

'পাকসার জমিন সাদবাদ...'

একাত্তর সালে পাকিস্তানিদের সাথে থেকে এতো মানুষ খুন করে অস্ত্র গোলা বারুদ দিয়েও যা করা সম্ভব হয়নি তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়েছে এবার তার দল লেদা বিবির সাথে কোলাকুলি করে।

মাশাআল্লাহ, এরকম যদি আরও কিছু দিন লেদা বিবিকে বশ করা যায় তাহলে বাংলা প্রিয় দুষ্কৃতিকারী এসব খাড়াইয়া মুতরা গোষ্ঠীকে ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

লন্ডন থেকে দীর্ঘপথ বিমানযাত্রার পর যখন ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে ইমিগ্রেশন অতিক্রম করছিলেন তখনো ভয়ে তার হাত পা কাঁপছিল। ইমিগ্রেশন শেষ করে সামনে এগুতেই দেখলেন ভিআইপি লাউঞ্জে ফুলের তোড়া হাতে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন পেয়ারা দোস্ত অতীতের অনেক অপকর্মের সঙ্গে প্রিয় হাজামী আর জিহাদি। তাদের চোখেমুখে তৃপ্তির হাসি। জিহাদির ঘাড় আরো মোটা হয়েছে আর হাজামীর নূরানী সুরত আরও চকচকে। এই দুই হাবীবের সাথে বহুদিন পর দেখা, একাত্তরের গণ্ডোগোলের সময় এদের সঙ্গে মিলে কতোইনা ফুর্তি করেছেন তিনি। এই ভূমি ধ্বংস করার জন্য হাজামী আর জিহাদি এতো কিছু করেও আল্লাহর কী কেরেশমা তারা এখন এ দেশের জাঁদরেল মন্ত্রী। সুবহানাল্লাহ।

সেসময় নিজের কৃতকর্মের কথা ভাবলে আবু জাহেল এখনো শিহরিত হন।

পেয়ারা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখতে পশ্চিমা প্রভুদেরকে খুশি করতে কতো নিকৃষ্ট কাজই না করেছেন তিনি। মনে মনে ভাবেন এসব অপকর্মের জন্য মৃতুই অনিবার্য ছিল তার, কিন্তু আল্লা রাব্বুল আলামিন এখনও তাকে সহি সালামতে রেখেছেন।

গত কয়েক বছরে লন্ডনে ধর্মকে বিক্রি করে অনেক ধনসম্পদ উপার্জন করলেও মনে মনে ভাবেন দেশে থাকলে হয়তো এবার তিনিও মন্ত্রী হতেন। আহা– ক্ষমতার সাধই আলাদা।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভিআইভি লাউঞ্জে হাজামীর সাথে কোলাকুলি করতে গিয়ে তাঁর বুক যখন ধুর ধুর করে কাঁপছিল তখন পেয়ারা দোস্ত হাজামী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে–

এই মুল্লুক আভি আমাদের, ভয়ের কোনো কারণ নাই হাবীবি। হাম লোগ যাহা বলবো লেদা বিবি তাহা শুনিবে। ইহা আবি কয়ি দুশমন নেহী হে।

যারা আছে তাদের হাত পা বান্দা।

হাজামীর কথা শুনে আবু জাহেলে দিলে কিছুটা প্রশান্তি আসে। তবুও চোখ মেলে তাকাতে সাহস হয় না, মনে হয় এই বুঝি কেউ তাকে চিনে ফেলবে, এই বুঝি কেউ এসে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভিআইপি লাউঞ্জ থেকে বের হতেই আরও কয়েকজন তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে মোবারকবাদ জানায়।

বহুদিন পর পাঠার মতো ঘাড় উঁচু করে আরেকজন বীর রাজাকার স্বগৌরবে গিয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের পতাকা শোভিত গাড়িতে উঠে।

এরপর কয়েকদিন ভীষণ ব্যস্ততায় কেটেছে গাজি আবু জাহেলের। সভায়-সংবর্ধনায় বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে তাকে।

গণহত্যার অভিযোগ মাথায় নিয়ে যে গ্রাম থেকে একদিন রাতের অন্ধকারে তাকে পালাতে হয়েছিল, সেই রসুলপুর গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো তার সম্মানে আজিমুসসান সংবর্ধনা।

অনুষ্ঠান স্থলে বীরের মতোন তিনি যখন উপস্থিত হলেন তখন মঞ্চের চারপাশে হাজার হাজার তৌহিদী জনতার উপচে পড়া ভীড়।

তার শুভাগমনে অনুষ্ঠানের ঘোষক আবেগাপ্লুত হয়ে মাইকে বলে যাচ্ছে-

প্রিয় জেহাদি জনগণ– আজ আমরা যে মহান ব্যাক্তিত্বকে সংবর্ধনার ইনতেজাম করেছি, তিনি একাত্তরে অত্র এলাকার আলোচিত চরিত্র, প্রখ্যাত রাজাকার, বীর মোজাহিদ দালালকুল শিরোমণি হজরত মহতেরম আবু জাহেল গাজী সাহেব। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা এবং কৃতিত্বের সাথে ৭১ সালে মুক্তি নামের বিচ্ছুদের সাথে মরণপণ যুদ্ধ করিয়া এবং এলাকার মেয়ে মানুষ সরবরাহ করিয়া পাকিস্তানি প্রভুদের জোশ চাঙ্গা করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহান ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে সুদূর লন্ডনে বসবাস করিয়াও সেখানে অসংখ্য জেহাদি সূর্য সন্তান লইয়া প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছেন কীভাবে বাংলা প্রিয় দুষ্কৃতিকারী কুমিনিস্টদের খতম করিয়া এই ভূমিকে আবারও পেয়ারা পাকিস্তান বানানো যায়। তেনাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়ই আজ আমাদের এই উত্থান এতো অগ্রগতি।

ঘোষকের কথায় মুহুর্মুহু করতালিতে ভরে উঠে সভাস্থল।

আবু জাহেল সুযোগ্য উত্তরসূরিদের মুখে বিভিন্ন উপমা শুনে শুনে পুলকিত হন।

একসময় অসংখ্য ফুলের মালা গলায় নিয়ে তিনি এসে মাইকের সামনে দাঁড়ান।

পকেট থেকে বিলেতি সুগন্ধী মাখা রুমাল দিয়ে মুখ মুছে তিনি বলেন–

হাজিরানে মজলিস, হাজারো তকলিফ এলান করে আপনারা এই সভায় হাজির হয়েছেন বলে আমি সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

ভাই আওর বেহনো

আপনাদের সামনে আবারও খাড়াইয়া কথা বলার মওকা পাব এটি কোনোদিন ভাবি নাই। আপনারা জানেন আমি পাকিস্তানের আশিকে দিওয়ানা ছিলাম বলিয়া একাত্তরের গণ্ডগোলের পর মুক্তি বাহিনীর জালিমেরা আমার উপর অকথ্য নির্যাতন করিয়াছে। সেইসব হারামীদের আস্ফালন আপনারা এই মাটিতে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া ৩২ বছর পর হইলেও আমরা আবারও ৪৭ এ ফিরিয়া আসতে পারিয়াছি। এজন্য শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।

ভাই আওর বেহনো– আপনাদের প্রতি একটা ছোট্ট অনুরোধ, আপনারা সবসময় এসব বাংলা প্রিয় শয়তান, নাফরমানদের কাছ থেকে দূরে থাকবেন। মনে রাখবেন এরা কুমিনিস্ট, খাড়াইয়া মুতে এরা আমাদের নুরানি সুরত আর শরীরের গোস্ত দেখিয়া হিংসায় মরে। এরা এই পবিত্র মাটিকে আবারও হিন্দুস্তান বানাইতে চায়। এদেরকে প্রতিহত করুন আমরা আপনাদের পিছনে আছি। কৃতজ্ঞতা জানাই পেয়ারা ভাবী লেদা বিবি এবং তার সুযোগ্য পুত্রকে একাত্তরে তিনি আমাদেরকে যেভাবে চাঙ্গা করিয়া ছিলেন সেভাবে আবারও তার সঞ্জিবিনি সুরা দিয়ে আমাদেরকে জীবিত করিয়াছেন। আমরা তার কাছে চির কৃতজ্ঞ। আমৃত্যু তিনি যেন তার অপরূপ রূপ দিয়া আমাদেরকে আলোকিত করতে পারেন। আমীন। বাংলাস্থান জিন্দাবাদ।

সংবর্ধনা সভায় এতো লোকের সমাগম দেখে আবু জাহেল বিস্মিত। হতবাক। এই দেশে ইহা কীভাবে সম্ভব! সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আর লেদা বিবির করুণা। তেনার পাশে গিয়ে একবার বসার খুব খায়েস আবু জাহেলের। দোস্ত হাজামী বলেছে একবার নিয়ে যাবে।

গত কয়েক দিনে অসংখ্য সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতে দিতে বীর রাজাকার গাজী আবু জাহেল খুবই ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। পাঠার মতো শরীরটা যেন আর চলতে চাচ্ছে না, আজ তার বিশ্রাম প্রয়োজন।

দীর্ঘ দিন পর নিজ গ্রামে ফিরে এসে বেশ ভালোই লাগছে তার। পথঘাট সবই আগের মতোই ছায়া সুনিবিড়, শুধু আশেপাশের মানুষ গুলো অচেনা। কেউ কেউ বাঁকা চোখে তাকালেও বেশিরভাগ লোকই তাকে খুব সমীহ করছে। রাজাকার পোনাগুলো বড়ই ভালো। কয়েকজন গিলমান তার নজর কেড়েছে। চাইলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। আহা বহুত দিন এই সাধ থেকে বঞ্চিত।

আগেকার কোনো হারামি লোক আজ তার চোখে পড়েনি। মনে মনে ভাবেন এরা সব গেল কই? যারা একদিন তাকে দেশছাড়া করেছিল।

পিতৃপুরুষের ভিটায় বহুদিন পর এসে আবু জাহেল স্বস্তিবোধ করলেও কেন জানি ভয় কোনোভাবেই মন থেকে যাচ্ছে না। যে ঘরে রাত্রি যাপনের জন্য চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সে ঘর তিনি নতুন করে তৈরি করিয়েছেন কিন্তু এরপরও একাত্তরের স্মৃতিগুলো যেন এখনো লেগে আছে চারপাশে। এই ভিটায় তিনি অসংখ্য রাত কাটিয়েছেন। অনেক ঘটনার সাক্ষী এই মাটি।

রাত বাড়তে থাকে বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ, তিনি ক্লান্তি আর অবসাদে বিছানায় গা এলিয়ে দেন। মনে মনে গোস্বা হন ভক্তদের উপরে এই চমৎকার আয়োজন আর মধুময় হতো একজন খুবসুরত আওরাত থাকলে।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে সময় গড়িয়ে যায় তবুও তার ঘুম আসে না। অন্ধকার ঘরে অনেক পুরানো স্মৃতি চোখে ভাসে, এখানে কত লোককে হাত-পা বেঁধে নির্যাতন করেছেন তিনি। কত জনকে গলা টিপে হত্যা করেছেন আর গ্রামের কচি কচি ছেলেমেয়েদের সাথে ফুর্তি করে করে রাতদিন পার করেছেন। সেসব স্মৃতিক্লান্ত আবু জাহেলের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আজ। পুরানো স্মৃতি এই শীতের রাতে তার মনে উষ্ণতা ছড়ায়। ভাঙাচুরা শরীর গরম হয়ে উঠে। জেগে উঠে আদিম পশু। কোল বালিশ আঁকড়ে ধরেন তিনি।

হঠাৎ চমকে উঠেন, টের পান অন্ধকারে বিছানার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। একটি নয় দুটি নয় একে একে তিনটি ছায়ামূর্তি তার দিকে এগিয়ে আসে। তিনি ধমক দিয়ে বলেন–

এ্যাই কে তোরা? এখানে কী করস?

কোনো শব্দ নেই, ছায়ামূর্তি গুলো সামনে এগুয়।

আবু জাহেল আবারও বলেন তোরা কী চাস? বাইরে কিন্তু পুলিশ আছে।

একজন তার সামনে এসে বলে– চুপ শুওরের বাচ্চা রাজাকার, দেখ তো চিনতে পারস কি না?

আবু জাহেল বিছানায় উঠে বসেন, ভয়ে তার গলা শুকিয়ে যায়, কপাল থেকে ঘাম ঝরে, বিড়বিড় করে দোয়া দুরূদ পাঠ করেন।

ধীর পায়ে ছায়ামূর্তিগুলো এসে তার সামনে দাঁড়ায়।

আবু জাহেল কাতর কণ্ঠে বলেন– ভাইসব কি চান আপনারা? এই ব্যাগে বিলাতি টাকা আছে সব নিয়ে যান।

একটা মূর্তি বলে, আমরা টাকা নিতে আসিনি।

–তাহলে কে আপনারা? আমি তো আপনাদেরকে চিনি না ভাইসব।

মূর্তিগুলো বলে– ভালো করে দ্যাখ চিনতে পারবি।

আমি আব্বাস

আমি মকবুল

আমি সমসু

আবু জাহেল কেঁদে কেঁদে বলে- ভাইসব আমি তো আপনাদেকে কোনোদিন দেখি নাই, আমি গত ৩২ বছর দেশের বাইরে ছিলাম।

–৩২ বছর বাইরে ছিলি তো কি হইছে, এর আগের কথা মনে কর। ভালো করে দ্যাখ এই মুখগুলো চিনতে পারস কিনা?

আবু জাহেল বিস্ময়ে মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন, পরে আমতা আমতা করে বলেন– হ্যাঁ এখন চিনতে পেরেছি, কিন্ত তোমরা তো মরে গেছো সেই একাত্তরে।

ছায়া মূর্তিগুলো এক সাথে বলে উঠে- না আমরা মরি নাই, তুই মারছোস, এই ঘরে নির্যাতন করে।

কিন্ত আমরা এখনো মরি নাই। আমরা আছি থাকব।

যতদিন তোমরা থাকবে, ততোদিন আমরা থাকব এই দেশের ঘরে ঘরে মানুষের অন্তরে, ভিন্ন নামে ভিন্ন পরিচয়ে। আমরা থাকতে তোরা এই রক্তে ভেজা মাটি অপবিত্র করতে পারবি না। তোর মতো দেশদ্রোহী রাজাকারের এই দেশে ঠাঁই হবে না। আমরা একবার ক্ষমা করেছি আর করব না।

একে একে সারা ঘর ছায়ামূর্তিতে ভর উঠে, আবু জাহেল চিৎকার করে উঠেন, চোখেমুখ ফোটে উঠে আতঙ্কের ছাপ। তার চিৎকারে বাইরে পাহারায় থাকা পুলিশ দৌড়ে আসে। তিনি পাগলের মতো বলেন আমাকে এক্ষুনি এখান থকে নিয়ে যাও না হলে এরা আমাকে মেরে ফেলবে।

সে রাতেই তিনি গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসেন। পরের দিন ঢাকা থেকে সোজা লন্ডনে।

মেন্দি মেন্দি ভালোবাসা

লুনা রাহনুমা

ডান হাতে আর বাম হাতে বাটা মেন্দির দুটা থেবড়া গোল্লা নিয়ে একঘণ্টা ধরে বসে আছে পারু। হাতের এই মেন্দি শুকিয়ে কয়লা হলে আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে তোলা হবে। শুকনো গুঁড়ো তোলার সাথে সাথেই পানি লাগানো যাবে না। মেহেদির রঙের উপরে ভালো করে সরিষার তেল মাখানো হবে। তারপর আরো ঘন্টাখানেক হাতে পানি লাগানো যাবে না। তার মানে বেশ অনেকক্ষণের জন্য ঘরের কাজকর্ম সব বন্ধ। শিপন লাঞ্চ করতে বাড়ি এসেছিল দুপুর দুটায়। তখন পারুর জন্য মেন্দি বাটছিল ঘরের ছুটা বুয়া জয়তুনের মা। আজ সকালে শায়লাদের বাড়ি থেকে এসেছে এই পাতা। তাদের বাগানে একটা পুরানো মেন্দি গাছ আছে। সেই গাছের পাতা। এই পাতা আজ পারুকে জানাবে সে শিপনের সাথে সংসার করবে নাকি করবে না। শায়লাদের বাড়ির মেন্দি পাতারা এই বাড়িতে আজ স্বয়ং প্রফেসর হাওলাদারের আসন পেতে বসেছে।

খটকা লাগছে আপনাদের মনে? আচ্ছা আরেকটু ভেঙে বলি। মেন্দির পাতায় যদি রং ভালো হয় তাহলে পারু বুঝবে শিপন তাকে সত্যি ভালোবাসে। রং যদি পানসে লাল হয়, কিংবা হালকা কমলা হয়, অথবা আরো খারাপ, মানে ফ্যাটফ্যাটে হলুদ হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে শিপন পারুকে আসলে ভালোই বসে না। আর ভালোবাসলেও সেই ভালোবাসার মাত্রা খুব কম। নেই বললেই চলে। কত প্রেম দেখায়! সব উপরে উপরে। ছলনার খেলা সেসব।

–আজ তোমার জন্য বেলিফুলের মালা নিয়ে এলাম। হাতে নিয়ে দেখলেও না যে? টেবিলে বসে একা ভাত খেতে খেতে শিপন বলে পারুকে উদ্দেশ্য করে।

পারু ঘাড় গুঁজে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ বাইরের রাস্তায়। মন খাবার টেবিলে শিপনের কাছে।

পারুর জবাব না পেয়ে শিপন নিজে নিজেই কথা বলতে থাকে। খাবার সময় ওর কারো সাথে গল্প করতে হয়। বড় চাচা বলেছে খাবার সময় বেশি কথা বললে খাবারের সাথে পেটে বাতাস ঢুকে যায়। পেটে ব্যথা হয় তাতে। কিন্তু মুখ বন্ধ করে চুপচাপ খেয়ে উঠতে দম বন্ধ হয়ে যায় শিপনের। পারুর দিকে মুখ উঁচু করে আবার বলল, কারওয়ান বাজারের সামনে এই ভর দুপুরেও বাচ্চাগুলো ফুলের মালা হাতে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। দেখে মায়া লাগলো জানো। ওদের তো স্কুলে যাবার কথা। সারাটা জীবন কি ওরা দৌড়ে দৌড়ে মালা বিক্রি করেই কাটাবে নাকি? আমাদের দেশটার উন্নতি হবে কীভাবে ভাবো তো!

এবারও কথা বলে না পারু। মনে মনে বলে, বেলি ফুলের মালা আমার প্রিয়। আমাকে খুশি করতে উনি মালা আনেননি, এনেছেন পথের বাচ্চাদের সাহায্য করতে!

শিপনের দিকে তাকিয়ে জোরে বললো, আমার চেয়ে ওই রাস্তার বাচ্চারা তোমার কাছে বেশি বড় হয়ে গেল?

মুখের ভাত আরেকটু হলে গলায় আটকে বিষম খেত শিপন। কই থেকে কই চিন্তা করছে মেয়েটা! হাত বাড়ালো শিপন পানির গ্লাসের দিকে। ছোঁ মেরে গ্লাসটা নিজের হাতে তুলে নেয় পারু। ঠান্ডা পানির গ্লাসটি উঁচু করে বলে, আগে আমার কথার জবাব দাও তারপর পানি পাবে।

একটু ধাতস্ত হয়ে শিপন বলে, কোন কথার জবাব দিব? আরে বাবা, আমি কখন বললাম যে তোমার চেয়ে রাস্তার মানুষ আমার কাছে বেশি ইম্পরট্যান্ট! বলেছি?

-হ্যাঁ, বলছো।

-না বলি নাই।

-অবশ্যই বলছো তুমি।

-এমন কিছু শুনে থাকলে তুমি ভুল শুনেছ।

-খবরদার এখন বলব না যে আমি কানে খাটো।

-তোমাকে আমি খাটো বললাম কবে? অবশ্য বেশি না, তুমি আমার চেয়ে লম্বায় মাত্র দেড় হাত খাটো।

-এই তো, এই তো, দিলা আরেকটা খোঁটা! এর জন্যই তো বিয়ে করছিলা আমাকে।

-শুধু এজন্য না। আরো অনেক কিছুর জন্য জানুমুনু।

শিপনের মিষ্টি কথা পারুর কানে গিয়েছে কিনা বোঝা গেল না। কারণ পারু শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে খুব কাঁদছে। কান্নার ঢেউ চমৎকার একটা তরঙ্গ তুলেছে পারুর

পাতলা শরীরে। ঘড়ির দিয়ে তাকিয়ে শিপন ছুট দিল। অফিসে মিটিং আছে।

-পারু গেলাম। রাতে তোমার সব অভিযোগ শুনব। দরজাটা বন্ধ করে দিও।

পারু পাখি পোষে। তিন বছর আগে ওদের প্রথম বিয়ে বার্ষিকীতে শিপন পারুকে জিজ্ঞেস করেছিল কি উপহার চায়। পারু বলেছিল এক জোড়া ময়না পাখি পেলে সারাটা দিন ওদের সাথে কথা বলে কাটাতে পারত। দুষ্টামি করে শিপন বলেছিল, ময়না পাখি নাকি সত্যিকারের একটা ময়না বেবি হলে বেশি খুশি হতে? বারান্দায় পাখির খাঁচার সামনে এসে দাঁড়ায় পারু। পাখি দুটি পারুর দিয়ে তাকিয়ে শিস বাজায়। চাঁদের হিসাব অনুযায়ী আজ পূর্ণিমা হবার কথা আছে। আর পূর্ণিমার কয়েকটি দিন ওরা অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে গল্প করে। পারুর গানের গলা খুব মিষ্টি। গলা খুলে গান করে সে একের পর এক। ওদের সুখের দিনগুলো চমৎকার ছন্দময় একটি কবিতার মতো। কিন্তু সময়ে সময়ে পারুর মাথায় কী যেন একটা ভর করে। বিবাহিত জীবনে প্রতারিত হবার ভয়। সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতক আঘাতের ভয়। গৃহহারা হবার ভয়। শিপনকে হারানোর ভয়। শিপনের ভালোবাসা শেষ হয়ে যাবার ভয়। অনেক সুখের ভেতরেও পারুকে ভয়ংকর দৈত্যের মতো তেড়ে আসে নির্যাতিত হবার ভয়। পারু জানে না নিশ্চিত নিরাপদ এই বিশ্বস্ত জীবনেও এই ভয়ের ধোঁয়া কোথা থেকে আসে ওর মনে আর কীভাবেই বা আচ্ছন্ন করে ফেলে ওর সুখের সব চৈতন্যকে!

জয়তুনের মা এই বাড়িতে কাজ করে কয়েক বছর হলো। প্রতিদিন এসে তার তিনটা কাজ করার কথা। ঘর ঝাড়ু দেয়া আর ঘর মোছা। কাপড় ধোয়া। বাসি থালাবাটি ধোয়া। প্রতি কাজের জন্য সে এক হাজার টাকা পায় মাসে। পারুর জন্য তার একটু মায়া লাগে মনে। মাঝেসাজে টুকটাক কাজ সে পয়সার হিসাব ছাড়াই করে দেয়। এই যেমন আজ মেন্দি পাতা বেটে দিল নিজে থেকেই। এর জন্য আলাদা চার্জ করবে না সে।

-আফা, মেন্দি পাতার সাথে চা পাতা আর লেবুর রস মিশাই দিই? হাতে দিলে রঙ ভালো হইব।

-না। কিচ্ছু দিবা না। শুধু মেন্দি পাতার রং চাই।

-আপনি এই পাতা কি চুলে দিবেন?

-না হাতে দিব।

-এতো কষ্ট কইরা হাতে দিলে বাজার থিক্যা একটা টিউব মেন্দি কিন্না এইন্যা দেন। গাছের মেন্দিতে হাতে বেশি রং দেয় না।

-খালা, তুমি কথা কম বলবা? তোমার কাজ পাতা পিষা, তুমি সেইটা করো মন দিয়া।

পারুর কথায় কিছু মনে করে না জয়তুনের মা। মেয়েটা একটু পাগলাটে হলেও মনটা ভালো। যখন তখন একশ দুইশ টাকা তার হাতে গুঁজে দেয় বেতনের বাইরেও। তাছাড়া মেয়েটার মা বেঁচে নেই। মায়ের জন্য নিশ্চয়ই মেয়েটার মনে খুব কষ্ট হয়!

সোফার উপরে পুরানো ছবির এ্যালবামগুলো পড়ে আছে এখনো। গত সপ্তাহে আলমারি গুছাতে গিয়ে এ্যালবামগুলো বের করেছে পারু। বেশিরভাগ ছবি ওদের বিয়ের ও বিয়ের পরের বছরে তোলা। পারুর জীবন একরকম শুরুই হয়েছে শিপনের সাথে বিয়ে হবার পর থেকে। একটি এ্যালবামে একশর বেশি হলুদ ছবি। ওদের গায়ে-হলুদের ছবি। শিপন তখন আরো অনেক রোগা ছিল। এমনিতেই ওতো লম্বা মানুষ তার উপর ঢ্যাংঢ্যাঙ্গা পা দুটি ছবিতে দেখে হাসি পেল পারুর। চার বছরে পারু কম করে হলেও শিপনের ওজন বাড়িয়েছে দশ কেজি আর নিজের পাঁচ কেজি। দুজনকেই দেখতে পাকা সংসারী মানুষের মতো লাগে এখন। এ্যালবামের শেষ দিকে কয়েকটি ছবি আছে শুধু হাতের। গায়ে হলুদের কন্যার মেহেদীমাখা হাত। বিয়ের সময় পারুর হাত ভর্তি করে মেহেদির ফুল এঁকে দিয়েছিলো এলাকার এক নতুন বৌ। ছবির দিকে তাকিয়ে পারুর মন চলে গেল সেই হলুদ সন্ধ্যায়। নতুন বৌটি পারুর হাতে মেহেদির গাছ, ফুল, পাতা আঁকতে আঁকতে বলেছিল, আমাদের গ্রামে বিয়েতে মেন্দি গাছের পাতা বেটে হাতে নকশা করা হয়। হাতের মেন্দি শুকালেই জানা যেত ভবিষ্যতে স্বামী আপনাকে কতখানি ভালোবাসবে। এখন তো সব টিউব মেন্দি, খালি কেমিক্যাল। এরা এসব কথা বলতে জানে না।

আর যায় কই! পারুর মাথায় শিপনের ভালোবাসার প্রমাণ নেয়ার ভূত চেপে বসলো। আজকেই। প্রমাণ পাবার একমাত্র উপায় মেন্দি পাতার রং দেখা। যেই ভাবনা সেই কাজ। পাতা জোগাড় হয়েছে। মিহি করে বেটে তুলে রাখা হয়েছে। বিকাল ঠিক চারটার সময় দুই হাতে মেহেদি বাটা মেখে টিভির সামনে বসেছে পারু। শিপন বাড়ি ফিরবে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টার মধ্যে। রাস্তায় জ্যামের উপর নির্ভর করছে কত জলদি আসবে। পারুর ইচ্ছে শিপনকে সামনে বসিয়ে রেখে সে হাতের মেহেদির রং দেখবে। পুরো ব্যাপারটিতে যে পারু পাগলামি করছে, সেটা ওর একদমই মনে হয় না। টিভিতে অনুষ্ঠান হচ্ছে। বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। আযান হলো। সংবাদ পাঠিকা বাংলায় সংবাদ শিরোনাম পড়ে আবার বিজ্ঞাপন বিরতিতে গেল। পারু তবুও সোফার উপর বসে থাকে। চোখ জোড়া টিভির উপর আর কান জোড়া দরোজার ওপাশে, সিঁড়িতে শিপনের পায়ের শব্দ শুনবে কখন!

প্রতিদিনের মতো শিপন অফিস শেষে বাড়ি ফিরে প্রথমেই গোসল করে নিল। অফিসে লোকজনের ভিড়ে করোনার ভয় আর রাস্তার ধুলো বালি গা থেকে ডলে মুছে তবেই শান্তি। পারুকে আজ খুব অন্যরকম লাগছে। দুপুরে লাঞ্চ করতে এসেছিল যখন, তখনো কথা বলেনি ঠিক মতো। অযথাই কান্না করছিল যাবার সময়। এখনও মুখ থমথম করছে। শিপন পারুর হাত দুটি ধরে নিজের কাছে বসায়। পারুর চোখ দুটি ছলছল করছে।

-আজ তোমার মায়ের মৃত্যুবার্ষিকী। এই কথাটা আমার সকাল থেকেই মনে ছিল। তোমার খারাপ লাগে তাই তোমার সামনে কিছু বলিনি। আমি মসজিদে মিলাদ পড়িয়েছি আছরের সময়। মায়ের জন্য মন খারাপ লাগছে?

পারু চোখের পানি লুকায় না। বাচ্চা মেয়ের মতো কাঁদতে থাকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে যেটুকু বলতে পারল তার অর্থ শিপন বুঝতে পারে। পারু জানতে চায়, শিপন তাকে ভালোবাসে কিনা!

-অনেক ভালোবাসি। কেন, তোমার বিশ্বাস হয় না?

পারু নিজের দুই হাত মেলে ধরে শিপনের সামনে। নরম কোমল হাত দুটির মাঝখানে দুটি কমলা বৃত্ত।

-মেহেদি পড়েছ আজ? খুব সুন্দর রং হয়েছে। ভালো লাগছে তোমার হাতে।

পারুর হাতের তালু উঁচু করে নিজের ঠোঁটের কাছে আনে শিপন। চুমু খেতে যায়। ঝটকা মেরে দুই হাত সরিয়ে নেয় পারু।

-তুমি আমাকে ভালোবাসো না। এই যে তার প্রমাণ।

আকাশ পাতাল কিছুই বুঝতে পারে না শিপন। বোকা মেয়েটাকে আরেকটু সময় দেয়। আজ মন খারাপের দিন। আজ তার চারপাশের সব কিছুকেই কৃতঘ্ন মনে হবে, আশ্চর্যের কিছু নেই। ভরসা আর ভালোবাসা আপনা আপনি জাগে না কারো মনে। অর্জন করে নিতে হয়। শিপন চেষ্টা করে যাচ্ছে। বোকা বোকা চিন্তা করা সুন্দর মনের মেয়েটিকে শিপন খুব ভালোবাসে। বছর পাঁচেক আগে এক বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে পারুকে প্রথম দেখেছিল শিপন। খোঁজখবর নিয়ে পারুদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায় সে। বিয়ের প্রস্তাব তুলতে গেলে জানা যায়, পারুর জন্মের ছয় মাস আগে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে ওর বাবা আর ওকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান ওর মা। পারিবারিক বিবাদের কারণে পারুকে কেউই লালন-পালনের দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল না। বাধ্য হয়ে ছোটবেলা থেকে সে কিছুদিন এক চাচার

বাড়ি, কিছুদিন মামার বাড়ি, কিছুদিন নানি-দাদি এভাবে করে কাটিয়েছে। শৈশব-কৈশোরের নানারকম মানসিক নির্যাতনের ভার এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে সে নিজের মনের ভেতর। শিপনের নিজের উপর আস্থা আছে, তার ভালোবাসা পারুকে আগের জীবনের লাঞ্ছনার স্মৃতি অবশ্যই ভুলিয়ে দিবে। দিতেই হবে। নইলে আর ভালোবাসা কেন?

শিপন ধীর পায়ে উঠে গিয়ে অফিসের ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট গোলাপি ফিতে বাঁধা বক্স বের করে আনল। যত কষ্টের দিনই হোক না কেন, আজ একটা খুব খুশির দিনও বটে। আজ পারুর জন্মদিন। পারুর জন্য একটা ছোট্ট গিফট আছে এই বক্সে।

-নাও। খুলে দেখো কী আছে এর ভেতর।

সময় নিয়ে বক্সটি খুললো পারু। পাতলা চেইনের উপর ছোট্ট ঝুমঝুমি বসানো একজোড়া রুপোর নূপুর। অবাক হয় পারু।

-নূপুর?

-হুম নূপুর। তোমার জন্য।

-কেন?

-তুমি পরবে তাই।

-আমি তো নূপুর পরতে চাইনি।

-আমি চেয়েছি।

-কেন?

-আজ তোমার জন্মদিন।

-তো?

-আজ পূর্ণিমা।

-আর?

-আজ অনেক রাত পর্যন্ত আমি তোমাকে অনেক গল্প শোনাবো। তোমার প্রিয় জীবন-বাবুর কবিতা শোনাবো। তুমি শুনবে।

-নূপুরের কী সম্পর্ক এতে?

-আমাদের কথার মাঝে বার কয়েক তুমি অযথাই ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে হেঁটে যাবে। আমি চোখ বন্ধ করে তোমার পায়ের রিনিঝিনি শুনবো। এটুকুই।

একটুকরো সেলফায়িত রিফলেকশন

এ কে এম আব্দুল্লাহ

দীপা ঘুমিয়ে আছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ওকে জোছনার জল ধূয়ে দিচ্ছে। হালকা হাওয়ার স্পর্শে দীপার কপালের ওপর পড়ে থাকা চুল মাঝে মাঝে নড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে পবিত্রতার সুগন্ধ যেন ছড়িয় আছে পুরো ঘরময়। গত তিন সাপ্তাহ থেকে ওর ওপর বেশ চাপ গেল। কারণ এই বাসায় মাত্র তিন সাপ্তাহ হলো মুভ হলাম। অথচ ঘরের সব কিছু বলতে গেলে দীপা একাই সেট করেছে। চমৎকারভাবে সাজিয়েছে। সবকিছুতেই মার্জিত রুচির ছাপ বেশ ঝলমল করছে। আমি অনেক চেষ্টা করে ছুটি নিতে পারিনি। ওকে তেমন কোনো সাহায্যও করতে পারিনি। বাসাটা ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। তাই মন খুলে সবকিছু করেছে। আজকাল বাসা ভাড়া নিতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। এক তো বেশি ভাড়া তার ওপর কত কন্ডিশন এবং বাসার মালিকের মন-মর্জি কী রকম ইত্যাদি কত পেরেশানি থাকে। এরপরও বড় সমস্যা হলো যদি বউ এর বাসা পছন্দ না হয়, তাহলে যন্ত্রণা তিনগুণ বেড়ে যায়। সবসময় কানের কাছে প্যান প্যান লেগেই থাকে।

বাসার পাশেই খুব সুন্দর একটা খেলার মাঠ। অবশ্য এখানে এই মাঠ দেখে দীপা আর আমি প্রথমে শকড হয়েছিলাম, শহরের ভেতর এখনো এরকম একটা বিশাল মাঠ আছে দেখে। আজকাল খালি এক টুকরো জায়গা পেলেই বড় বড় বিল্ডিং গড়ে ওঠে। দীপা এই মাঠ দেখেই বাসাটা পছন্দ করে। জানালা দিয়ে বিকেলে শিশু-কিশোরদের হৈ-হোল্লর, ফুটবল, ক্রিকেট খেলার দৃশ্য আসলেই ভালো লাগে। আঁখিদর্পণে ভেসে ওঠে শৈশবের অনেক স্মৃতি। মেইন রাস্তা থেকে দুইশত ইয়ার্ডের মতো গেলেই বাসার গেইট। দুতলা বিল্ডিং। নিচে দুটো এবং ওপরে দুটো ফ্ল্যাট। নিচে ল্যান্ডলর্ড থাকেন। ওপর তলায় এখন আমরা একটা ফ্ল্যাটে ওঠেছি। আর একটা ফ্ল্যাট এখনো খালি। দু-ফ্ল্যাটের মধ্যখানে প্যাসেজ। উত্তর দিকে ছোট একটি দরজা আছে। দরজা খুললেই চমৎকার ছাদ। ছাদের চারদিকে টবে লাগানো আছে দেশি-বিদেশি ফুলের গাছ। সুন্দর মনভোলোনো পরিবেশ। ছাদ ঘিরে আড়াইফুট উঁচু রেলিং।

শুনেছি খালি ফ্ল্যাটের জন্য ট্যানেন্টের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। আজ হোক আর কাল হোক কেউ আসবে।

বাসার মালিকের দুটি ছেলে। তারা বড় হয়েছে। এক ছেলে কানাডা থাকে। এক ছেলে দুবাই থাকে। ছেলেরা বউ সন্তান নিয়ে সেখানেই থাকে। মাঝে মাঝে দেশে এলে বসায় নিচের ফ্ল্যটে থাকে। তাই নিচতলা কখনো ভাড়া দেওয়া হয় না।

রাত একটা বেজে গেছে। জরুরি কাজে আটকে ছিলাম বাসায় আসতে দেরি হয়ে গেল। ক্লান্ত দীপা অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। নীল রঙের নাইট ড্রেসে ঘুমিয়ে থাকা দীপাকে অপূর্ব লাগছে। আমি ওকে না জাগিয়ে শুয়ে পড়ি। অবশ্য ফোনে আগেই বলে দিয়েছি, আমি খেয়ে আসব ও যেন খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাসার মালিক মাহবুব সাব একজন বয়স্ক লোক। প্যারালাইসিসের কারণে একটি পা একেবারেই অচল। মুখ একটু বাঁকা হয়ে গেছে। একা একা হাঁটতে পারেন না। কেউ ধরে উঠাতে হয়। দেখাশোনা করার জন্য একজন লোক আছে। মাহবুব সাবের স্ত্রী জামিলা বেগমেরও বয়স হয়েছে। তবে এখনো ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারেন। এই কয়দিনেই দীপার সাথে ভালো ভাব হয়েছে। আমাদের ফ্ল্যাট থেকে বাইরে যেতে বা আসতে তাদের ফ্ল্যাটের সামনে দিয়েই যেতে হয়। আমার সাথে প্রায় সময় দেখা হয়। কথা হয়। কথা বলে বুঝতে পারি দুজনই খুবই ভালো মানুষ। দীপাকে বলেছেন একা মনে করলে সে যেন তাদের বাসায় যায়। তাদের কোনো মেয়ে সন্তান নেই। উনি দীপাকে মেয়ের মতো মনে করেন। জামিলা বেগমের প্রায়ই একা একা বাজারে যেতে হয়। দীপাকে বলেছেন উনার সাথে যদি যায়, ভালো লাগবে। দুজনে গল্প করে করে বাজার সেরে আসবে। মাহবুব সাহেব আমকে সে কথা বলেছেন। আমি না করিনি ভালোই হলো। আমি সারাদিন অফিসে থাকি। দীপা বাসায় একা একা হয়তো বোর হয়ে যাবে। দীপাকে বলেছি, তুমি জামিলা বেগমের সাথে যেও। আমাদের বাজারটাও হয়ে যাবে। দীপা খুশি হয়।

মাহবুব সাহেব ঘুম থেকে খুব সকালে ওঠেন। আজও একটি হুইল চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছেন। আমাকে দেখে মুখে ছোট একটা হাসি দিয়ে বল্লেন, কাসেম সাব কেমন আছেন? অফিসে যাচ্ছেন? আমিও হালকা হাসি দিয়ে বল্লাম জ্বি ভালো আছি। অফিসেই যাচ্ছি। আপনার শরীর কেমন?

আর শরীর, ঐ একই রকম। বয়স হচ্ছে। বুঝতেই তো পারছেন। লোকটার মুখে সবসময় হাসি থাকে। তাই কথা বলতে ভালো লাগে।

মাহবুব সাহেব বল্লেন, কাসেম সাহেব- ওপরের ফ্ল্যাটে আজ ট্যানেন্ট আসবে। খুব ভালো লোক। অনেক খোঁজ নিয়েছি। ছোট ফ্যামিলি। স্বামী-স্ত্রী আর একটা মেয়ে। বড় ছেলেটা কাজের জন্য বউ নিয়ে ঢাকার বাইরে থাকে।

বাড়িওয়ালার মুখ থেকে ট্যানেন্ট এর আগাম প্রশংসা শুনে সত্যিই খুব ভালোই লাগল। বাড়িওয়ালা এবং ট্যানেন্ট এর মধ্যে এরকম সুসম্পর্ক থাকা খুবই জরুরি। শুধু বাড়ির মালিক নয় ট্যানেন্ট এবং ট্যানেন্টের মধ্যে সুসম্পর্কও অত্যন্ত জরুরি। আমাদের অনেকেরই মা বাবা আত্মীয়স্বজন শহরের বাইরে থাকেন কিংবা একই শহরে, কিন্তু অন্য এলাকায়। আপদে বিপদে এই নেইবাররাই কিন্তু আপনার ডাকে প্রথমে আসবে। বর্তমানে ট্রাফিক জ্যামে অ্যাম্বুলেন্স আসতে যে সময় লাগে ততক্ষনে আপনার আমার বারোটা বেজে যাবে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আসতে আসতে নেইবারই কিন্তু আপনার কাজে আসে। তাই নেইবারের সাথে সুসম্পর্ক রাখা আবশ্যক। আমাদের সৌভাগ্য মাহবুব সাহেবের মতো একজন ভালো মনের বাড়িওয়ালা পেয়েছি। আশা করি ঐ ট্যানেন্টও নিশ্চয়ই ভালো হবে। তা না হলে নরক হয়ে যাবে। দেখেছি প্রায় সময় ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ট্যানেন্টদের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকে। কিছুদিন পূর্বে একটি বিল্ডিং এর দুতলার ট্যানেন্ট পাপোস ধুয়ে বারান্দায় শুকোতে দিয়েছিল, ভেজা পাপোস থেকে টপ টপ করে পানি ঝরছিল। এই নিয়ে নিচতলার ট্যানেন্টের সাথে কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়া শুরু হয়। একপর্যায় একজন মার্ডার হোন। ঝরে যায় একটা তরতাজা প্রাণ। ধ্বংস হয়ে যায় দুটি ফ্যামিলি। তাই ভাড়াটিয়া বা বাড়িওয়ালা ভালো না হলে কলহ লেগেই থাকে।

মাহবুব সাহেবকে বললাম, অফিস থেকে এসে দেখা করব। এখন চলি তা হলে। মাহবুব সাহেব হাতের পেপার পাশে রেখে, চোখ থেকে চশমা খুলে চোখ কচলাতে কচলাতে বললেন হ্যাঁ যান। দেরি হয়ে যাবে।

এখন উনি আমার চলে যাওয়ার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবেন। এরপর এভাবে একদিন উনি অফিসে যেতেন ইত্যাদি স্মৃতি মন্থন করবেন। এ বয়সে এ রকম ভাবতে হয়, এটাই নিয়ম। কথাটা উনিই একদিন আমাকে বলেছিলেন।

অফিস থেকে বাসায় ফিরতে প্রায় রাত নয়টা বেজে গেল। প্যাসেজে এখনো অনেক জিনিষপত্র এলোমেলো ভাবে রাখা। বুঝতে পারলাম নতুন ট্যানেন্টের মালপত্র গোছানো চলছে। কোনোরকমে ভেতরে ঢুকলাম। আমাদের বাসার দরজা খোলা। ভেতর থেকে রান্নার ঘ্রাণ আসছে। এই সময় সাধারণত দীপা রান্না করে না। আমাকে দেখেই টাওয়ালে হাত মুছতে মুছতে দীপা কিচেন থেকে বেরিয়ে এলো।

আমার কোট ব্যাগ নিতে নিতে বলল, ঐ বাসায় নতুন ট্যানেন্ট এসেছে। ঘরের মালপত্র গোছাচ্ছে। আমি চা নাশতা দিয়েছি। রাতের খাবার খেতে বলেছি। দীপার কথা শোনে বললাম খুব ভালো করেছ। এরকম সবারই করা উচিত। দীপা বলল, ওদের সাথে কথা বলে মনে হল, ওরা খুব ভালো লোক। ওদের মেয়েটি না ভারি মিষ্টি। টিনা। এ বছরই ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হয়েছে। মা একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়ান। বাবা রহমান সাহেব কি একটা কোম্পানিতে কাজ করেন। চা নাশতা খেয়ে একবার কথা বলে এসো।

টিনার সাথে দীপার সখ্যতা বেশ জমে ওঠেছে। টিনার বাবা কাজ থেকে ফেরে আসতে অনেক দেরি হয়ে যায়। মায়েরও বাসায় আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। কলেজ থেকে ফেরার পর টিনা, দীপার সাথেই সময় কাটায়। দুজনে প্রতিদিন বিকেলে ছাদে চলে যায়। টিনা অত্যন্ত আধুনিক ও চঞ্চল একটি মেয়ে এবং সেলফিবাজ। কলেজে যাওয়ার সময় আমার সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়। সবসময় কানে লটকে থাকে এয়ারফোন। কখনো দেখে বলবে ভাইয়া, একটু দাঁড়ান প্লিজ। কাছে এসেই একটি সেলফি তুলে বলবে ইনস্ট্রোগ্রামে পোস্ট দেব, মাইন্ড করবেন না তো। সে যে সেলফি অ্যাডিকট্যাড, এ কদিনে তা ভালো করেই বুঝেছি। মানুষ অনেক কিছুতেই অ্যাডিকট্যাড হয়। কেউ ড্রাগ অ্যাডিকট্যাড, কেউ অ্যালকোহলের। কেউ ফেইসবুকিং। কেউ লেখা, পড়া, গান শোনা ইত্যাদি। টিনা সেলফি অ্যাডিকট্যাড। ছাদে গিয়ে রোজ বিভিন্ন ভঙ্গিতে সেলফি তুলবে। ওর ফোনে হাজার হাজার সেলফি। নানা ভঙ্গিতে, অনেক ডেঞ্জারাস প্লেসেও। ইদানীং দীপাকে নিয়ে বেশ কিছু সেলফি তুলেছে। তাছাড়া দীপাকে বিভিন্ন কাপড় পরিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পোজে ছবি তুলে। পরে বাসায় এসে ছবিগুলো দীপার ল্যাপটপে ডাউনলোড করে দিয়ে যায়। দীপা এসব ব্যাপারে বড়ই উদাসীন ছিল। কতবার বলেছি স্মার্টফোন কিনে দিই। মানা করেছে। ওর কথা, এতে আসক্ত হয়ে পড়বে। বই পড়া ওর শখ। সময় নষ্ট করতে চায় না। সেই পুরানো মোবাইল ব্যবহার করে। বাকি কাজ ল্যাপটপেই করে। বিয়ের পূর্বে দীপার বাবা স্মার্টফোন কিনে দিয়েছিলেন। সেটা ওর বোনকেই দিয়ে দেয়। কিন্তু দীপা আজকাল রাতে ল্যাপটপ অন দিয়ে ডাউনলোড করা ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে, ছবিগুলো আমাকে দেখায়। চমৎকার সব ছবি। ছবিতে দীপাকে আরও আকর্ষনীয় মনে হয়। টিনা ফটো তুলতে জানে বলতে হয়। প্রফেশোনাল ফটোগ্রপারের মতো কাজ করেছে। দীপা ধীরে ধীরে সেলফিবাজিতে আগ্রহী হচ্ছে, বুঝতে বাকি রইল না। টিনার ফোন দিয়ে দীপা ছাদে বেশ কিছু সেলফিও তুলল। ওর ঠোঁটে আনন্দের ঝিলিক ছবিগুলোকে

প্রাণবন্ত করে তুলেছে। কিছুদিনের মধ্যে আমাদের বিয়ে বার্ষিকী। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, এবার লেটেস্ট মডেলের একটি স্মার্টফোন দীপাকে গিফট করব।

দেখতে দেখতেই আমাদের দ্বিতীয় বিয়ে বার্ষিকী চলে এলো। দীপা এবং আমি একমত হলাম এবার একেবারে সিম্পল আয়োজন করব। আমি দীপার অজান্তেই আমাদের জন্য 'রকেট ৭৮৬' নামে একটি আধুনিক রেস্টুরেন্টে ডিনার এর জন্য বুকিং দিলাম। ওরা কেকসহ সবকিছু রেডি করে রাখবে।

আমি আজ অফিস থেকে একটু আগেই বের হয়ে দীপাকে গিফট দেওয়ার জন্য লেটেস্ট মডেলের একটি স্মার্টফোন কিনে হোটেলের এডভান্সড বিল দিয়ে বাসায় চলে এলাম। ফোনটা ওদেরকে দিয়ে এসেছি। ওরা ফ্লাওয়ার থেকে শুরু করে গিফটপ্যাকিং র‍্যাপিং সব করে দেবে। দীপাকে সারপ্রাইজ দেব।

বাসা থেকে রেডি হয়ে বের হতে প্রায় সাড়ে সাতটা বেজে গেল। এটলিস্ট আটটায় পৌঁছাতে হবে। রাস্তার ট্রাফিকজ্যামের কোনো গ্যারান্টি নেই। ডিনার সার্ভ করবে নয়টার পর। দরজা থেকে বের হলেই আমার মনে হলো, প্যাসেজে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে টিনা। কেন এরকম মনে হলো জানি না। হয়ত তার চলন বলন দেখে মাথা সেভাবে তাকে নিয়ে ভাবছে। অনেক কিছুই সে আচানকভাবে করে। সত্যি সত্যি বের হতেই দেখি সে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুল হাতে দিতে দিতে বলল, হ্যাপি মেরেজ ডে। ওকে ধন্যবাদ দেবার সুযোগ না দিয়েই বলল, দুজন একদম ক্লোজ হয়ে একটু দাঁড়ান তো। এবার ফোন বের করেই কয়েকটা ক্লিক। এরপর আমাদের সাথে একটা সেলফি। এই ফটো প্রিন্ট করে ফ্রেমে বেঁধে আপনাদের উপহার দেব বলেই টিনা একটি মিষ্টি হাসি দিল। আসলেই মেয়েটি খুবই মিষ্টি। হাসার সময় মুখটা গোল হয়ে যায় দেখতে সত্যি অপূর্ব লাগে। ওকে বললাম আমরা 'রকেট'-এ যাচ্ছি। সেখানে ডিনার করব। তুমি আমাদের সাথে চলো।

-ওয়াও! এই রেস্টুরেন্ট আমার খুব প্রিয়। অনেক দেশের খাবার পাওয়া যায়। কিন্তু আজ যেতে পারব না। টিনা বলল।

বললাম কেন? আজ রাতে, মানে আরো কিছুক্ষণ পর ছাদে যাব। চাঁদের সাথে সেলফি তুলব। আজ চাঁদ অনেক নিচে থাকবে। ছাদের পাশঘেষে যে নারকেল এবং সুপারিগাছের পাতা উপরে উঠছে এর ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যাবে। এই ব্যাকগ্রাউন্ডে স্প্যাসিয়েল সেলফি তুলব। এই পিক ইনস্ট্রগ্রামে ডাউনলোড করার পর দেখবেন কী হাঙ্গামা-ই না হবে। কথাগুলো বলে ওর মুখে এক আশ্চর্য আনন্দ ফুটে উঠল।

বরলাম, এ তো দেখছি ভয়াবহ ব্যাপার। এরপর অল দ্যা বেস্ট বলে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গাড়িতে ওঠে বসলাম।

আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট। দীপা আর আমি বসে আছি হোটেল 'রকেট ৭৮৬' এর একটি চমৎকার কেবিনে। ফ্রেশ ফুল দিয়ে অনেক যত্ন করে টেবিলটি সাজানো হয়েছে। ফুলের ফ্রেশ ঘ্রাণে মৌ মৌ করছে। ফুল রাখা ভাজের পাশে দুটো মোমবাতি জ্বলানো। আসলেই চমৎকার রোমান্টিক পরিবেশ হয়ে ওঠেছে। ওয়েটার চমৎকার ডেকোরেটেড কেক দিয়ে গেছে। দীপা আর আমি সামান্য খেয়েছি। আসলে কেক আমার পছন্দের জিনিস না। ওয়েটারকে বলেছি তিন ভাগ করে ব্যাগে দিয়ে দিতে। একব্যাগ মাহবুব সাবের বাসায় একব্যাগ টিনা আর একটা দীপার জন্য। ওর কেক খুব পছন্দ। কিছুক্ষণ পর ওয়েটার এসে খাবার দিয়ে দেবে কি না জানতে চাইল। বললাম, হ্যাঁ। দিয়ে দাও। ইশারায় গিফটের প্যাকেট দিতে বললাম। ব্যাকগ্রাউন্ডে স্লোমোশনে রোমান্টিক মিউজিক বাজছে।

বেশ মুডি হয়ে প্যাকেট দীপার হাতে দিলাম। র‍্যাপিং করা পেকেট খুলতে খুলতে দীপা বলল, আমি কিছু কিনে রেখেছিলাম। সারপ্রাইজ দেব বলে। কিন্তু এখানে এসে নিজেই সারপ্রাইজ হয়ে গেলাম।

প্যাকেট খুলতেই দীপার চোখ কপালে ওঠে, একী! এতো একেবারে লেটেস্ট মডেলের মোবাইল। এটার কী দরকার ছিল? এত টাকা কেন খরছ করলে? তুমি তো জানো, এসবে আমার তেমন আকর্ষণ নেই। তা ছাড়া বাসায় মুভ হতে বেশ কিছু নতুন জিনিসপত্র কেনার কারণে অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল। এক শ্বাসে দীপা কথাগুলো বলল। আমি বললাম, ওসব বাদ দাও তো। বল পছন্দ হয়েছে কিনা? পছন্দ হবে না কেন? কিন্তু–

দীপা আবারও কিছু বলতে যাবে, আমি ওর ঠোঁটে হাত দিয়ে থামিয়ে বললাম এ ব্যাপারে আর কোনো কথা না। বরং বলো তো দেখি, এখন যদি আমাদের সাথে টিনা থাকত, তাহলে কী করত? মুচকি হেসে দীপা বলল, টিনা বলত, একটু দাঁড়ান, একটি সেলফি তুলে নেই। দুজনে হাসতে হাসতে বললাম চলো বাসায় যাই। তারপর কিছু সেলফি তুলে টিনাকে সারপ্রাইজ করে দিই। এরপর আমি একটা এ্যালবাম বানাব। নাম দেব দীপা-টিনার সেলফিবাজি।

বাসায় এসে পৌঁছতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি; বিল্ডিং এর গেইট খোলা। একটি অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশের গাড়ি। মানুষের ভিড়। বিষয় কী!

আগুন টাগুন লাগল নাকি। মাহবুব সাবের কি কিছু হলো? বুকের ধড়ফড় বেড়ে গেল। ধীরে ধীরে গেইটের ভেতরে ঢুকে দেখি মাহবুব সাব হুইল চেয়ারেই বসে আছেন। হুইল চেয়ার ধরে পাশে জমিলা বেগম দাঁড়িয়ে আছেন। সবার মুখ কষ্ট আর আতঙ্কের ছাপ। চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। অন্য পাশে টিনার মা বিলাপ করে কান্না করছেন। রহমান সাব স্ত্রীকে জড়িয়ে আছেন। চোখ দিয়ে অশ্রু বেয়ে বেয়ে পড়ছে।

কিছুই বোঝার আগে আমাদের সম্মুখে অ্যাম্বুলেন্স থেকে সাদা চাদর দিয়ে একটি লাশ নামিয়ে রাখা হল। মাহবুব সাব কান্নাজড়িত কণ্ঠে বল্লেন, এটা টিনার লাশ। আমরা নিজেদের কান বিশ্বাস করতে পারছি না। বললাম কী! হ্যাঁ। এটা আমাদের টিনার লাশ। বলেন কি? কিন্তু এসব কীভাবে হলো? মাহবুব সাব বললেন, সেলফি পাগল মেয়েটি ছাদে সেলফি তুলতে গিয়েছিল। পজিশন নিতে রেলিং এর ওপর ওঠে। আর পা পিছলে নিচে পড়ে যায়। পাশে বিল্ডিং তৈরির কাজ চলছে। সেখান থেকে একটা রড ওর পেটে ঢুকে যায়। অ্যাম্বুলেন্স কর্মীরা জানিয়েছে– অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ওর মৃত্যু হয়েছে।

মাহবুব সাব আর বলতে পারলেন না। দীপার হাত থেকে মোবাইল পড়ে খান খান হয়ে গেল। দীপা শরীরের ওজন ছেড়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমার হাতপা কাঁপছে। কোনো রকমে কোলে করে দীপাকে মাহবুব সাবের বারান্দায় হেলান দিই। পানির ঝাপটা দিতে দিতে ওর জ্ঞান ফেরে। কিন্তু কোনো কথা বলছে না। যেন অনুভূতিহীন পাথরের মতো। আমার চোখে ভেসে উঠছে এই তো কয়েক ঘণ্টা পূর্বে বলেছিল আজ ছাদে স্পেশিয়েল পিক তুলে ইনস্ট্রোগ্রামে পোস্ট দেবে। বলেছিল, আমাদের ছবি প্রিন্ট করে ফ্রেম করে দেবে। চোখের জল আর আটকাতে পারলাম না। চোখের সামনে টিনার তরতাজা লাশ। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।

আজ প্রায় তিন মাস হয়ে গেল, দীপার তেমন কোনো ইমপ্রোভ হচ্ছে না। ডাক্তার বলেছেন এই বাসা চেইঞ্জ না করলে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। কারণ, এখানে টিনার স্মৃতি সবসময় ওকে তাড়া করবে। তাই দীপা মুহূর্তের জন্য কিছুই ভুলতে পারছে না। দীপার সুস্থতার জন্য আজ বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। জিনিসপত্র সব আগেই চলে গেছে নতুন বাসায়। মাহবুব সাব হুইল চেয়ারে আমার হাত ধরে বসে আছেন। জমিলা বেগম দীপাকে জড়িয়ে ধরেছেন। কেউ কোনো কথা বলতে পারছি না। আমাদের সকলের চোখ থেকে কেবল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

না মানুষ
মিলটন রহমান

ঘুম থেকে জেগে দেখি একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। পারিপার্শ্ব পরিচিত নয়। ঝড়ো বাতাসে বালি উড়ছে। পাথর বালির নিচে ডুবে যায় তো আবার বাতাসের তোড়ে মাথা তুলে বাতাসের সাথে ধাক্কা খায়। মাঝে মাঝে চিহ্ন দেখা গেলেও কোথাও জলের অস্তিত্ব নেই। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়ায় ধুলো উড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় একটি পাথর। তাতে আলতামিরা গুহার চিত্রকর্মের মত লেখা 'কেপলার-৪৫২ বি'। তবে আশেপাশে খুঁজেও কোথাও কোন মানুষের অস্তিত্ব টের পেলাম না। সাথে কোনো খাবারও নেই। পানির তৃষ্ণায় চৈত্রের জমির মতো বুক ফেটে যাওয়ার যোগাড়। বালির ওপরে স্রোতচিহ্নের মতো জলের অস্তিত্ব আমাকে কিছুটা আশ্বস্ত করেছে। জলের চিহ্ন ধরে হাঁটতে থাকি। প্রায় দুই কিলোমিটার হেঁটে কোন পানি কিংবা প্রাণের সন্ধান পেলাম না। আলো আছে, বাতাস আছে, মাঝে মাঝে পাখির মতো কি যেন ডাকে। কোথাও কোথাও চাপা শব্দ শোনা গেলেও কিছু বোঝা যায় না। তবে দৃষ্টি সীমার একেবারে শেষপ্রান্তে তপ্ত বাতাসের সাথে কি যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। কেউ কি হেঁটে আসছে? বুঝার উপায় নেই। প্রচণ্ড বাতাস দৃশ্য বদলে দেয়। পুরো প্রান্তর ফাঁকা। কোথাও কিছু নেই। কেবল আলো আর বাতাসের গলাগলি। হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টির মতো জল ভিজিয়ে দিয়ে গেল আমায়। চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জল জিহ্বা দিয়ে চেটে তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করি। আহা কী সুস্বাদু। এখানে বৃষ্টির জল এতো মিষ্টি কেন? ওপরে তাকিয়ে দেখি তখনো একটি সাদা মেঘ আমায় ছায়া দিয়ে রেখেছে। আমি চিৎকার করে বলি, 'আমার আরো বৃষ্টি প্রয়োজন'। মেঘ সরে গেল। আমার কথা শুনল না। আমি হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ধনেশ পাখির মতো বৃহৎ আকৃতির একটি প্রাণী আমার সম্মুখে এসে নামল। পাখিটি ঠোঁটে বয়ে আনা কিছু ফল বালিতে রেখে আবার চলে গেল। ফলগুলো নানান রঙের গোলাকৃতির। এর আগে কখনো দেখিনি। ফলগুলো সুন্দর হলেও হাতে নেয়ার সাহস পেলাম না। অপরিচিত জায়গায় অচেনা ফল, খেয়ে আবার

কোন বিপদে পড়ি। ছোটবেলায় না চিনে দুৎরা গোটা খেয়ে অজ্ঞান হওয়ার ঘটনা মনে পড়ল। পৃথিবীতে এরকম বহু বিষাক্ত ফল আছে। আমি যেখানে এখন দাঁড়িয়ে সেখানে এমন ফলের আমদানি আমাকে কিছুটা ভীত করে তোলে। এই সময় হঠাৎ করে কোথা থেকে না মানুষ না পশু, এর মাঝামাঝি আকৃতির কয়েকটি প্রাণী এসে ফলগুলো বালি থেকে তুলে খেতে শুরু করে। ফল খায় আমার আমার দিকে অভাগ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বিনিময় করে। আমি তাদের কথা কিছুই বুঝি না। তাদের ভাষা কোন সময় শুনেছি বলে মনে হয় না। একজন আমার দিকে তাকিয়ে কী কী যেন বললো কিছুই বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝেছি আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু একটা বলেছে। ঝড়ো হাওয়া এসে পুরো এলাকা ধুলোয় অন্ধকার মেখে দিল। আমি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকি। টের পাই বাতাসের সাথে অসংখ্য প্রাণী চলে গেল আমার আশপাশ ঘেষে। ধূলিঝড় বন্ধ হওয়ার পর কাউকে দেখা গেল না। আমি একাই দাঁড়িয়ে আছি। সম্মুখে অসমাপ্ত প্রান্তর। কেবল পায়ের কাছে ক'টি পরিষ্কার ফল পড়ে আছে। ক্ষিদে নিবারণে দুটি ফল তুলে নিলাম। ফলগুলো এত ছোট, অনেকগুলো খেলেও পেট ভরবে না। একটি মুখে পুরো দিয়ে স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করলাম। এতো মিষ্টি ফল আমি আগে খাইনি কখনো। একটি খেতে আমার অনেক সময় লেগে গেল। উভে গেল ক্ষিদে। দ্বিতীয় ফলটি খাওয়ার মতো ইচ্ছে আমার নেই।

দুই দিন হয়ে গেল কেবল পাহাড় আর মরুভূমি অতিক্রম করে চলেছি। কোথাও কোন সবুজ চোখে পড়েনি। রাতে বালিতেই ঢলে ঘুমিয়েছি। এখানে রাতেও আলো থাকে। আশেপাশে কোথাও বাতি চোখে পড়ে না। কিন্তু বাতির আলোর মতো প্রচ্ছন্ন আলোকরশ্মি ছড়িয়ে থাকে আকাশময়। আকাশের কোথাও যে চাঁদ কিংবা তারা রয়েছে তাও নয়। প্রশ্নটি থেকেই গেল, কোথা থেকে এত আলো! কেবল বিশালকায় পাখিগুলো উড়ে যাওয়ার সময় বালির ঘূর্ণি তৈরি হয়। তবে বালিগুলো কেমন যেনো ভারি। চোখের পলকেই বসে যায়। এখানে ক্রমান্বয়ে আমার দেখা হয়ে যাচ্ছে ওই সেই প্রাণীদের সাথে, যাদের আকৃতি মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি। তাদের পোশাক অ ভুত সুন্দর। কেবল লজ্জা ঢাকার স্থানে পোশাকের আদলে বসিয়ে দেয়া হয় পাথরের পাতলা আস্তর। আমি মনে মনে তাদের নাম দিই 'নামানুষ'। উভয়লিঙ্গের নামানুষরা পাথরের পোশাক পড়ে। আমি কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করি কীভাবে তারা পোশাক তৈরি করেছে। বিভিন্ন আকৃতির শিলাপাথর কেটে পাতলা আবরণ নিয়ে তা লতার মতো সুতোতে গেঁথেছে। কারুকাজও আছে। পাথরের উপরে খোদায় করা সেই পাখিগুলোর ছবি, যারা তাদের জন্য খাবার ফেলে যায়। আমি

তাদের পাশে ঘেষতে চাই। হাবভাবে মনে হয় তারা আমাকে চায় না। কিন্তু আমার জানার দরকার কোথাই এসেছি। সেই ছোট ফলগুলো খেয়ে সময় কাটাচ্ছি। নামানুষদের পাশে যেতে চাই কিন্তু পারি না। মেয়ে নামানুষগুলো আড়ালেই থাকে বেশি। তাদের শারীরিক গড়ন এত মসৃন, যেন কেউ হাতে মূর্তি বানিয়েছে। এত ধূলোবালিতেও তাদের শরীরের কোথাও মলিনতার ছাপ নেই। প্রায় পাঁচদিন হাঁটার পর দেখা মিলল বিশাল একটি নদীর। এমন নদী আগে কখনো দেখনি। কেবল পানি আর পানি। অপরপ্রান্তে মরীচিকার মতো পাড় দেখা গেলেও কখনো কখনো মনে হয় নদীটির কোন পাড় নেই। নদীর জল এতো স্বচ্ছ যে, তলদেশের জগৎ ছবির মত ভেসে আছে। সেখানেও যে মাছেরা আনাগোনা করছে, তাদের আগে কখনো দেখিনি। এই নদীর পাড়ে পাথরের খোয়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ছোট ছোট ঘরের মতো কিছু একটা। তাতে থাকে নামানুষেরা। একটা নারী নামানুষ ডুব দিয়ে মাছ ধরে এসে ওঠে আমার সম্মুখে। আমাকে দেখে ভেঙছি কেটে আবার ডুব দিয়ে চলে যায় অন্যপ্রান্তে। সেখানে দাঁড়ানো একটি পুরুষ নামানুষ তাকে টেনে তোলে। দু'জনই আমার দিকে এক পলক চেয়ে কি যেনো বলে। আমি এগিয়ে যেতে চাইলে তারা একটি ঘরে ঢুকে পড়ে।

যত সময় যায় আমি অসহায়বোধ করি। কোথায় এলাম তাও জানতে পারছি না। জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হয়নি। যেই মেয়ে নামানুষটিকে নদীতে দেখেছিলাম তাকে আবার দেখতে ইচ্ছে করছে। তার সেই ভয়ংকর দৃষ্টিতেও একটি মোহ ছিলো। বাদামি ভ্রু কুঁচকানো চোখে যেনো আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে গেলো। মনুষ্য নারীদের মতো সাজগোছ না থাকলেও শরীরে একটি ঢেউ ছিল। ওই তরঙ্গায়িত সময়টি আমাকে খুব টানছে। পরের দিন আবার যথারীতি নদীর পাড়ে গেলাম। কিন্তু নদীটিকে আর আগের মতো মোহনীয় মনে হয়নি। জলগুলোও কিছুটা ঘোলাটে। নামানুষ মেয়েটি যথারীতি আগের মতো জলে নেমেছে। কিন্তু ঘোলাটে জলে শরীরের অর্ধেক ডুবে গেছে। কিছুই দেখা যায় না। সেই নামানুষ ছেলেটিও নেমেছে জলে। খুব মন খারাপ হলো। মেয়েটিকে একা পেতে চেয়েছিলাম। এক সময় টের পেলাম আমি এগিয়ে যাচ্ছি মেয়েটির দিকে। আর মেয়েটি এগিয়ে যাচ্ছে ছেলে নামানুষের দিকে। আমি কাছাকাছি হতেই ওরা উঠে ভোঁ দৌড়। প্রবেশ করে একটি পাথরবাড়িতে।

সেই রাতে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। আমি পাথরবাড়িগুলোর পাশে বালিতে শুয়ে পড়ি। বাতাসের সাথে বৃষ্টির মতো বালি ওড়ে। আমি চোখ বন্ধ করে বালিতে নাক গুঁজে পড়ে থাকি। এরপর ঝড় কখন থামে তা আমার জানা নেই। যখন নিজেকে

আবিস্কার করি তখন আমি একটি ঘরে। চার দেয়ালে খোদাই করা আদিম চিত্রকর্ম। কোনো জানালা নেই, কিন্তু পাথরের আবরণ ভেদ করে ঘরময় আলো খেলা করে। সব আসবাবপত্র পাথরে তৈরি। প্রচণ্ড খিদেয় কাতরাচ্ছি। দেখি পাশে একটি পাথরবাটিতে হরেক রকমের ফল সাজানো। সাহস করে একটি পুরে দিলাম মুখে। পুরো শরীর চাঙ্গা হয়ে গেলো। কে যোনো একটানে আমাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো। ফলটি এত উপাদেয় এবং খিদে নিবারক। এদিকে সেদিন তাকিয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো দরজা দেখি না। কতক্ষণ পরে একটি পুরুষ নামানুষ একটি পাথর ঠেলে প্রবেশ করে ঘরে। আমাকে হাতে ঈশারা করে জিজ্ঞস করে ফল খেয়েছি কিনা। আমিও ঈশারায় বলি খেয়েছি; এবং বোঝানোর চেষ্টা করি ফলগুলো অনেক উপাদেয়। এরপর সে আমাকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলে। আমি হাত নেড়ে বোঝাই যে আমি ঘরহীন মানুষ কোথায় যাবো। সে বুঝতে রাজি নয়। কেবলই বলছে বের হয়ে যেতে। মনে হলো আরেকটু হলে রেগে যাবে। আমি বের হয়ে যাই। এই সময় দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি;যাকে জলে দেখেছি। তার সুন্দরের বর্ণনা দিতে গেলে আলাওলের পদ্মাবতীর কথা মনে পড়ে। তবে একে পুরাপুরি মানুষ মনে হয় না। তবে মানুষের সব অঙ্গ ধারণ করেছে। আমি তাকে দেখে ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকি। সে আমাকে এক পলক দেখে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। সামনে তাকিয়ে দেখি ভরাট হয়ে গেছে নদী। অনেক দূরে চিকচিক করছে জল। প্রায় আধঘণ্টা হেঁটে দেখা পেলাম নদীর। রাতের ধুলি ঝড়ে নদী ভরাট হয়ে প্রসারিত হয়েছে অন্যদিকে। যত সময় যাচ্ছে আমি হিসেব মিলাতে পারছি না। নানান ভাবনা মাথায় নিয়ে নদী পাড়ে বসে পড়ি একটি বিশালদেহী পাথরে। রাতের ঝড়ে ধুলি সরিয়ে মাথা উঁচু করেছে পাথরটি। দুধসাদা পাথরটিকে হঠাৎ দেখলে বরফ বলে ভ্রম হতে পারে। এদিক সেদিন ছড়ানো খোদাই করা নানান মাছের ছবি। পাশে একটি নামানুষের ছবি। সম্ভবত তারই আঁকা মাছের ছবিরা। সারা রাত ধুলিঝড় হলেও নদীর পানি পাহাড়ি পানির মত সবুজ এবং স্বচ্ছ। মাছেদের যাতায়াত পাথরে বসেই দেখছি। মাঝে মাঝে জলে নামছে, স্নান শেষে ফিরে যাচ্ছে নামানুষেরা। কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। নদীর পাড় ধরে হাঁটতে থাকি। যতদূর যাই কেবলই ধূধু মরুভূমি। কোথাও কোন বসত নেই। মাঝে মাঝে কিছু পাথরের দেখা মিলে। বৃহদাকার পাখিরা মাঝে মাঝে উড়ে যায়। ডানার শব্দে ধুলি উড়িয়ে তটস্থ করে তোলে পরিবেশ।   হঠাৎ পথে দেখা মিলে একটি সাদা ঘোড়া। মুক্ত,শরীরের কোথাও কোন রশি কিংবা বেল্ট নেই। গ্রীবা বাড়িয়ে সমুদ্র থেকে পান করছে জল। জলের মত স্বচ্ছ তার চোখ। পায়ের খুড়গুলো মার্বেল পাথরের মতো গর্ভাকৃতির।

পানি পান শেষে উঠে দাঁড়ায় একটি পাথরবাড়ির পাশে। কিছুক্ষণ পর সেই মেয়েটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়। পলকেই দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে ঘোড়া আর মেয়েটি। এবার চিন্তিত হলাম। যেখানেই যাই সেখানে মেয়েটি কেনো? যেদিকে ওরা চলে গেছে সিদিকে হাঁটতে থাকি জলের কিনার ধরে। আলাদা কোন পথের চিহ্ন নেই। পুরো প্রান্তর যেনো পথ, কিংবা মরুভূমি। নদী আর মরুভূমির এমন সহাবস্থান এর আগে চোখে পড়েনি। ধূলোরাও পাথরের মতো ভারী। ঝড়ো হাওয়ার সাথে কিছুটা উড়ে গিয়ে আবার মিশে যায় সমতলে। ফলে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়। কোথাও ঘোড়া কিংবা মেয়েটিকে দেখা যায় না। আরো মিনিট দশেক হাঁটার পর বিজলীর মতো সামনে এসে দাঁড়ায় মেয়েটি। রাগি চোখ। চোয়ালে মেঘের প্রলেপ। এলানো চুলগুলো ভারী লোমের মতো বিস্তৃত। হাতের আঙুলগুলো কচি সবুজপাতার মতো মোলায়েম। হাঁটু থেকে পায়ের তালু বাদামি আর কালো লোমে ঢাকা। পায়ের আঙুল দেখা যায় না। আমাকে ঈশারায় কি যেনো বলে। বিদ্যুৎ বেগে ঘোড়াটি এসে দাঁড়ায় তার পাশে। ঘোড়সওয়া হওয়ার আগে আমাকে আবারো ঈশারা দিয়ে যায়। মনে হলো বলল, আমি যেন চলে যাই এই জায়গা থেকে।

প্রায় তিন দিন পর আবার সমুদ্রপাড়ে দেখা মেয়েটির সাথে। সাথে সেই ছেলেটিও রয়েছে। এবার দু'জনে আমাকে ঈশারায় ডেকে নিয়ে গেল। পিছন পিছন দশ মিনিট হাঁটার পর অনেকগুলো পাথরবাড়ি দেখালো ঈশারায়। বললো রো কেউ আমাকে চায় না এই রাজ্যে। আমির ঈশারায় বলি আমার যাওয়ার জায়গা নেই। আমি পথঘাট জানি না। সম্ভবত ঈশারায় বললো, আমি যেভাবে এসেছি, সেভাবে যেন চলে যাই। ওদের বললাম আমি কীভাবে এসেছি তা জানি না। এই কথা শুনে ওরা রাগি চেহারা প্রদর্শন করে ঢুকে পড়ে একটি বাড়িতে। আমি যথারীতি বালিপথ পাড়ি দিয়ে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে থামি। বুঝতে চেষ্টা করি কি করা যায়। ওরা আমাকে কেন চলে যেতে বলছে? আমি এখানে এসেছি পর্যন্ত ওদের কোনো ক্ষতি করিনি। তারপরও ওরা আমাকে চায় না। ওরা মানব বিদ্বেষী?না তা হলে, প্রতিদিন আমার খাবারের যোগান দেয় কেন? তাহলে আপত্তি কোথায়?

পরদিন মেয়েটিকে পেয়ে যাই একা। একটি পাথরখড়ি দিয়ে বিশালকায় পাথরে ছকি আঁকছে। সেই ছেলেটির ছবি। ঈশারায় আমার ছবি আঁকতে বলি। আমাকে বসতে ঈশারা দিয়ে আঁকতে শুরু করে। পাঁচ মিনিটেই আমার একটি ছবি আঁাকা হয়ে গেলো। উৎফুল্ল আমি আবেগ প্রকাশে কাছাকাছি যেতে চাইলে দ্রুতবেগে দূরে সরে যায় মেয়েটি। আর না এগিয়ে পিছনে হাঁটতে থাকি। নিজেকে অচ্যুত মনে হচ্ছে।

আবার ভাবি আমি কি করে এখানে এলাম? যাবইবা কীভাবে? সবই এলোমেলো ঠেকে। প্রতিদিনের মতো রাতে খোলা জায়গায় শুয়ে পড়ি। আকাশটাকে ঘরের ছাদ মনে হয়। ছাদের কোথাও কোথাও সাদা গোলাপের মতো আলো ফুটে আছে। বিস্তৃত হয়ে আছে বেলি ও কাঠালি চাপার মত তারা সদৃশ নক্ষত্ররা। কখনো কখনো বিশালাকৃতির পাখিগুলো উড়ে যায় প্রান্তের দিকে। যদিও প্রান্ত বলছি, আসলে প্রান্ত যে কোথায় তার হদিস পেলাম না। কেবল অনুমানে মনে হয় কিছুদূর গেলেই সীমান্ত। কিন্তু এই ক'দিনে সেরকম কিছুই আবিষ্কার করতে পারিনি। শেষ রাতে ডানার শব্দে ঘুম ভাঙে। তখনো আলো ফোটেনি। দেখি আমি বিশাল এক পাহাড়ের পাদদেশে শুয়ে আছি। সেই পাহাড়ে অসংখ্য নামানুষের ভিড়। চিৎকার-চেঁচামেচি। আমি বুঝতে পারছি না এখানে কি করে এলাম। নড়ে চড়ে উঠে বসি। দেখি আমার অবস্থান ধুলিতে নয়। একটি বিশালাকৃতির পাথরের চূড়ায়। বুঝতে বাকি থাকে, আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। অবাক কাণ্ড ঘুমের ঘোরে একটুও টের পাইনি। ভিড় থেকে বেরিয়ে একটি পাথরের সেতু বেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ায় সেই মেয়েটি। ভোরের আলোয় তার চেহারায় কেমন যেন পবিত্র মায়া খেলা করে। চোখে চোখ পড়তেই আমি ঠোঁটের কোনায় একটু হাসি টেনে রাখি। তার হাসি না দেখলেও যেন করুণার ছায়া দেখলাম। আমার আরো কাছে এসে ঈশারায় বললো, সবাই আমাকে এই রাজ্য থেকে আজ বের করে দিবে। সেও চায় আমি যেন এই রাজ্য থেকে চলে যাই। এই সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় সেই ছেলেটি। তাঁর চোখেমুখে রাগের চিহ্ন। আমাকে ঈশারায় বললো যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে। আমি এতদিনে তাদের ঈশারার ভাষা বুঝতে শিখে গেছি। যদি এই রাজ্যে থেকেও যাই তাহলে ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। কিন্তু তা হয়তো আর হবে না। ওরা আমাকে এই রাজ্য থেকে বের করে দিবে। আমি বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলে কোন রাজ্যে পাঠাবে আমাকে। পাশে কোন রাজ্য? হঠাৎ বয়স্কদের একটি দল আমাদের দিকে ধেয়ে আসে। ঘিরে ধরে। একজন ঈশারায় বলে, তারা মানুষদের বিশ্বাস করে না। তাই তাদের রাজ্যে মানুষ থাকার নিয়ম নেই। আমি এতদিন থেকে তাদের কোনো ক্ষতি না করলেও ভবিষ্যতে করতে পারি। এমন ইঙ্গিত দিল অন্য একজন। আমার বুঝতে বাকি থাকে না, মানুষের প্রতি তাদের রয়েছে জমানো অবিশ্বাস। আমি বহুভাবে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি, আমার বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে চেয়েছি। কিছুতেই তারা আমাকে আর এই রাজ্যে থাকতে দেয়া হবে না। আমি অসহায়ের মতো মেয়েটির চোখের দিকে তাকালাম। তার চোখে মুখে বিষণ্নতার ছাপ বিস্তৃত হয়ে আছে। কেবল আমার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিছুই বলে না। ধীরে

ধীরে নামানুষের ভিড় কমতে থাকে। জনাকয় দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি ধুলো উড়িয়ে একটি ঘোড়া এসে দাঁড়ায়। তার পিঠের সাথে বাঁধা পাথরের আসন। দুইজন বসতে পারে তাতে। একজন আমাকে ঈশারায় তাতে উঠে বসতে বললো। আমার সাথে উঠে বসলো আরো একজন নামানুষ। মেয়েটি কোথা থেকে ছোট ছোট অসংখ্য ফল মুঠোভরে আমার হাতে তুলে দিল। চোখাচোখি হতে মনে হলো মেয়েটি কাঁদতে চায়। আড়াল থেকে বললো, কিছুই করার নেই। মানুষের সাথে তাদের থাকা সম্ভব নয়। কারণ মানুষ অবিশ্বাসী। আমাকে ভালো লাগলেও সবার কথার বাইরে সে যেতে পারে না। আমি যেন ভালো থাকি সেই আশা-ই যেন প্রকাশ করলো ঘোড়া যাত্রা শুরু করার আগে। আমি দীর্ঘপথ পাড়ি দিচ্ছি। আর অবাক হচ্ছি মাঝে মাঝে মেয়েটির আমি দেখা পাচ্ছি। আরেকটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে মাঝে মাঝে আমার পাশ আসছে। এভাবে চলতে চলতে রাত নেমে আসে। ছায়ার মতো মাঝে মাঝে মেয়েটিকে দেখি। ঘোড়াটি আমাদের নিয়ে চলে। এভাবে চলতে চলতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি বলতে পারি না।

একদিন নাসার ওয়েবসাইটে দেয়া হলো একটি বিবৃতি। তাতে বলা হয়েছে, নব্য আবিষ্কৃত পৃথিবী সদৃশ গ্রহ 'কেপলার-৪৫২ বি' তে যে মানুষটিকে পরীক্ষামূলকভাবে পাঠানো হয়েছিল, সে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। তবে তাকে জীবিত পাওয়া না গেলেও তার মগজের কোষে যে মেমোরি স্থাপন করা হয়েছিল তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ফলে কী হয়েছিল সেখানে, বা কীভাবে সেখানে সে বেঁচে ছিল, তার খবর পাওয়া যাবে। যা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

একদিন ইউটিউবে এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখি, একটি লিংকে লেখা 'এ হিস্ট্রি অব কেপলার-৪৫২'। ক্লিক করতেই বেজে ওঠে একটি মানুষের কণ্ঠ। সেখান থেকে বাংলায় অনুবাদ করলে যা হয়, তা-ই আমি উপরে বিবৃত করেছি।

আব্দুল জলিলের জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত জটিলতা

সাগর রহমান

সংবিধিবদ্ধ কৈফিয়তনামা: এটি 'মগ' নামক 'মুল্লুক'-এর একটি লেশমাত্র-সত্যি ঘটনার উপরে নির্মিত সম্পূর্ণ আষাঢ়ে গল্প। অসতর্ক-পাঠে পাঠকের বিভ্রান্তি জন্মাতে পারে বিধায় এ কথা বলা দরকার হচ্ছে যে, সে দেশেও আমাদের মতোই মানুষজন বাস করে, তাদেরও সরকার, ভোট, রাজনীতি, সরকারি অফিস– এসব আছে। এ মিলটুকু ছাড়া গল্পের আর কোন কিছুর সাথে যদি অন্য কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তা শতভাগ কাকতালীয় বলে ধরতে হবে।

এক.

আব্দুল জলিল যেদিন জানতে পেলেন যে তিনি আসলে বেঁচে নাই, মৃত; তখনও মারা যেতে তার সাত বছর এগারো দিন বাকি ছিল।

ঐদিন ছিল বৈহাটি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন। ভোটের ফলাফল কী হবে, তা জানা থাকা সত্ত্বেও দলে দলে মানুষ ভোট দেবার জন্য লাইন ধরেছিল। প্রখর রোদের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আব্দুল জলিল দর দর করে ঘামছিলেন। কাঁধে ফেলে রাখা গামছাটি দিয়ে মুখটা ভালো করে ঘষে নিয়ে তিনি পোলিং অফিসারের দিকে চেয়ে সরল গলায় বললেন, জ্বি না, স্যার। আমি তো জিন্দা। এই যে– তাকায়া দেখেন।

অফিসার নিজেও গরমে প্রচণ্ড ঘামছিলেন। এতগুলো লোকের জন্য একটা মাত্র ফিলিপস টেবিল ফ্যান, হাওয়া যত না হয়, তার চেয়ে শব্দ হয় কয়েকগুণ বেশি। ফ্যানটা একশ আশি ডিগ্রি ঘোরা শেষ করে যখন তার দিকে আসে, তখন কথা শুনতে এবং কাউকে কোন কথা শোনাতে তাকে অনেকটা চেঁচাতে হয়। আব্দুল জলিলের কথার উত্তর দেবার সময়টিতে ফ্যানটি তার অভিমুখে ঘুরে গিয়েছিল বলে তিনি বেশ খানিকটা উচ্চৈঃস্বরে বললেন, সেটা আপনি বললে তো হবে না, কাগজপত্রে বলতে হবে।

আব্দুল জলিল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জীবিত না মৃত, সেটা আমি নিজ মুখে বললে হবে না?

জ্বি না, হবে না। সরকারি কাগজে বলছে আপনি মৃত, সুতরাং আপনি মৃত।

কিন্তু স্যার, আমি তো জীবিত।

অফিসারের গলায় এবারে খানিকটা রুষ্টতা দেখা যায়। তিনি ঘাড়ের কাছটাতে একটা রুমাল ঘষতে ঘষতে জবাব দিলেন, চাচা মিয়া, আপনার সাথে বাহাস করার তো সময় আমার নেই। পিছনে তাকায়া দেখছেন কত বড় লাইন? সংবিধানে মৃত মানুষের ভোটাধিকার দেয় নাই– এ ব্যাপারে আমার করার কী আছে, বলেন–

আব্দুল জলিল বললেন, কিন্তু স্যার–

সেই তো আবারও পেঁচাচ্ছেন কথাটা। প্রথমত আপনার নাম নেই ভোটার লিস্টে। এই যে আপনার স্ত্রীর নাম দেখে বের করলাম আপনি সরকারি খাতায় মৃত– সেটা কিন্তুক চাচামিয়া একস্ট্রা করলাম। এটা করা আমার দায়িত্ব না। আচ্ছা, এই যে দেখেন–

অফিসার মানুষটাকে বোঝানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে তার সামনে রাখা খাতাটা দেখাতে রত হন। কিন্তু পরক্ষণে থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি পড়তে পারেন তো?

জ্বি, পারি। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ছিলাম।

সেভেন পর্যন্ত পড়লেই চলবে। এই যে দেখেন, এইটা আপনার স্ত্রীর নাম?

আব্দুল জলিল অফিসারের বাড়িয়ে ধরা খাতাটা দেখেন। হুম, তার স্ত্রীর নামই। টাইপ করা কাগজে স্পষ্ট করে লেখা: মোসাম্মদ তাহেরা খাতুন

অফিসার জিজ্ঞেস করেন, উনার স্থায়ী ঠিকানা বলেন।

উনার না আমার স্থায়ী ঠিকানা বলব?

আপনারটা বলে কী লাভ? বললাম না, লিস্টে আপনার নামই নাই। আপনার স্ত্রীর ঠিকানা বলেন–

কিন্তু আমার স্ত্রীর ঠিকানা আর আমার ঠিকানা তো একই জায়গায়।

অফিসার যথেষ্ট বিরক্ত হন, এ তো মহা জ্বালায় পড়লাম। আচ্ছা, আপনাদের দু'জনের ঠিকানাই বলেন–

জ্বি, আমাদের বাড়ির নাম– নয়া বাড়ি। পোস্ট– মাহতাবপুর। গ্রাম– মাহতাবপুর। উপজেলা– বৈহাটি। জেলা–

অফিসার হাত তোলেন, তাহলে ঠিকই আছেন। তথ্যগত কোনো ভুল নেই। এই যে আপনার স্ত্রীর স্বামীর নামের জায়গায় স্পষ্ট লেখা: মৃত আব্দুল জলিল। কী কারণে আপনি সরকারি খাতায় মৃত– তা আমি জানি না। এবার আল্লার ওয়াস্তে জায়গা ছাড়েন। জীবিত লোকদেরকে ভোট দিতে দেন।

অফিসার তাকে তাড়িয়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত নাড়েন। আব্দুল জলিল মরিয়া হয়ে উঠেন, স্যার, খোদার কসম কথাটা বিশ্বাস করেন– আমি মরি নাই। মরলে ভোট দিতে আসলাম কীভাবে!

পোলিং অফিসারের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হয় এবার। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে কঠিন গলায় বললেন, চাচা মিয়া, আপনি মুরব্বি মানুষ দেখে এখনো বাতচিত চালিয়ে যাচ্ছি। না হলে এতক্ষণে পুলিশ ডাকতাম। কে জীবিত, আর কে মৃত– সেটা নির্ণয় করা আমার কাজ না। আমি তো ডাক্তার না। এই খাতায় আপনার নাম নাই। কেন নাই? সরকারি খাতা বলতেছে আপনি মৃত। অতএব, আপনার ভোট হবে না। মামলা ডিসমিস। আপনি উপজেলা অফিসে গিয়ে নির্বাচন কর্মকর্তার সাথে দেখা করবেন। ঐখান থেকে তারা যদি আপনাকে জিন্দা বানাতে পারে, তবে নেক্সট টাইম আসবেন, আরামসে ভোট দিয়া যাবেন। ভোট দিবার জন্য এত উতলা হবার কিছু নাই, কয়দিন পর পরই ভোটের আয়োজন হবে। জীবিত মানুষরাই ভোট দিতে পারে না, আর উনি মরার পর আসছেন ভোট দিতে!

বলা দরকার, শেষ বাক্যটা আব্দুল জলিলের কানে পৌঁছায় না, কেননা অফিসার সেটি মুখ খুলে উচ্চারণ করেননি, পুরু গোঁফের তলায় ঠোঁট বন্ধ করে মনে মনে কথাটির গড়গড়া করেছিলেন।

আব্দুল জলিল লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এক পাশে। ঘটনাটা তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। তিনি যে মনে মনে বর্তমান চেয়ারম্যানকে ভোট দিবেন না বলে ঠিক করেছিলেন, তা তো কারও জানার কথা না। তাহলে এ শত্রুতা কারা করল তার সাথে?

দুই.

বৈহাটির উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। তিনি ধৈর্য ধরে আব্দুল জলিলের সব কথা শুনলেন। তারপর মধুর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললেন, কী লজ্জার কথা বলেন দেখি। কী অন্যায্য কথা।

বলতে বলতে তিনি টেবিলের তলা থেকে পিকদানি বের করে মুখে জমা পানের পিক ফেললেন। অসাবধানে এক ফোঁটা থুতু তার দাড়িতে লেগে রইল। ভদ্রলোক সেটা টের পেলেন না। থুতু লাগা দাড়ি সমেত মুখটা আব্দুল জলিলের খানিকটা কাছে এনে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, মুরব্বি, আপনাকে একটা গোপন কথা বলি। বেশিরভাগ সরকারি কর্মকর্তা হলো ফাঁকিবাজ। দলাদলিতে এদের দিন যায়, কাজ করবে কখন? আমার ভাই বয়স হয়েছে, দুইবার ওমরাহ করেছি, আগামি বছর বড় হজ্জে যাব, ইনশাল্লাহ। সত্য কথা বলতে এখন আর ভয় পাই না। আমরা সরকারি কর্মকর্তারা হলাম আপনাদের সেবক। সেই সেবায় ব্যত্যয় ঘটা উচিত হয়নি।

আব্দুল জলিল কিছু বলেন না। তিনি দিনমজুর টাইপের মানুষ। সরকারি অফিসে আসার সুযোগ এবং দরকার– দুটোই তার হাতে গোণা কয়েকবার মাত্র হয়েছে সারাজীবনে। এই ভদ্রলোকের মধুর ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন একবার বলেন, সবাই তো স্যার ফাঁকিবাজ না। এই যে আপনার মতো মানুষও তো আছে অফিসে। কিন্তু কথাটা বলা হলো না। তার চোখ অকারণেই নির্বাচন কর্মকর্তার দাড়িতে লেগে থাকা থুতুর উপর চলে যাচ্ছে বারবার। লাল দাড়িতে লাল থুতু– দেখতে একেবারে মন্দ লাগছে না।

নির্বাচন কর্মকর্তা এবারে সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, আপনি কোন চিন্তা করবেন না মুরব্বি। সপ্তাহ খানেক লাগবে। কাগজপত্র আমি দেখতেছি। আপনাকে আবার জিন্দা বানানোর দায়িত্ব আমার। হা হা হা।

আব্দুল জলিলও হা হা করে হাসেন ভদ্রলোকের সাথে। এ অফিসে তিনি খুব কাচুমাচু হয়ে ঢুকেছিলেন। ভদ্রলোকের ব্যবহারে তার মনের দ্বিধা সব দূর হয়ে গেল। জীবিত হয়ে ওঠার আশ্বাসে তিনি ঝরঝরা মন নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

তিন.

সৌভাগ্যক্রমে, সরকারি নথিতে জীবিত কি মৃত– এ তথ্যের উপর ভিত্তি করে কৃষকের ফসল ফলনের কম-বেশ হয় না। আব্দুল জলিলের তাই পরবর্তী দেড় বছর ধান পাট আখ ডাল কলাই বুনে কাটিয়ে দিতে কোন অসুবিধা হয়নি। পঞ্চাশ বছর বয়সে একবার মরে, এবং আবার জীবিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে– সত্যি বলতে কি, তিনি আরো ফুরফুরা হয়েছিলেন। নানান জমায়েতে নিজের এই অভিজ্ঞতা তিনি বেশ রসিয়ে রসিয়ে বহুবার বলেছেন এবং প্রতিবারই শ্রোতাদের অকুণ্ঠ সাড়া পেয়েছেন। বলবার মতো একটা ঘটনা তো বটে।

"...দেখ দেখি কারবার! আমি হাত-পাও লইয়া তার সামনে দাঁড়ানি, আর আমার চোখের দিকে তাকাইয়া বেকুবে কয়, চাচামিয়া, আপনি তো বাঁইচা নাই...", আব্দুল জলিলের বলার ভঙ্গিতে এ পর্যন্ত শুনেই শ্রোতারা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যেতে শুরু করে।

দেড় বছর পর জানলেন, তিনি এখনও মৃতই আছেন! উপজেলার সেই নির্বাচন কর্মকর্তা– ওমরাহ ও আকবরী হজ্জ করা হাজী সাহেব – তাকে জীবন দান করেননি।

জানার উপলক্ষ্যও সেই ভোটদান। দিনটি ছিল ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন।

মোট তিনজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী। প্রত্যেকেই বেশ-কম চা-বিস্কুট-ঠান্ডা খাইয়েছে। তিনি এলাকার আর সব ভোটারদের সাথে সাথে নির্দ্বিধায় তিনজন প্রার্থীরই এসব নির্বাচনি উপঢৌকন উপভোগ করেছেন। ফ্রি চায়ের সাথে ফ্রি বিস্কুট ডুবিয়ে খেতে খেতে তার এ কথাও মনে হয়েছে যে, নির্বাচন না থাকলে তো আসলে আমরা সবাই সরকারি খাতায় মৃতই।

এবারের পোলিং অফিসার অত্যন্ত রুক্ষ, আব্দুল জলিলের নামধাম সাকিন জিজ্ঞেস করে নিয়ে, ভোটার লিস্টের খাতাটার কয়েক পাতা উল্টে-পাল্টে সোজাসুজি বললেন, চাচা মিয়া, জাল ভোট দিতে আসছেন?

আব্দুল জলিল থতমত খেয়ে যান, জ্বি না ভাতিজা। জাল ভোট কী কন? নিজের ভোট। আমি তো এখনো ভোট দিই নাই।

পোলিং অফিসারের গলা আরেকটু রুক্ষ হয়, এই নামে কেউ নাই খাতায়।

আব্দুল জলিলের ঠিক পিছনেই তার বড় ছেলে আব্দুল মোতালেব দাঁড়িয়েছিল। সে গলা বাড়িয়ে বলল, স্যার, উনি এর আগের বারও ভোট দিতে পারে নাই।

পোলিং অফিসার ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেন,এ্যই তুমি কে? আগ বাড়িয়ে কথা বল কেন?

আব্দুল মোতলেব উত্তর দেয়, আমি উনার বড় ছেলে।

পোলিং অফিসার অকারণেই চোখ পাকান, তোমার বাবা?

জ্বি।

পোলিং কর্মকর্তা এক মুহূর্ত কী যেন ভাবেন, তারপর হঠাৎ আব্দুল মোতালেবকে সামনে এগিয়ে আসার ইঙ্গিত দেন, তোমার নাম?

আমার নাম আব্দুল মোতালেব।

ঠিকানা?

আব্দুল মোতালেব ঠিকানা বললে তিনি দ্রুত হাতে ভোটার লিস্টের পাতা উল্টান। তারপর একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বলেন, তোমার বাবা তো মৃত। এই যে লেখাঃ মৃত আব্দুল জলিল। তুমি যাও, ভোট দিয়া আস। তোমার বাবার সাথে আমি কথা বলতেছি।

আব্দুল মোতালেব ব্যালট হাতে করে এগিয়ে যায়। তার দিকে ইঙ্গিতকরে আব্দুল জলিল খানিকটা হাত জোড় করে বলে ওঠেন, স্যার আপনিই বিবেচনা করেন, এই আমার ছেলে, আমি তার বাপ। আপনার সামনে সাক্ষাৎ দাঁড়ায়া আছি, আর খাতায় বলে মৃত!

পোলিং অফিসারের গলা হঠাৎ রুক্ষ হয়, আপনি কি কবর থেকে উইঠ্যা আসছেন?

জ্বি?

পুলিশের ডান্ডা না খাইতে চাইলে তাড়াতাড়ি বিদায় হন। দেখছেনই তো, খাতায় স্পষ্ট লেখা, আব্দুল জলিল মৃত। সাথে ছেলে নিয়ে আসলেই ভোট দিতে পারবেন– ভাবছেন, না? শুনেন, এই বয়সে এসব ধান্দা বাদ দিয়া আল্লা-বিল্লা করেন বাড়িত গিয়া। যত্তসব।

আব্দুল জলিল শেষ চেষ্টা করেন, এইগুলা কী বলেন? হাজী সাবে তো বলছিল কাগজপত্রে জিন্দা বানায়া দিবে। দেয় নাই?

পোলিং অফিসার চোখ পাকান, কোন হাজি সাব?

নাম তো বাবা জানা নাই। ঐ যে উপজেলার অফিসে চাকরি করেন, লাল দাড়ি, হজ্ব করছেন দুইবার না তিনবার –।

এবারে তিনি ধমক খান।

ভেতরে ভেতরে এত চাল চেলে আসছেন? কোন প্রার্থীর টাকা খাইছেন, বলেন? কত টাকা দিছে এইসব দুই নাম্বারি করার জন্য? আমি সব রিপোর্ট করবো। এক রিপোর্টে আপনি নিজেও জেলে যাবেন, হাজি সাহেবও যাবে, সাথে আসা ছেলেও যাবে। এবারের নির্বাচনে কোন বগি-জগি নাই।

আব্দুল জলিল লোকটার হাবেভাবে এবারে বেশ ভড়কে যান। সত্যি সত্যি হাত জোড় হয়ে আসে তার অজান্তেই। প্রার্থীদের পান-সিগারেট-চা এসব খাওয়া তো অপরাধ না বলেই তিনি জানেন। সবাই তো খায়।

আমি তো কারো টাকা-পয়সা খাই নাই। আল্লার কসম, একটা টাকাও নিই নাই কারো কাছ থেকে।

তা হইলে মৃত একজন লোককে জিন্দা দেখাইয়া ভোট দিবার ফন্দি করছেন কার সাথে? সেইটা আবার বলতে আসছেন আমাকে? ভালো চান তো যান, নইলে কিন্তু–

নইলে কী– সেটা আব্দুল জলিল ভালো বুঝতে পারেন না, তবে তা যে ভালো কিছু হবে না, তা বুঝতে পেরে ধীরে ধীরে তিনি ভোটের লাইন ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

আনমনে ভাঙা গালে, দাড়িতে, চুল কমে আসা মাথায় হাত বোলান কয়েকবার। যেন বেঁচে যে আছেন– সেটা নিজেকে মনে করিয়ে দিতে চান আব্দুল জলিল।

চার.

বাড়ি ফিরে যদিও সেদিন আব্দুল জলিল তার স্ত্রীর সাথে নিজের চল্লিশা খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে রসিকতা করেছিলেন এবং আশেপাশের লোকজনের সাথে সরকারি হিসেবে মৃত থাকা সংক্রান্ত পুরানো রঙ্গ-রসিকতাগুলো আবারো পুনঃজীবিত করেছিলেন, ভেতরে ভেতরে কিন্তু জিন্দা হওয়ার জন্য তার মধ্যে একটা জিদ তৈরি হয়।

এর দুই দিন পরেই আবারো তিনি উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অফিসে ধর্না দেন। গিয়ে দেখেন, হাজি সাহেব ওখানে আর নেই। নতুন লোক এসেছে। আব্দুল জলিল বহু কষ্টে ভদ্রলোককে পুরো বিষয়টা বোঝান। ভদ্রলোক হাজি সাহেবের মতো অমায়িক না হলেও তাকে সমপরিমাণ আশ্বাস দিয়ে বিদায় করেন।

আগের বার যেহেতু কাজ হয়নি, এবারের আশ্বাসে খুব আশ্বস্ত না হয়ে মাস খানেক পরে তিনি আবারো সেই অফিসে যান কাজ কতটুকু এগুলো – তা জানতে। তার আগমনের হেতু জানার পর কর্মকর্তা আচমকা রেগে যান। তার ভাষায়, আপনার কি ধারণা এখানে বসে বসে আমরা ঘাস কাটি?

আব্দুল জলিল কুঁকড়ে যান। কর্মকর্তার রাগ থামে না। জিজ্ঞেস করেন, আপনার কি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়?

প্রশ্নটার ধরন বুঝতে পারেন না আব্দুল জলিল। হঠাৎ 'নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস'-এর এলো কোথা থেকে? গ্যাস্ট্রিকের কারণে তার বুকে মাঝে মাঝে ব্যথা হয় বটে, কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস তো ঠিকই আছে। তিনি কোনো রকমে 'না' বোধক মাথা নাড়েন। কর্মকর্তার সেই রাগী গলাতেই তার পুরানো কথার সূত্র ধরেন, তাহলে সরকারি

খাতায় জিন্দা হবার জন্য এত উতলা হলেন ক্যান? আমরা তো কাজ করছি– নাকি? এসব খাতাপত্রের বিষয়, রাজধানী থেকে ঠিক হয়ে আসতে হয়ে, কিছুদিন ধৈর্য ধরবেন না?

কতদিন ধৈর্য ধরতে হবে, সে কথা জিজ্ঞেস করার সাহস হয় না আব্দুল জলিলের। তবে কর্মকর্তা দয়াপরবেশ হয়ে সেটি জানান তাকে, আপনার এখানে আর ভিড় জমানোর জন্য আসার দরকার নেই। ধরে নেন– কাজ হয়ে গেছে। আগামীবার ভোট দিতে পারলেই তো হলো আপনার, নাকি?

পাঁচ.
এর পরেরবারও ভোট দিতে পারেননি আব্দুল জলিল।

এবারের ভোটের মজমা ছিল আরো গুরুতর, রীতিমত সরকার পরিবর্তনের জাতীয় নির্বাচন এবং সরকারি খাতাপত্রের বিষয়ে একদম হাতে গোনা দুই বছর ধৈর্য ধারণ করার পরও তিনি ভোটের দিন কেন্দ্রের জনৈক পোলিং অফিসারের কাছে যাওয়ার পর জানতে পারেন, লিস্টে তার নাম এবং ঠিকানা অনুযায়ী কেউ নাই। সুতরাং, ভোট দেবার প্রশ্নই আসতে পারে না।

আব্দুল জলিল এবারে আর কথা বাড়ান না। আগের দুইবারের মতো এবারে আর নিজেকে জীবিত প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা না করে তিনি বেরিয়ে আসেন ভোটকেন্দ্র ছেড়ে।

এতবড় একটা নির্বাচন, কত ন্যাদা ন্যাদা বাচ্চা-ছেলে-পিলে আঙুলে ভোটের কালি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তিনি–

নিজের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকিয়ে হুঁশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে আব্দুল জলিলের। আল্লাহপাক আঙুল দিয়েছেনই তো ভোটের কালি মাখানোর জন্য। এখন সেগুলোর গোড়ায় ভোটের কালি না থাকাতে আঙুলগুলো কেমন ন্যাংটা-ন্যাংটা লাগতে থাকে তার কাছে।

ছয়.
বৈহাটি উপজেলার অধীন হাশিমপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত মাহতাবপুর গাঁ– এতদ অঞ্চলে সরকারের খাপ্ঞাচিখানা হতে বেতন আসে, এমন নানান পদের লোকজনের মধ্যে অচিরেই একটা নিদারুণ মিল আবিষ্কার করতে পেরে আব্দুল জলিলের যারপরনাই পুলক অনুভব করার কথা। সেটি তিনি অনুভব করেছিলেন কিনা, তার

হদিস পাওয়া যায় না অবশ্য। তবে মিলটির কথা তিনি নানান জমায়েতে নিজ মুখে বলেছিলেন বলে সেটা নিশ্চিত হয়ে বলা যায়। তার জবানীতে মিলটি হলো: তারা বেবাকতে হাসে। আমার সমস্যাটা শুনিয়া তারা দাঁত দেখাইয়া হাসে।

এলাকার চৌকিদার, ওয়ার্ডের মেম্বার, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, মেয়র, উপজেলা নির্বাচন কমিশন অফিসের দারোয়ান, অফিসের নানান পদের অফিসার– মোটকথা হেন সম্ভাব্য লোক নেই, যাকে গিয়ে তার মৃত পরিচয় ঘুচিয়ে জীবিত পরিচয়ে লিপিবদ্ধ হতে আবেদন করেননি আব্দুল জলিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'দাঁত দেখাইয়া হাসা' ভিন্ন আর একটি মিলও অবশ্য ছিল। তারা প্রত্যেকেই তাকে 'আরে চাচামিয়া, এটা কোনো সমস্যা হইল?' বলে সমস্যার সমাধানের আশ্বাসের সাথে সাথে 'কার কাছে গেলে এ সমস্যার একটা সমাধান হবে' সেরকম একটা সম্ভাব্য নামও প্রস্তাব করেছিলেন।

আব্দুল জলিল চিনে জোঁক টাইপের মানুষ না, তবু 'মৃত' হতে 'জিন্দা' হবার এই অসম্ভব লড়াইয়ে তিনি লেগেছিলেন। জমিন নিড়ানো দেয়া, হাল চাষ করা, বীজ বোনা, চারা লাগানোসহ ফসল তোলার কর্মযজ্ঞের নানান ফাঁক-ফোঁকরে সময়-সুযোগ মতো তিনি সেই সম্ভাব্য 'মুশকিল-আসান-করনেওয়ালা' লোকটির সাথে দেখা করেছিলেন। তবে বারবার তিনি গিয়ে ঠেকেছিলেন 'উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা'র টেবিলে। এর মধ্যে অন্তত তিনজন নতুন কর্মকর্তা ঐ উদ্দিষ্ট পদটিতে বদলি হয়ে এসেছেন এবং প্রত্যেকেই যথারীতি তাকে যথাযথ ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দিয়ে গেছেন।

সর্বশেষ যার আশ্বাসে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছিলেন, তার নাম ছিল হায়দার আলী। অল্প বয়সি অফিসার। ভদ্রলোক আব্দুল জলিলকে এক কাপ রঙ চা-ও খাইয়েছিলেন এবং তাকে সামনে বসিয়ে রেখেই একটা বড় বাদামি রঙের সরকারি খামে বেশকিছু কাগজপত্র ঢুকিয়ে বলেছিলেন, এই যে দেখেন চাচামিয়া। আপনার সামনেই কাগজপত্র রাজধানীতে পাঠালাম। আর চিন্তা না করেন। এবারে আর সংশোধন না হয়ে উপায় নেই।

ততদিনে আব্দুল জলিল এসব কথায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। তাই বেশখানিকটা আমতা আমতা করে হলেও মনের কথাটি বলে ফেলেন, স্যার, এর আগেও তো এমন চিঠি পাঠাইছিল। কিন্তু–

তার কথা শেষ হবার আগেই হায়দার আলী অমায়িক হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আগে কে কী করেছে– তাতো চাচামিয়া আমার জানা নাই। তবে এই দরখাস্তখানা

স্পেশাল ডেলিভারীতে জাতীয় নির্বাচন অফিসে পাঠালাম। এবার খালি কয়টা দিন ধৈর্য ধরেন, আর দেখেন কী হয়−

সাত.

স্পেশাল ডেলেভারির সেই দরখাস্তখানা কত পথ পাড়ি দিয়ে, কত হাত ঘুরে, জাতীয় নির্বাচন অফিসের কোন দপ্তরে কোন টেবিলে পৌঁছেছিল এবং তার ফলে দেখার মতো কী ঘটেছিল, উপরন্তু সেটা নিয়ে শেষ দৃশ্যে হাততালি দেবার মতো একটা টানটান উত্তেজনাকর কিছু ঘটেছিল কিনা− এতসব কৌতূহলের উত্তরে দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, না। কিচ্ছু ঘটেনি।

এত দেন-দরবার করার পরও আব্দুল জলিল সরকারি খাতায় বেঁচে উঠতে পারেননি এবং বেঁচে যে উঠেননি, সে কথাটি এবারও জানতে পারেন একটা সুবিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে।

এবারের লাইনটি অবশ্য ভোটের নয়, স্মার্ট-কার্ড তোলার লাইন।

আব্দুল জলিলের বয়স এখন ছাপান্ন বছর। একটু বিবেচনা খরচ করলে তিনি হয়তো নিঃসন্দেহ হতেন যে, মগ মুল্লুকের যেসব সুবিধা প্রদান করার আশ্বাসে নাগরিকদেরকে স্মার্ট-কার্ড বিতরণ করা হচ্ছিল, তার প্রায় কোনোটিই, সম্ভবত, তার ইহজীবনে কোনো কাজে লাগবে না। তবে সবাই নিচ্ছে, তিনি কেন বঞ্চিত হবেন− এ চিন্তায় ভোর সাতটা থেকে উপজেলার জালালুদ্দিন সরকারি বিদ্যালয়ে গিয়ে তিনি এলাকার আর সবার সাথে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। বেলা এগারোটার দিকে তিনি যখন বিতরণকারী কর্মকর্তার সামনে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন জানতে পেলেন যে, তার নামে কোনো স্মার্ট কার্ড নেই এবং বিতরণকারী কর্মকর্তা সদয় হয়ে এবারো তার ছেলের নাম দিয়ে বের করে তাকে জানান, সরকারের খাতায় তিনি 'মৃত' হিসেবে লিপিবদ্ধ আছেন। সুতরাং−

আব্দুল জলিল এবার খুব আশা করে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে মনের মধ্যে সারাক্ষণ ডেকে যাওয়া 'কু'-টির এমন জিত হবে শেষপর্যন্ত, তা একবারের জন্যও মনের কোণে ঠাঁই দেননি। এবারে তো স্পেশাল ডেলেভারির দরখাস্ত তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু−

কথা বাড়ান না আব্দুল জলিল। একবার মৃত্যু ঘটে গেলে পূনর্বার জীবিত হবার সুযোগ স্বয়ং বিধাতাই রাখেন না, আর এ তো সামান্য সরকার− এ ভাবনা ভাবতে ভাবতে লাইনের পরবর্তীজনকে স্মার্ট কার্ড পাবার সুযোগ করে দিয়ে বেরিয়ে আসেন তিনি।

আট.

আব্দুল জলিলের সত্যি সত্যি মৃত্যু ঘটার পিছনে সরকারি খাতায় 'মৃত' অপবাদ কতটা প্রভাব রেখেছিল, সে কথাটি এখন আর জানার কোনো অবকাশ নেই। তবে, ধারণা করতে পারি– ছিল। নাহলে, সাতান্ন বছর প্রায় নির্বিবাদে কাটিয়ে দেয়া জনৈক বৃদ্ধ কৃষক আব্দুল জলিল কেন হঠাৎ 'ন্যায্যমূল্যে সার বিতরণ'-এর প্রতিবাদী জনসভায় পুলিশের সাথে হাতাহাতিতে লিপ্ত হবেন– সে প্রশ্নের সহজ মীমাংসা হয় না। কিন্তু ঘটনা হলো, তিনি সেই প্রতিবাদী জনসভায় এলাকার আরো বেশকিছু জনতার সাথে গিয়ে শরিক হয়েছিলেন। জনসভা শেষে অন্যান্যদের সাথে তিনি জেলাপ্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করার মতো কর্মকাণ্ডেও সশরীরে হাজির ছিলেন। যদি না থাকতেন, তবে সেদিন সন্ধ্যায় আব্দুল জলিলেল পুত্র আব্দুল মোতালেবকে আহাজারি করতে করতে এ সংবাদটি রাষ্ট্র করতে হতো না যে, তার বাবা পুলিশের বেপরোয়া লাঠিচার্জে, অথবা বিক্ষোভকারী জনতাকে হঠানোর জন্য কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষণে নিহত হয়েছেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে লাঠিচার্জ কিংবা দু'এক রাউন্ড গুলি বর্ষণের দরকার ছিল বলেই মনে হতে পারে আমাদের, বিশেষত যখন জানব যে জেলাপ্রশাসক বেচারা জনতার অবরোধের মুখে তার নিজ দপ্তরে সকাল থেকেই আটকা পড়েছিলেন, অথচ সেদিন দুপুরে তার আপন শ্যালিকার বিয়ে ছিল এবং অনুষ্ঠানে যেতে দেরি হচ্ছিল বলে তার সদ্য দ্বিতীয় বিয়ে করা প্রাক্তন-টিভি-মডেল বউ বারবার ভিডিও-ফোন করে তার কাপুরুষতার প্রতি ইঙ্গিত করাতে তিনি এই 'হার্ডলাইন' গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তবে এসব স্রেফ বাজে কথাও হতে পারে। আসল কথা হলো, আব্দুল মোতালেব আহাজারি করলেও কোনো লাশ কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যায় না। তার দাবি, পুলিশবাহিনী তার বাবার লাশটি গুম করে ফেলেছে।

আব্দুল মোতালেব এর আহাজারি এলাকার অনেক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। কে বা কারা সেটিকে মোবাইল ভিডিও করে 'ফেসবুকে' আপলোড করে দেয়। মধ্যরাত নাগাদ সে ভিডিও সাতশত চেচল্লিশবার শেয়ার, লাইক-লাভ-স্যাড-ওয়াও মিলিয়ে এক হাজার তিনশ উনিশবার প্রতিক্রিয়া এবং দুইশত আটাশিটি কমেন্ট প্রাপ্ত হলে প্রায় সমস্ত মুল্লুকের জনগণ জানতে পারে, ন্যায্যমূল্যে সার বিতরণ–এর মতো একটি ন্যায্য দাবি তুলতে গিয়ে আব্দুল জলিল নাম্নী একজন কৃষক পুলিশের হাতে খুন হন।

এবং যথারীতি পরদিনের পত্রিকায় খবরটি কাগজ-কালিতে লিপিবদ্ধ হয়ে গেলে চারদিকে একটা সাময়িক শোরগোল তৈরি হয় মগমুল্লুকের আনাচে-কানাচে।

নয়.

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় তো নেই যে, সরকারের ভাব ও সরকারের মূর্তি– এ দুটো, সব মুল্লুকেই, খুবই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। সেই বস্তু দুটোকে সুযোগ পেলেই যে নানান কুচক্রী মহল টানাহেঁচড়া করতে শুরু করে, টেনেহিঁচড়ে মাটিতে নামিয়ে আনতে চায়– তা আর বেশি কথা কি! বলাবাহুল্য, আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে লাগল।

একটা সামান্য দুর্ঘটনা হঠাৎ মগ-মুল্লুকে বিশাল আলোড়ন তুলতে শুরু করে। খেয়ে-না-খেয়ে, নামে-বেনামে, দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মগেরা নানান আলোচনা, টকশো, স্ট্যাটাস ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে সামান্য একটা ব্যাপারকে বেশ অসামান্য করে তোলে। পরতের পর পরত অপবাদের কালি লেপন করা হতে থাকে ক্ষমতাসীনদের দাবড়ে বেড়ানো উন্নয়নের ঘোড়ার গায়ে। এতে ‘প্রোপাগাণ্ডা’ ছড়ানোর অপবাদে বেশকিছু ধরপাকড় হয়, তবে তাতেও নানান দিক হতে উত্থিত হতে থাকা বুনকা বুনকা ধোঁয়া না থামাতে, মাননীয় সরকার ঘটনাটি নিয়ে অচিরেই একটি ‘উচ্চপদস্থ তদন্ত কমিটি’ গঠন করে দেন। কমিটিকে মাত্র সাতদিনের সময় বেঁধে দিয়ে তাদের রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়।

অতি করিৎকর্মা তদন্ত কমিটি মাত্র তিন দিনের মাথায় তাদের তদন্ত রিপোর্ট পেশ করে। এবং সেটি অত্যন্ত ফলাও করে সমস্ত মুল্লুকের নানাবিধ মিডিয়ায় ঢামাঢোল বাজিয়ে প্রচার করা হয়। রিপোর্টটির চুম্বক অংশটি ছিল এরকম:... জনদরদি ও গরিবের বন্ধু সদাশয় সরকারের বিরুদ্ধে কুচক্রী মহলের অন্ধ বিরোধিতা যে কত নিচে নামতে পারে, এ ঘটনাটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ইতিহাসে। অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও গভীর অনুসন্ধানে এই সত্যটি উঠে এসেছে যে, যে কৃষকের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য এ জাতীয় দালালেরা উঠেপড়ে লেগেছেন, যার নাম আব্দুল জলিল বলে তারা দাবি করেছেন, তিনি আজ থেকে অন্তত দশ বছর আগেই মারা গিয়েছিলেন। বৈহাটি উপজেলার কার্যালয়ে রক্ষিত কাগজপত্রে পরিষ্কারভাবে তার মৃত ‘স্ট্যাটাস’টি উল্লেখ আছে। এভাবে প্রকৃত ঘটনা না যাচাই করে সংবাদ প্রচার করা এবং তা নিয়ে মাতামাতি করাটা সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। অবিলম্বে এই জাতীয় মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আইনের আওতায়...

উপসংহার.

আব্দুল জলিল হয়তো আসলেই বেঁচেছিলেন না। মগ নামের মুল্লুকে কে 'বেঁচে' আছেন এবং কে 'মরে' আছেন– সে কথা বুকে হাত নিয়ে কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়। কেননা, নিজের বুক আপনার জীবিত কিংবা মৃতের 'স্ট্যাটাস' দাবি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এক্ষেত্রে সরকারি নথি ভিন্ন আর কোন ওহির কথা আমাদের জানা নেই।

ও হ্যাঁ, শেষপর্যন্ত জানা গেছে, পুলিশের জেরার মুখে আব্দুল জলিলের পুত্র আব্দুল মোতালেব স্বীকারোক্তি দিয়েছেন যে, তিনি একটা বিশেষ মহলের চক্করে পড়ে এতবড় নাটক করেছেন। তার বাবা ঠিকই সেই দশ বছর আগে মারা গিয়েছিল। এ বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তিনি সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অবশ্য তার আহাজারির ভিডিওটি 'ভাইরাল' হওয়াতে তিনি যে খুশি হয়েছেন– সেটিও অকপটে প্রকাশ করেছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সদাশয় সরকার 'আব্দুল মোতালেবের মতো সহজ-সরল' ভাইরাল-প্রত্যাশী' প্রজা'র প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। তবে একই সঙ্গে তাকে চক্করে ফেলে ফায়দা লুটতে চাওয়া 'বিশেষ মহলটিকে খুঁজে খুঁজে আইনের আওতায় আনার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেছেন।

কবিতা
(দ্বিতীয় পর্ব)

সূচি

১৪৩ দুঃখীদের সুখ — আবুল কালাম আজাদ ছোটন
১৪৪ যখন কবিতা ছিল না — মুজিবুল হক মনি
১৪৬ দৃষ্টি — তাবেদার রসুল বকুল
১৪৭ পদ্মার কোলাজ — সফিয়া জাহির
১৪৮ খুনি — মোহাম্মদ ইকবাল
১৪৯ দখিন হাওয়া — আসমা মতিন
১৫০ সমঝোতা স্মারক — আবু মকসুদ
১৫১ দৌড় — কাজল রশীদ
১৫২ আকাশ কাঁদে বর্ষায় — সাইফুদ্দিন আহমেদ বাবর
১৫৩ কখনো রেখেছ খবর — তৌহিদ শাকীল
১৫৪ অদৃশ্য তীর — শাহনাজ সুলতানা
১৫৫ বাঙ্কসির গ্রাফিটি আর্ট — শামীম আহমদ
১৫৬ জন্মদিন — শাহ সোহেল
১৫৭ অপসৃয়মাণ অপচ্ছায়া — শরীফুজ্জামান
১৫৮ শূন্যতা হাহাকার — এম মোসাইদ খান
১৫৯ আয়োজন — ফাহমিদা ইয়াসমিন
১৬০ স্বদেশকে দূর থেকে দেখা — সৈয়দ মাসুম
১৬১ এপিটাফ — জুয়েল রাজ
১৬২ নিজের সাথে — মোহাম্মদ মুহিদ

দুঃখীদের সুখ

আবুল কালাম আজাদ ছোটন

নির্মল স্নিগ্ধ বাতাসে যাদের ক্লান্ত শরীরের ঘাম ঝরে,
সবুজ শ্যামল প্রকৃতিতে
যাদের জীবন সংগ্রাম।
কদম, জারুল আর বটের নিচে ক্লান্তির নাশিতে
যাদের কণ্ঠে সুর উঠে।
স্বচ্ছ জলের আয়নায়
যারা অবয়ব দেখে মৃদু হাসে,
নদী নালা খাল বিল
যাদের নিকট নিল নদ।
দুয়েল, শ্যামা, ফিঙে আর ঘুঘুর ডাকে
যাদের ঘুম ভাঙে।
যাদের স্বপ্ন মাঠভরা সোনার ফসল
ইরি, বোরো, আমন ইত্যাদি।
আন্তর্জাতিক পলিটিক্স মুক্ত প্রাণগুলোর হৃদয় ভরা আন্তরিক মমতা।
দিন রজনীর অধিকাংশ সময়
যাদের দেহে লেপ্টে থাকে
কাদা আর ধুলোবালি
বদন পরিষ্কারে নেই সুঘ্রাণ যুক্ত সাবান
পুড়ে যাওয়া ছাই যাদের
পরিষ্কারের অবলম্বন।
সমাজজীবনে এমন বৃত্তহীন সহজ ও সরল মানুষজনই সবচেয়ে সুখী।
কতো বৃত্তবান কোটিপতিরা
বিশাল অট্টালিকায় বসবাস করেও
কুঁড়েঘরের সেই প্রশান্তির
ঘুমের পরশ পায় না।

যখন কবিতা ছিল না

মজিবুল হক মণি

যখন কবিতা ছিল না, আবে কায়সারের নহরে–
ইবলিশের বিচরন ছিল।
মন্দাকিনীর তীরে–
অভিশপ্ত রাবনের-নিঃশ্বাস ছিল।
যখন কবিতা ছিল না, ডায়নসরের পায়ে পিষে–
মরে যেত শ্যামল তৃণের নিষ্পাপ হাসি।
বৃন্দাবন কেঁপে উঠত রাক্ষসের হুঙ্কারে–
স্তব্ধ হতো রাই-কানাইয়ের অমৃত আশনাই-লীলা।

যখন কবিতা ছিল না, হেরা গুহায়–
জিব্রাইলের হাজিরা ছিল না।
ঐশী বাণীর অমিয় ধ্বনিতে ছিল না শীলার মুগ্ধতা।
বেথলেহ্যামের রাখাল কুটির আলো করে
কুমারী ম্যারির কোলে আসত না মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু।

যেখানে কবিতা নেই–
জনপদ হয়ে যায় চিড়িয়াখানা।
মানুষের কথাগুলো জানোয়ারের চিৎকার হয়ে যায়।
যেখানে কবিতা নেই–
মন্দির-মসজিদে মানুষ থাকে না
সেখানে জমে উঠে সীমার আর অসুরের আখড়া।
ঈশ্বর বন্ধী হয় ভন্ডদের কারাগারে,
যেখানে কবিতা নেই–
মায়ের আঁচল রক্তাক্ত করে কুলাঙ্গার,
বাপের ঔরষত্বে লাথি মেরে–
গায়ে জড়ায় ভিনরুচির উদ্ভট আলকেল্লা।
যেখানে কবিতা নেই–

উল্লাসের সাদা পায়রা আর সাদা থাকে না
প্রকাশ্য সড়কে বসে মগজ খেকো গৃধিনীর হাট।

যদি কবিতা হারিয়ে যায়–
হারিয়ে যাবে প্রাণের নির্মল উচ্ছ্বাস,
বিবেক আক্রান্ত হবে এবোলার বিষাক্ত ভাইরাসে,
প্রাঞ্জল হাসিতে মিশে যাবে শয়তানের ফ্যাকাশে হাসি,
ধর্ম মস্তকহীন হবে অধর্মের ধারালো ছোরায়,
মানবতা আছড়ে মরবে বলির যুপকাষ্টে।

যদি কবিতা হারিয়ে যায়–
মহাপ্রলয় হবে, ডুবে যাবে আরারাত শৃঙ্গে আটকে পড়া
নূহের কিস্তি, ফেরাউনের পিড়ামিড।
ছিটকে পড়বে হিমালয়, নিভে যাবে সূর্য নক্ষত্র।

যদি কবিতা হারিয়ে যায়–
হারিয়ে যাবে মানুষ আর ঈশ্বরের কীর্তময় সৃষ্টি।

দৃষ্টি

তাবেদার রসুল বকুল

চাকচিক্যের দেয়াল ভেঙে
আকস্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখি
নিস্তেজ অথচ শক্ত তোমার দেহটা,
স্তব্ধ হয়ে গ্যাছে তোমার কণ্ঠ
নিষ্পাপ দেহটা মাটিতে পড়ে আছে,
পাড়ার লোকেরা নিয়ে যাবে
নীরব অথচ মুক্ত পরিবেশে
তোমাকে সমাধিস্থ করার জন্য।
তাদের চোখে হয়তো নিদ্রা নেই
আমার দৃষ্টি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে
অশ্রুহীন ভাষায় বলতে পারি
এ পৃথিবী সবার সাথে
শুধু প্রবঞ্চনাই করে যাচ্ছে।

পদ্মার কোলাজ

সফিয়া জাহির

আমার ঘরের জানালা থেকে যে সমুদ্র দেখা যায়
তাকে, পদ্মা ভেবে ইশারায় ডাকি
পদ্মার জলবিন্দু এবং ভাসমান নৌকোর তৈরি করি কোলাজ
চুপি চুপি নীলরঙা সমুদ্র বলে দেয় তার শরীরে আছে পদ্মার ডিএনএ
সীমানা পেরিয়ে বুকের গ্রন্থিতে পদ্মার জল সাঁতার কাটে
আঁকড়ে ধরে বন্ধনের আলোকিত অধ্যায়

যাপিত জীবনের কাব্য শুনে সেও কবি হয়ে ওঠে
আকাশের চোখ, বুকে ধরে দেখে মেঘের সংসার
আর সিগালেরা জানিয়ে দেয় জীবনের স্পন্দন
বিমর্ষ দুপুরে অথবা গোধূলি সন্ধ্যায়
ঢেউগুলো কেমন আপন হয়ে ওঠে
অব্যক্ত কথাগুলো পাঠ করে প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো
দিনের শেষে দিগন্তের বুকে সূর্য ডুবে গেলে
ধরে রাখে থমকে যাওয়া পৃথিবীর নিঃসঙ্গ নিঃশ্বাস

খুনি

মোহাম্মদ ইকবাল

কাব্যের অতালান্ত মাধুর্যে অতলস্পর্শী অনুভব অন্বেষণই ছিল কবিতার সাথে
সখ্যের কারণ
কবিতার পরতে পরতে পরিভ্রমণ
কবিতাকে ভেঙেচুরে পড়ি
কবিতার জন্যই লিখি কবিতা
আত্মবিধ্বংসী অনুভবে অজান্তেই আমার তৃণভোজী কবিতা মাংসাশী হয়ে উঠে
খামচে ধরে বিহ্বল মাংসের নান্দনিকতা
আমি প্রেমিক হয়ে উঠি
কবিতার সাথে সখ্য কখনোই কবি হওয়ার জন্য নয়
স্ব-বিধ্বংসী অনুভবের আবর্তে বিভ্রান্ত আমার প্রেমিক কিংবা কবি সত্তা
সর্বোভোগ কবিতার গর্ভে আমার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম
না না আমি কখনোই কবি হয়ে উঠতে পারিনি
কখনো প্রেমিকও হতে পেরেছি কি?
পরন্তু আমার বিভ্রান্ত দ্বৈত সত্তা অজ্ঞাতসারে খুনি হয়ে উঠেছে
ভালোবাসার আঘাতে কবিতার হৃদয় বারংবার রক্তাক্ত
সত্যিকারের প্রেমিকরাই খুনি হয়, কখনো হৃদয়কে আঘাতে রক্তাক্ত করে, কখনো
বা ভালোবেসে রক্তাক্ত করে...

দখিন হাওয়া
আসমা মতিন

সেই রাত্রি সহস্র নক্ষত্র আমাকে ডেকে ছিল
রাতের নির্জনতা সয়ে, ছিলাম একাকী
আমাকে ডেকেছিল সেই রাত্রির সহস্র নক্ষত্র
এই নিস্তব্ধ নীলরাত রুপালি জোছনায়
খুব নীল রং পড়েছিল।
আকাশের ফরসা আলোয় দীর্ঘ এক স্নান
সেরে, চুল বেয়ে নেমে এলো আলোর ঝরনা
ধ্রুপদী শব্দরা আমাকে ঘুমুতে দিল না
মাথায় কি এক বোধ এসেছে রুপালি ঘুঙুর পায়ে
এক দুরন্ত দখিন হাওয়া জেগে আছে এখানে
বারবার ছুঁয়ে দেয় আমার পীতমণি চোখ
আমার ইচ্ছেগুলো দখিন হাওয়ায় উড়ে উড়ে
যাক
মধুর রাত হলে শেষ সরল শিশির ছুঁয়ে খোলে
যাক শীতল দুয়ার খোলে যাক ভোরের সংসার আমি চলে যাবো নক্ষত্রের দেশে
সেই রাত্রি সহস্র নক্ষত্র আমাকে ডেকেছিল।

সমঝোতা স্মারক

আবু মকসুদ

পাহাড়ের জুমচাষিদের সাথে সমঝোতায় আসা গেল;
তারা পাহাড়েই থাকবে, গরু চরাবে, ধান বুনবে
পুরুষেরা শম্বর শিকারের প্রস্তুতি নেবে,
তাদের নারীরা সময় সুযোগে বাচ্চা বিয়াবে,

তাদের ক্ষেতের ধানে আমরা মাড়া দিতে গেলে
তারা প্রতিবাদী হবে ধনুক আর তীরের বীরত্বে
কাছা বাঁধবে, বাঁশের বর্শায় ক্ষেতের শসা বেঁধে
বুক টান করে দাঁড়াবে, তফাতে দাঁড়িয়ে আমরা হাসব।

আমাদের দেশপ্রেমিক সৎবাহিনী জানে
কীভাবে হানাদার প্রতিহত করতে হয়,
তারা এও জানে কীভাবে হানাদার হতে হয
রোমেল চাকমা হত্যায় তাদের বীরত্ব প্রস্ফুটিত।

মাঝেমধ্যে জুমচাষিদের বাড়ি পুড়বে, পোয়াতি
নারীরা ধর্ষিত হবে, পুরুষেরা অক্ষম আস্ফালনে
অর্জুনের খোঁজে যাবে, নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তির ওপারে
লাশ তড়পাবে, বীভৎস দুঃস্বপ্ন হামাগুড়ি খাবে।

জুমচাষিদের সাথে একটা সমঝোতায় পৌঁছা গেছে;
অন্যায়, অত্যাচারের বদলে আমরা ফেসবুক বিপ্লব করব

সামাজিক মাধ্যমে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের মাধ্যেমে
দেখাব সর্বোচ্চ মানবতা, তারপর আরামে নিদ্রা যাব...

দৌড়

কাজল রশীদ

একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিচে ছায়ার অবসাদ, ঝিমুতে থাকি, আমার পাশ দিয়ে হরিপদ মশাই জ্বলন্তমশাল নিয়ে দ্রুত দৌড়াচ্ছেন। তার পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে কিছু অত্যুত প্রাণি, পেনসিল হাতে রহিমার দশ বছরের ছেলে আর অন্তর্বাস খুলে দেহাতির মা। এভাবেই আমরা দৌড়াতে থাকি এক যুগ থেকে অন্যযুগে। যুগের অবসান হয় কালের পতন হয় আমরা থেকে যাই সেই চিরচেনা গহ্বরে ।

বিবেক কানের কাছে শিস দিয়ে যায়, আর আমরা ভেসে থাকি চিরাচরিত নিয়ম ভাঙার জলে ।

আকাশ কাঁদে বর্ষায়

সাইফউদ্দিন আহমেদ বাবর

আকাশেরও কান্না পায়, আকাশও কাঁদে,
অঝোর ধারায় জল ঝড়িয়ে
আকাশ কাঁদে বর্ষায়।

আকাশেরও রোগবালাই হয়,
জ্বরের ঘোরে তাপ ছড়িয়ে পুড়িয়ে দেয়
আশপাশ, গ্রীষ্মের খরায়।

আকাশেরও আনন্দ হয়, আকাশও হাসে,
আনন্দের রঙে রাঙিয়ে দেয় ভুবন
পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়।

আকাশেরও উদাস লাগে, আকাশও হয় আনমনা,
শরৎ-এ মেঘ রাশিকে স্থান দেয়
তার বুকের নীলিমায়।

কখনো রেখেছ খবর

তৌহিদ শাকীল

সাতচল্লিশ, পঞ্চাশ বলো, চৌষট্টিও জানি।
এসবে কখনো ধর্ম ছিল না। রাষ্ট্রীয় উসকানি।
বিরোধিতা বোধ কেবল পেয়েছে রাষ্ট্রের প্রশ্রয়;
ঘৃণা-বিদ্বেষ তুমুল দাপটে অবাধে লালিত হয়।
খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখবে সামাজিক পর্যায়ে,
বারবার ঘটে হয়েছে প্রবল ডানে কিবা তার বাঁয়ে,
'সাম্প্রদায়িক' চর্চা থামেনি, থেমে গেছে সব প্রীতি!
একতার প্রেম ধুলোয় মলিন, যৌথতা আজ স্মৃতি।
জমিন হয়েছে খণ্ড খণ্ড, জমিন হয়েছে স্বাধীন।
সুরে-সুরে আজ বেসুর বাজিয়ে অসুর নাচছে তা-ধিন।
নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুখে-মুখে দেয় বিষ;
বিষে মরা লাশ ডিঙিয়ে-ডিঙিয়ে সুখে থাকে ইবলিশ।
এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে অসুরেরই কূট-কায়দা;
যেকোনো ধর্মী মরে যাক তাতে অসুরেরই লুট-ফায়দা।
উন্মাদনায় ধর্ম থাকে না, থাকে কূটরাজনীতি।
ধর্মের ভিত মজবুত করে সকলের সম্প্রীতি।
উগ্রতা কোনো ধর্মজ্ঞানী মানুষের কাজ নয়,
বিধানের-প্রতি-শ্রদ্ধাশীলের এতে জাগে বিস্ময়!
যারা বীজ বোনে অরাজকতার, যারা বীজ বোনে ত্রাসের,
তারা কেউ কোনো ধর্মের নয়, নয় কোনো বিশ্বাসের।
পরধনলোভী, স্বার্থে-অন্ধ, উগ্র শ্রেণির যারা,
তারা তো কখনো আপন হয় না, কেউ কারও নয় তারা।
তুমিও আমিও সহনাগরিক আজন্ম প্রতিবেশী,
এই সত্যের অপলাপ হলে হয়ে যাই বিদ্বেষী।
যুগান্তরের জরুরি বার্তা কেন করি অবহেলা?
চলো জোট বেঁধে হাতে হাত রেখে নাশ করি সব খেলা।

অদৃশ্য তীর

শাহনাজ সুলতানা

ছায়ার সাথে কথা বলি আর একা একা হাঁটি!
কাঙ্ক্ষিত সুখ স্পর্শের বাসনা জাগায়, নীল
আকাশে স্বপ্নের তুলি যখন এঁকে যায়
জীবনের প্রীতিমুগ্ধ ক্যানভাস, ঠিক তখন-ই
অদৃশ্য পুকুর থেকে ছুটে আসে ঝাঁকবাঁধা তীব্র
তীর! যেন আহত রক্তাভ নদী; হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে
উড়ে যায় অসংখ্য কই মাছ! অনিশ্চিত ভেলায়
ভাসে অনাগত দিন
প্রতিদিন যে ছায়ার সাথে কথা বলি; সে এক
নিবিড় ছায়াশব
প্রতিদিন যে নিঃশ্বাস শরীরে মাখি; সে এক
সর্বনাশী মৃগনাভ

বাঙ্কসির গ্রাফিটি আর্ট

শামীম আহমদ

নিশ্চুপ হয়ে গেলে সন্ত্রস্ত ঠোঁট
হাতের আঙুলগুলো−
গান গায় নিঃশব্দে, শব্দের মৌনবানে
ক্ষিপ্ত হয় আঙুল, আঁকে দ্রোহ,
পৃথিবীর দেয়ালে দেয়ালে,
দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে নিঃশ্বাস আমার;

আমি বিস্ময়ে দেখি কষ্টের রঙ
দ্রোহীর ক্যালিওগ্রাফিতে সিক্ত হয় আঁখি পল্লব,
হৃদয়ের আয়নায় ভেসে ওঠা রক্তের চারুলিপি
করে চরম বিদগ্ধ বিদ্রোহ।

বাঙ্কসির তুলিতে আঁকা
পৃথিবীর সব পার্লামেন্টই মনে হয় যেন
শিম্পাঞ্জির আস্তাবল!
গাঢ় অরণ্যে ভয়াল মৃত্যু উৎসবে অনন্ত উল্লাস;
সুতাকাটা ঘুড়ির মতো যখন হৃৎপিণ্ড ধমনি ছিন্ন−
করে অসীম আকাশে দেয় কষ্ট উড়ান
তখন শিম্পাঞ্জিগুলো হর্ষধ্বনি দিয়ে ওঠে সমস্বরে
ইয়েস মাই লর্ড...

ধূসর পৃথিবী সহস্র পায়ে হাঁটে শ্মশানের দিকে
আর আমি কবিতার জমিনে শুধু বুনে যাই কষ্টের চারা।

জন্মদিন

শাহ সোহেল

সময় ফুরালেও স্মৃতিরা থেকে যায়
জন্মদিন গেলেও ভালোবাসা রেখে যায়!
জলের বিশুদ্ধ ছোঁয়া চিৎকারে ধাবমান
নিষিদ্ধ গন্ধমসুখ করে রাখে ভাবমান।

ডিমের ভেতরে নিবাস তাই জঞ্জাল ঘুরে
হেওত ও ফুরইন'র দৌড় যায় কত দূরে!
দলা করে বাদাগুলো জড়ো করে তাই
গোফরর গাড়ায় রেখে জৈবযোগ্য বানাই।

চরকি-ঘোরে নিমগ্ন চরম পত্র পাঠে
কালের জিলাপি সময় যায় নিরলে কাটে
তারপর হয় ধ্বংস, যুদ্ধ- গুলিবিদ্ধ পাপে
জাজিম বিছানা খুঁজে তাপে-অনুতাপে।

জন্মদিন; উতলা রঙিন মাছরাঙ্গা পাখি হাসে
আকাশে বেলুন, বাতাসে বাঁশি আসে বারো মাসে।

অপসৃয়মাণ অপচ্ছায়া

মুহাম্মদ শরীফুজ্জামান

দেখেও কতো কিছু না দেখার ভান করি
দৃষ্টি কপালে তুলে পাশ কেটে গলি পথ ধরি।
থাক না নিদারুণ ঔদাসীন্যের কুয়াশায় বিপন্ন মানবিকতা
দৃষ্টিপথে আবলুসে বাঁধা দুঃসহ কতো অস্বাভাবিকতা।
ঝুমরি বস্তির ধ্বস্ত কালখণ্ড বোবা নিঃশব্দ কথামালা
ভেঙে পড়া ঢেউ সাগরের বালুতীরে ডুবুরি বেলা
নিভন্ত উদ্ভাসে নিস্ফল জমা বোবা নিঃশব্দতা
নিষাদ রাত্রী শেষে উত্থিতা প্রশ্নমালার মর্মকথা
চকিত পাবনে সময়কে পাঁজাকোলা করা মোহগ্রস্ত সময়
অপস্রিয়মাণ অপচ্ছায়া হয়ে তাও এক সময় বিবর্তিত হয়।

শূন্যতা হাহাকার

এম মোসাইদ খান

একবার মানুষের দিকে তাকাই একবার আকাশে। চোখ স্থির হয় না কোথাও।
আকাশের বুকে নিরেট শূন্যতা মানুষের বুকে তীব্র হাহাকার।
শূন্যতা হাহাকার পকেটে নিয়ে বাজারে যাই। বড় রাস্তার মোড়ে ঐতিহাসিক মাঠে
সাজানো রাজনৈতিক মঞ্চেচে নেতারা হুঙ্কারে ঝঙ্কারে কৌতুক অভিনয়ে সুকৌশলে
হাজার জনতার মাথায়
মাইক্রোফোনে ঢেলে যাচ্ছেন শূন্যতা, হাহাকার।
অন্য পথে হাঁটতে থাকি...
ফুটপাথে জটলা দেখে আনমনে দাঁড়াই।
হ্যাংলা লোকটি ইঁদুরের বিষ আর কাশির বড়ি হাতে নিজের শূন্যতা, হাহাকার
লুকিয়ে রেখে অনর্গল বলে যাচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত শূন্যতা, হাহাকারের সমাধান।

কাঁধে কারও স্পর্শ পেয়ে পিছন ফিরে তাকাতেই পুরানো বন্ধুর মুখোমুখি বহুদিন
পর। ধুমায়িত চায়ের কাপে চুমু দিতে দিতে একথা সেকথা, এর কথা ওর কথার
মধ্য দিয়ে ভারী নিঃশ্বাসে রেখে গেল তার নিজের ছোট বড় শূন্যতা ও হাহাকার।

ঘুরেফিরে থলির তলায় করে নিয়ে আসি আগুন। গিন্নি খিটখিটে মেজাজে গজগজ
করতে করতে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ এর শূন্যতা ও হাহাকার মিশ্রণে রান্না
করেন জীবনের এন্টিবায়োটিক।
সোফায় বসে দূরদর্শনের বোতাম টিপতেই বেরিয়ে আসতে থাকে রাশিরাশি
শূন্যতা আর হাহাকার। ভোরের দিকে হাঁটতে থাকে রাত, ক্রমেই বাড়তে থাকে
অন্তহীন শূন্যতা, হাহাকার।

আয়োজন

ফাহমিদা ইয়াসমিন

দূর থেকে দেখে যাই তোমাদের খেলা
গীবতের বাঁশিতে সুর তুলে করো যে অবহেলা
আমিও ঠিক সময়ের ব্যবধানে ঘুরে দাঁড়াবো
সেদিন দুঃখগুলোকে বাতাসের সাথে দূরে তাড়াবো

ফিরে আসবে তখন যদি আমার কাছে
হিসেবের খাতাটা খুলে দেবো ঠিক পাছে
লজ্জার নেকাব কি সরবে না তোমার তখন
কেনো তবে মিছেমিছি এতো অহমের আয়োজন!

স্বদেশকে দূর থেকে দেখা

সৈয়দ মাসুম

সাত সমুদ্র আর তের নদীর ওপাশে বসে
নিমগ্ন চিত্তে আমি রবীন্দ্রনাথ পড়ছি
নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা মনে মনে আওড়াচ্ছি
জীবনানন্দের বনলতা চোখের সামনেই হাঁটছে আমার
মাইকেলের সেই কপোতাক্ষ নদ মনে মনে
ভাবি বাড়ির সম্মুখেই আমার।
প্রিয় স্বদেশ দূরে হলেই দূর নয়
অন্তরে লালন করি বলেই
অন্তরেই দিয়েছি এর স্থান।

স্বদেশে থেকেও অনেক বিদেশি হয়ে যায়
যদি বুকে থাকে স্বদেশ প্রেম
বিদেশের বুকেও স্বদেশকে খুঁজে পেতে হয় না দায়।

এপিটাফ

জুয়েল রাজ

নাগরিক সুবিধা নিয়ে,
গুহাবাসী আদিম জীবন এখন।
কি রকম অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছি আমরা।
এভাবেই তো মানুষ বাঁচে!
কিন্তু কেউ জানে না,
কীভাবে,
মরে যায় প্রতিদিন...
ভালোবাসা ছাড়া।
আমিও প্রতিদিন মরি,
প্রতি মুহূর্তে মরি।
নিঃস্ব একা।

পাথরের মতো যুগ যুগান্তর...
শুধু চিহ্ন হয়ে পড়ে থাকা।
সৃষ্টি নেই, স্বপ্ন নেই
কাম আর ক্ষুধা ছাড়া।

হাজার হাজার বছর পর
নৃতাত্ত্বিক খননকারী দল,
খনন কার্য শেষে,
ঘষে মেজে দেখবে পাঁজরের হার।
সেখানে লেখা এক ইতিহাস।

একজন মানুষ এখানে বেঁচে থেকে, মরে পড়েছিল।
অপেক্ষায়, অবহেলায়।
ভালোবাসাহীন।

এপিটাফে লিখে দেবে
বেঁচে থাকা সত্য, নাকী ভালো থাকা?

নিজের সাথে

মুহাম্মদ মুহিদ

নিজের সাথেই করি কথোপকথন
আমি বেলা অবেলায়
স্বপ্ন সাজাই মনের ভেতর
মেতে থাকি শব্দের খেলায়

নিজেকে নিয়েই ব্যাস্ত থাকি আমি
একাকি নীরব ভাবনায়
নিজেকে ভাঙ্গি গড়ি কতবার
শিল্পে সুষম সাধনায়

আমার আমি আমার মাঝেই
আমাকেই করি অর্পণ
আমার ভাবনায় আমাকে খুঁজি
নিজেই নিজের দর্পণ

গল্প
(দ্বিতীয় পর্ব)

সূচি

১৬৫ দীপ নিভে গেল — কামাল কাদের
১৬৯ জন্ম ঋণ — ময়নূর রহমান বাবুল
১৭৭ ছায়ামানুষ — আতাউর রহমান মিলাদ
১৮৩ দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ বৃত্তান্ত — মাসুদা ভাট্টি
১৯৮ মিলার পাহাড় — শিপা সুলতানা
২০৩ ভ্রমান্ধ দৃশ্যের বায়স্কোপ — সুমন সুপান্থ
২১০ হামিদা বানুর সংসার — সাঈম চৌধুরী

দীপ নিভে গেল

কামাল কাদের

বিলেতের শীতকালীন রাত। কনকনে শীত। বাইরে ঘোর অন্ধকার। অশীতিপর বৃদ্ধ শফিক সাহেব একাকী ঘরে সোফায় বসে টেলিভিশন দেখছেন। হঠাৎ করে টেলিভিশনটি এক তীব্র আলোর ঝলকানি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল, সাথে সাথে ঘরের ভিতরটাও অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। নিজেকে তখন আরো একাকী মনে হতে লাগল। আস্তে আস্তে স্মৃতি পটে নানা ছবি ভেসে আসতে শুরু করল। প্রিয় অপ্রিয় এমনি অনেক জনের মুখ। সিনেমার পর্দার ছবির মতো, ছবিগুলি মনের অন্তরাল থেকে চলে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে। একটা মুখচ্ছবি যেন ইচ্ছে করে এক জায়গায় এসে স্তব্ধ হয়ে রইল। সুন্দর মুখখানি, নীল- গভীর চোখ, সরু চিকন নাক, আপেলের মতো টক টোকে গাল। গায়ের রঙ ফর্সা হলুদ মেশানো। সোনালি চুল, সুন্দর গড়ন।

প্রথম কাজে ঢোকার দিন বিভাগীয় প্রধান শফিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন তার সুপারভাইজার মিস মেরিওন কুপারের সাথে।

-মিস্টার ইসলাম, ইনি এই একাউন্টেন্সি ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ মিস কুপার। আর মেরিওন, উনি মিস্টার শফিকুল ইসলাম। বাংলাদেশ থেকে ইংল্যান্ডে লেখাপড়া করতে এসেছে। ছয় মাস আমাদের অফিসে 'এপ্রেন্টিসিফ' হিসেবে কাজ করবে, তার পর সে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যেয়ে তার ডিগ্রি সম্পূর্ণ করবে। তুমি একটু ওর দিকে নজর রেখো। কাজ টাজ দেখে শুনে বুঝিয়ে দিও।

-তা আর বলতে হবে না মিস্টার টমাস, মেরিওন হাসি মুখে বলল।

মিস কুপার শফিককে তার পাশের একটা টেবিল এবং চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল। শফিক যথানিয়মে তার কাজ শুরু করে দিল। যেদিন থেকে মিস কুপার জানতে পারল যে, এ বিদেশে শফিক একা এবং তাকে নিজে রান্নাবান্না করে খেতে হয়, সেদিন থেকে মিস কুপার নিজের লাঞ্চের সাথে শফিকের জন্য ও অফিসে লাঞ্চ আনা

শুরু করল। প্রত্যেক দিন ওর লাঞ্চ খাওয়ার জন্য শফিকের নিজেরই খারাপ লাগছিল। কিছুটা লজ্জাও অনুভব করছিল। প্রথমদিকে কিছু বলতেও পারছিল না। অবশেষে একদিন নিরুপায় হয়ে বলল, ‘মিস কুপার, তুমি রোজ রোজ আমার জন্য পয়সা খরচ করে লাঞ্চ নিয়ে আসো, এটা মোটেই ভালো দেখায় না আমি তো অফিসার কেন্টিনেই খেয়ে নিতে পারি’। মিস কুপার বলে, ‘আমার আর কি পয়সা খরচ হয়, ঘরে যখন নিজেরটা বানিয়ে নিই, তখন তোমারটাও বানিয়ে ফেলি’।

-কিন্তু মিস কুপার!

-না, কোনো কিন্তু টিন্তু নয়। শফিক, আমি মেরিওন তোমার বন্ধু, তোমাকে আমার ভালো লাগে, তাই তোমার জন্য এই কষ্টটুকু করতে আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

কথাগুলো শুনে শফিক একেবারে ‘থ’ বনে গেল। এই সুন্দরী, বিদুষী (কোয়ালিফায়েড চার্টার্ড একাউন্টেন্ট) খাস ইংরেজ ললনা বলে কি! সে তো মাত্র এক শিক্ষানবিশ, বয়সে হয়তো সমান সমান হবে, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে সে তার চেয়ে অনেক উপরে। শফিক নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাছাড়া এ দেশে বর্ণবাদী বিদ্বেষের কথা তো কারও অজানা নেই। মেরিওন বলে চলেছে, ‘জানো শফিক, আমার বাবা ইন্ডিয়াতে আর্মি অফিসার ছিলেন। ওনার কাছে ইন্ডিয়ার অনেক গল্প শুনেছি। ইন্ডিয়ান আর্ট, ইন্ডিয়ান কালচার, ইন্ডিয়ান সভ্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেই থেকে আমি মনে মনে ইন্ডিয়াকে ভালোবেসে ফেলেছি। অফিসে প্রথম যেদিন তোমাকে দেখলাম, সেদিন থেকেই তোমাকে ভালো লাগতে শুরু করেছে। তারপর ধীরে ধীরে তোমার কথাবার্তায়, তোমার ব্যবহারে আমি বুঝে নিতে পারলাম, আমি একজন খাঁটি ইন্ডিয়ানের দেখা পেয়েছি’।

শফিক বলে, ‘আমি ইন্ডিয়ান নই, আমি বাংলাদেশি’।

‘তোমরা সবাই তা বলো, আসলে ইন্ডিয়া স্বাধীন হওয়ার আগে তোমার বাবা, দাদা, সবাই তো ইন্ডিয়ান ছিলেন’। মেরিওন শফিকের কথাটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল।

‘তোমার সাথে কথায় পারব না মেরিওন, তোমার কথায় যুক্তি আছে’। শফিকের স্বীকারোক্তি।

তারপর মেরিওনের সাথে এমনি করে অনেকদিন কেটে গেল। শফিকের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেল এবং সে ইউনিভার্সিটিতে ফুল টাইম ক্লাসে ফিরে এলো। সময়ের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের পরস্পর সম্পর্ক মধুর থেকে মধুরতর হতে লাগল। বছরখানিক পর একদিন মেরিওন বলল,

'চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি'। শফিক একটু ইতস্তত করে জানাল, 'আমি এখনো ছাত্র, আর আমাকে প্রতি বছর ভিসা রিনিউ করতে হয়। তাছাড়া আমার নিজের কোনো রেগুলার ইনকাম নেই। দেশে বাবা-মাকে কথা দিয়ে এসেছি বিলেত থেকে একটা ডিগ্রি নেব, তাই এ ব্যাপারে আপাতত আমি জড়িত হতে চাই না'।

'ভালো কথা, তুমি টাকা-পয়সার কথা ভাবছ কেন? তোমার যত দিন খুশি তুমি ছাত্র থাক, আমিই সংসারের ভার নিয়ে নিব। আর ভিসার ব্যাপারটা কিছুই না। আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে তুমি অটোমেটিক পার্মানেন্ট থাকার সুযোগ পেয়ে যাবে'। মেরিওন শফিককে কনভিন্স করার চেষ্টা করল।

'না মেরিওন! অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করো, আমি সংসার ঝামেলার ভিতর দিয়ে লেখাপড়া করতে চাই না' শফিকের একান্ত অনুরোধ।

'ঠিক আছে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব, তোমার ডিগ্রি না হওয়া পর্যন্ত'। মেরিওনের উদার বক্তব্য।

ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল। শফিক সম্মানের সাথে পাস করল। আর কোনো বাধা রইল না। একদিন সময় করে শফিক এবং মেরিওন রেজিস্টার অফিসে যেয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করল। দেশে বিয়ের খবরটি বাবা মাকে জানিয়ে দিল। বাবা-মা ঘটনাটি অবগত হয়ে ভীষণ দুঃখ পেল। কারণ উনারা দেশে তাদের পছন্দমতো মেয়ে ঠিক করে রেখেছিল। মনে মনে ভাবল ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে ভুল করেছে, আদরের ছেলেটি বিপথে পা বাড়িয়েছে। কী আর করা ! দেশের সাথে এভাবেই শফিকের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

বিয়ের মাস কয়েক পর সপ্তাহ দুয়েকের জন্য মেরিওনকে কোম্পানির 'অডিটের' জন্য তাদের মাল্টা অফিসের ব্রাঞ্চে পাঠানো হলো। যাবার সময় হিথরো বিমান বন্দরে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হলো। বেশ আনন্দ ঘন পরিবেশে সময়টা কেটে গেল। বিমানের দিকে এগুতে এগুতে মেরিওন হাসতে হাসতে শফিককে জিজ্ঞাসা করল, 'মাল্টা থেকে তোমার জন্য কি নিয়ে আসব?' উত্তরে শফিক বলল, 'তুমি যত তাড়াতাড়ি নিরাপদে ফিরে আসো, সেটাই আমার চাওয়া, আর কিছু চাই না'। তিন দিন পর মেরিওনের বাবার কাছে খবরটি পেয়ে শফিকের মাথাটা টলতে শুরু করল, মাল্টাতে মেরিওন নিখোঁজ। ওর কোম্পানি সন্দেহ করছে কুখ্যাত মাফিয়া বাহিনী ওকে কিডন্যাপ করেছে। মাল্টা দ্বীপে এবং তার আশেপাশে এই দলটি খুবই বেপরোয়া। তাদের অসামাজিক এবং হিংস্র কার্যকলাপে কারণে স্থানীয় পুলিশদের ঘুম নেই। শফিক ভাবছে একি তার মা-বাবার

অভিশাপে এ ঘটনা ঘটল? কিন্তু কারও মা-বাবা শত ক্ষতিতেও তার সন্তানদেরকে কখনো অভিশাপ দেয় না এতো সবাই জানে! তবে কেন এমন হলো?

এখনো এই আশি বছর বয়সে শফিক মেরিওনের পথ পানে চেয়ে থাকে, ও আসবে বলে। তার স্মৃতির জগতে আজও সে জীবন্ত। আজও মেরিওন ছাড়া সে অন্য কিছুতেই মন বসাতে পারে না। তার সমস্ত ধ্যান-ধারণায় সারাক্ষণ মেরিওনকে জড়িয়ে রয়েছে। সেই নীল গভীর চোখ, সরু চিকন নাক, আপেলের মতো টক টোকে গাল, ফর্সা-হলুদ রঙের গা, সোনালি চুল, সে যে তার মেরিওন, তার বিশ্বাস সে কিছুতেই এভাবে হারিয়ে যেতে পারে না!

পাড়ার লোকেরা বেশ কিছুদিন ধরে বৃদ্ধ শফিককে দেখছে না। রাস্তায় বের হলে তারা 'হ্যালো', 'হায়' বলে শফিকের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করত এর বেশি কিছু নয়। সে আপন জগতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখত। একান্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় কেনাকাটা ছাড়া বাইরে বের হতো না। কোনো কোনো প্রতিবেশী মনে করছে হয়তো মহামারি কোভিড রোগের জন্য কোনো আত্মীয়স্বজনদের বাসায় সে চলে গেছে। শফিকের এমন কোনো পরিচিত লোক আছে বলে পাড়ার লোকদের কখনো চোখে পড়ে নেই।

পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা কিছুদিন ধরে কোন কিছু পচে যাওয়ার গন্ধ পাচ্ছে। মহিলার ভয় হচ্ছে, কোনো অঘটন ঘটলো কিনা, যখন সে দেখছে তার প্রতিবেশী শফিকের চিঠিপত্র দরজার 'লেটার বক্সের' প্রবেশ পথে জমে আছে। ফ্ল্যাটের মালিক কাউন্সিলের লোক কয়েক দিন ধরে ঘরের 'কলিং বেল' বাজিয়েও ঢুকার কোনো সুযোগ পাচ্ছে না, তখন কোনো উপায় না দেখে প্রতিবেশী সবাই মিলে পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হলো। পুলিশ গায়ের জোরে দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল। আশেপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সবাই যেটা ভয় করছিল, অবশেষে সেটাই হলো। পুলিশ ঘরের ভেতরে ঢুকার পর দেখতে পেল সেই স্বল্পভাষী বৃদ্ধ ব্যক্তির দেহটি সোফাটার মধ্যে মরে পড়ে আছে। দেহটি পচতে শুরু করেছে, তারই দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার জাতীয়তা জানা হলো, সে একজন ব্রিটিশ বাংলাদেশি। পুলিশের কাছে শফিকের মৃত্যুটা রহস্যজনক, কিন্তু সন্দেহপ্রবণ নয়। যথারীতি, পুলিশের আইন অনুযায়ী তার দেহখানি অপঘাত মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করার জন্য 'করোনার' অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এক প্রতিভাবান যুবকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এই বিলেতে শুরু হয়েছিল, আর ভালোবাসার ভিখারি হয়ে এখানেই একাকী জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। প্রিয়জন কেউ জানল না, একফোঁটা অশ্রু ঝরার কেউ কাছে থাকল না। এক বিদেশির জীবনপাতা শেষপর্যন্ত এভাবেই থমকে গেল। এরই নাম কি ভালোবাসা, না অপরিণামদর্শিতা?

জন্ম ঋণ

ময়নূর রহমান বাবুল

পাঁচ বছরে যা হয়নি, এই মাত্র পাঁচ সেকেন্ডে তা হয়ে গেল। মন বলতে জিনিসটা যে কী? আজ পাসকরা ডাক্তার হয়েও কেউই তারা যেন বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ কতো কাটা-ছেঁড়া করেছেন মানুষের দেহ। দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ডাক্তারি পাস করে এসে আজ এই মানবদেহের কোথায় কোন স্থানে মন নামক বস্তুটি থাকে, তা যেন তাদের দু'জনের কাছেই বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। জুলিয়ান ব্ল্যাক আর মুশরেকা রুমি আজ, এখন এই পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে যা অনুভব করল, যা শিখল, তা গত পাঁচ বছরের এক সাথে শিক্ষাজীবনেও বুঝতে বা শিখতে পারেনি।

মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে একসাথে এই কলেজে গত পাঁচ বছর যাবৎ লেখাপড়া করছেন মুশরেকা রুমি আর জুলিয়ান ব্ল্যাক। মুশরেকা এশিয়ান। অর্থাৎ বাংলাদেশের বাঙালি এবং জুলিয়ান ইংরেজ তথা ইংল্যান্ডের। ইম্পেরিয়াল কলেজের মতো নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা লেখাপড়া করছেন। দু'জনই খুব কৃতি শিক্ষার্থী। ক্লাসে সবার মধ্যে অগ্রগামী। শিক্ষকদের চোখে পড়া দু'টুকরো হীরাখণ্ড যেন তারা দু'জন। সহপাঠীদের প্রায় সবাইও যেন তাদের দু'জনকে চেনে এবং খাতিরও করে। তাদের দু'জনের কর্ম এবং বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল, গবেষণার রেজাল্ট সব সময়ই বলে দেয় যে, তারা এই কলেজে নয় শুধু, সারা দেশজুড়ে একদিন চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিছু একটা করবে –উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখবে।

মুশরেকা রুমি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শল্যচিকিৎসক মোস্তাক হোসেনের একমাত্র মেয়ে। প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। তুলনাহীন এবং তার মেধা ও জ্ঞান এবং দক্ষতা দেখলে ঈশ্বরে যেন বিশ্বাস করতেই হয়। এজন্য তার গুনগান গাওয়া সবাই শেষ করেন এই বলে যে, 'এ যে স্রষ্টার দান'। ইন্টার শেষ করেই সরাসরি এই বিদেশি কলেজে পড়ার বৃত্তি নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে সে চলে আসে ইংল্যান্ডে। জুলিয়ানও সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারের ছেলে। বাবা অনেক

নামকরা স্থাপত্য ইঞ্জিনিয়ার। ব্রিটেন এমনকি ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তার নিজের করা অনেক নামকরা স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে। জুলিয়ান ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। অপূর্ব সুন্দর সে। পুরুষ মানুষও এতো সুন্দর হয় –জুলিয়ানই যেন তার এক প্রকৃত উদাহরণ।

সরকারি বৃত্তি নিয়ে নয়। বাবার অর্থেই জুলিয়ান ভর্তি হন মেডিকেল সায়েন্স নিয়ে ইম্পেরিয়াল কলেজে। সহপাঠী হয়ে যান মুশরেকা রুমির। কিন্তু গত পাঁচ বছর একসাথে লেখাপড়া করেছেন, উঠা, বসা কিংবা গবেষণাগারে অথবা কেন্টিনে কপির টেবিলে একসাথে বসেছেন। কখনো কেউ কারও দিকে অন্য নজরে তাকাননি। বলতে গেলে তারা এসব যে বুঝেনওনি। মন বলতে যে মানবদেহের সাথে বা মানুষের এমন কিছু একটা থাকে তা যেন এই ত্রুটিহীন আর কৃতিত্বপূর্ণ শিক্ষা জীবনে তারা জানেননি। শিখেননি। এমনকি অনুমান পর্যন্তও করতে পারেননি।

ফলাফল ঘোষণার পর আজ তাদের সমাবর্তন উৎসবের দিনে বিরাট হল ভর্তি শিক্ষক, ডাক্তার শিক্ষার্থীগণের উপস্থিতিতে চ্যান্সেলর নিজে একটা বিশেষ বক্তৃতার মাধ্যমে ভূমিকাপর্ব শেষ করে প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মুশরেকা রুমি আর জুলিয়ান ব্ল্যাককে। বিগত চল্লিশ বছর পূর্বে এই কলেজের রেজাল্টের রেকর্ড ভঙ্গ করে এবং পঁয়ত্রিশ বছরের সারা দেশের রেজাল্টের রেকর্ড ভাঙতে পেরেছেন যে একজোড়া শিক্ষার্থী তারা মুশরেকা এবং জুলিয়ান। মহামান্য রাণীর পক্ষ থেকে তাদের দু'জনের জন্য বিশেষ স্বর্ণপদক প্রদান করার জন্য রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রিন্স স্বয়ং এসেছেন। তিনিই আজ তা তাদের হাতে তুলে দেবেন। দিলেনও। উপাচার্যের এই আবেগময় ঘোষণা এবং নাম প্রকাশের প্রাক্কালে জুলিয়ান তার চোখজোড়া তুলে মুশরেকার দিকে তাকাল। তখন মুশরেকার চোখজোড়াও একই সরলরেখায়। সময় সেকেন্ড পাঁচেক মাত্র। এই প্রথম তারা নিজেদের মধ্যে অন্যরকম কিছু যেন অনুভব করল।

তারা উভয়েই বুঝতে পারল, তারা একজন অন্যজনকে ভালোবাসে। যদিও স্পষ্টত তাদের ভালোবাসার শুরুটা এই এখান থেকেই। বোঝা, অনুভব এবং শুরুটা এখান থেকে হলো ঠিকই। তবে তা গড়ালো আরো অনেকদূর। সময় এলো ভাববার। বর্তমানতো চলছে। কিন্তু আগামী রঙিন এবং বাস্তব দিনগুলো? মুশরেকা তার দেশে চলে যাবে। এটা তার পূর্ব সিদ্ধান্ত। তবে কী থাকবে এই ভালোবাসার কাছে পাওয়া?

জুলিয়ান বিয়ের প্রস্তাব দেয়। জুলিয়ানের কোনো শর্ত নেই, কোনো কিছুতেই অমত নেই। সব শর্ত, সকল চাওয়াই যেন মুশরেকার হয়ে গেল। মুশরেকা তার নিজের

দেশে থেকে দেশের মানুষের জন্য তার জীবন উৎসর্গ এবং তার সেবা প্রয়োগ করতে চায়, এটাই তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

জুলিয়ান তাতে এক কথায় রাজি। মুশরেকার কোনো শর্তে অমত বা দ্বিমত নেই জুলিয়ানের। শুধু একবার বলেছিল তোমার যেমন দেশ, আমারওতো তাই।

অবশেষে তারা একজন আরেকজনকে বিয়ে করে। মুশরেকা চলে যায় তার দেশে। দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসালয় তথা মেডিকেল কলেজে তার কর্মক্ষেত্র। জুলিয়ান ইংল্যান্ডের একটা হাসপাতালে কর্মরত। দু'জন দু'দেশে থাকেন। ছুটি এবং অবসরে তারা দু'জনেই উভয়ের দেশে যান। যদিও অবসর বলতে কোনোকিছু তাদের দু'জনেরই নাই বলা যায়। জুলিয়ানেরই বেশি যাওয়া হয় বাংলাদেশে। মুশরেকার সে সুযোগ খুব কম। নিজের দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মুশরেকা। দুই বছরের মাথায় নিজের দেশের সর্বোচ্চ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান। এরই মধ্যে নিজের কর্মদক্ষতা তাকে সারা দেশে পরিচিত করে তুলেছে।

বছর চারেকের মাথায় তাদের বিবাহিত সংসারে নতুন একজন অতিথি আসে। ডা. মুশরেকা বাংলাদেশেই জন্ম দেন নিজের সন্তানকে। এ সময় জুলিয়ান অবশ্য অনুরোধ করেছিলেন লন্ডনে যেন সন্তানের জন্ম স্থান হয়। মুশরেকা তাও না মানায় অবশেষে তা আর হলো না।

রাষ্ট্রপ্রধানের জটিল অসুখে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হয়। দেশে এই চিকিৎসা অপ্রতুল। একটু যেন রিস্কও। যেহেতু এ রোগের উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম একমাত্র লন্ডন অথবা জার্মানেই বিদ্যমান। অতএব অতি স্বাভাবিক কারণেই মুশরেকার সুপারিশ লন্ডনের দিকে থাকে। আর লন্ডনে এ বিষয়ে জুলিয়ান সবচেয়ে পারদর্শী ডাক্তার।

জুলিয়ানের হাতেই অস্ত্রোপচার হয় রাষ্ট্রপ্রধানের। যদিও মুশরেকার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান ছিল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু এ সময়ে তিনি নতুন করে জানতে পারেন জুলিয়ানও মুশরেকার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে। চিনতে পারেন জুলিয়ানকে নিজের দেশের জামাই হিসেবে।

সম্মানের সাথে জুলিয়ানকে নিজের দেশের নাগরিকত্ব প্রদানের অফার দেন রাষ্ট্রপ্রধান। প্রস্তাব পুরোটা না রাখলেও জুলিয়ান নিয়মিত বাংলাদেশে অবস্থান করার সুযোগটি কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করেন। সময় গড়ায় স্রোতের মতো ভাটির দিকে। জুলিয়ান মুশরেকার একমাত্র ছেলে সুমিত ব্ল্যাকও বড় হয়। বাবা-মা দু'জনের মতো কৃতি ও মেধাবী ছাত্র সে। যথানিয়মেই যেন পৃথিবী চলে। গাছের ছায়ায়ই যেন গাছ

জন্মে –বড় হয়। সুমিত ব্ল্যাক ইংল্যান্ডে অবস্থিত বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে লেখাপড়া করে ডাক্তারি পাস করে। জুনিয়র ডাক্তার হয়েও সে নামকরা প্রবীণ কনসালটেন্টদের সাথেই কাজ করে। দখল করে নেয় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। কর্মক্ষেত্র তার ইংল্যান্ডেই হয়।

দুই

হঠাৎ করে দেশের পটপরিবর্তন হয়। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারণী অনেক উচ্চপর্যায়ের লোকজনকে হত্যা করা হয়। প্রচুর রক্তপাতের মাধ্যমে নতুন সামরিক সরকার দেশের শাসনভার হাতে নেয়। যদিও এমন একটা ইঙ্গিত বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন মহলে ধোঁয়ার মতো ঘুরে ফিরে উড়ছিল। কিন্তু দেশ পরিচালকগণ ব্যাপারটাকে তেমন আমলে নেননি।

রাষ্ট্রপ্রধানের আবাসিক ভবনে রাতের প্রথম প্রহরেই আক্রমণ। সেনাবাহিনীর লোকেরাই এ অভ্যুত্থান পরিচালনা করে। হতে পারে বিরোধীমত কিংবা বিদেশি ষড়যন্ত্র। অথবা দেশের উচ্চাবিলাসী এক শ্রেনির মানুষের কারসাজি আর অস্ত্রধারী কিছু পাগলদের পাগলামি। যাই হোক না কেন। অভ্যুত্থান অভিহিত এ ঘটনায় রাষ্ট্রের অনেকেই রক্তে ভাসলেন এবং ক্ষমতা ও পরিচালনায় পরিবর্তন আসল। অভ্যুত্থান চলাকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের বাসভবনে তারই আমন্ত্রণে তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য উপদেষ্টা মুশরেকা রুমি এবং তার বিদেশি স্বামী জুলিয়ান ব্ল্যাক রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ঝড় যখন হয় তখন মসজিদ মন্দির গির্জা এসব কিছুই মানে না। ফলের গাছ কিংবা নিষ্কলুষ ফুলকেও রক্ষা করে না, বিচার করে না। বেপরোয়া ক্ষমতালিপ্সু অথবা হিংসায় অন্ধ অস্ত্রধারী অভ্যুত্থানকারীও আমন্ত্রিত নিরস্ত্র অতিথি বা ডাক্তারকেও রেহাই দিতে শেখেনি।

রাষ্ট্রপ্রধানের আবাসিক ভবনে রক্তের স্রোত ঢালুর দিকে প্রবাহিত হতে হতে একসময় ঠান্ডা হয়ে গাঢ় লাল রঙ কালচে হয়ে জমাট বাঁধল। রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা তার দেহরক্ষী, তার আর্দালি কর্মচারী অথবা তার শিশু সন্তানসন্ততি যেমন রেহাই পেলেন না তেমনি এদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসক মুশরেকা রুমি এবং তার বিদেশি স্বামী আরেক নামকরা শল্য চিকিৎসক জুলিয়ান ব্ল্যাক-এর রক্তও এক সাথে মিশে জমাট বাঁধল।

রাতের প্রথম প্রহরে মুহূর্তেই ঘটে গেল এসব ঘটনা। আক্রমণকারীরা কাজ শেষ করে সকলের মৃত্যু নিশ্চিত করেই চলে যায় রাষ্ট্র পরিচালনার চাবিকাঠি তাদের হাতে

নিতে। নিশ্চিত করতে তাদের ক্ষমতা। পাকাপোক্ত করতে তাদের দখলদারিত্ব। তারা রেডিও টিভিসহ ক্ষমতার সকল শাখা-প্রশাখায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রাত ঘনায়। লাশগুলো কলাপাতায় মুড়ে আঙিনায় কিংবা বাগানেই মাটিচাপা দেয়া হয়।

ঘটনাচক্রে লাশ একটা থেকে যায় বাহিনীর অস্ত্রবাহী ট্রাকের গুলাবারুদ সমৃদ্ধ বাক্সগুলোর আড়ালে। এই ট্রাকেই লাশগুলো বহন করে বাগানে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল। ভুলে এই লাশটি রয়ে গেছে। এই ট্রাকের চালক দু'দিন পরে যখন গাড়িতে গন্ধ পান তখন পূর্বের সেই লাশ বহনে রক্ত ধূয়ে হয়তো পরিষ্কার ভালোভাবে হয়নি ভেবে তা পুনরায় ধুতে গেলে তার নজরে আসে ফুলে পচন ধরা এই লাশটি। নিজের ভুল অসতর্কতার কথা ভেবে চাকরির স্বার্থে অথবা নিজের প্রাণ বাঁচানোর খাতিরে বাহিনীর ট্রাকচালক লোকটি যে কোনো কৌশলে দিন শেষে রাতের গভীরে লাশটি ফেলে আসে শহরের এক পরিত্যক্ত বাসার ড্রেনে।

ট্রাক চালক যা পরিত্যক্ত মনে করেছিল তাও তার ভুল ছিল। রাতের অন্ধকারে বাসা ঠাহর করতে ভুল হওয়ায় চালক লাশটি ফেলে আসে হাসপাতাল ল্যাবরেটরির তত্ত্বাবধায়ক রসায়নবিদ ডা. সেলু মজুমদারের বাসার পিছনে। ডা. সেলু যদিও এ হাসপাতালে কাজ করেন ঠিকই। কিন্তু তার পুরো পরিবার থাকেন বিদেশে। বাড়ি একা থাকে দীর্ঘ দিন। শুধু তিনি এবং তার আরো একজন কর্মচারী ছাড়া। ভোর রাতে লাশটি দেখেন তিনি। লাশ দেখে, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কিংবা সাদা কালো কিছুই বুঝার আর উপায় নেই। তিন দিনের ফোলা পঁচা রক্তে মাখানো লাশ দেখে এসব চিনবার উপায় নাই। সেলু মজুমদারের ওসবের দরকারও নাই। তিনি লাশটি তার স্টোর রুমে পলিথিন দিয়ে জড়িয়ে প্যাঁচিয়ে রেখে দেন। পরেরদিন অসুস্থতা দেখিয়ে হাসপাতালের কাজে অনুপস্থিত থাকেন। বাসার অন্য কর্মচারীকে ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। তিনি বিদেশ চলে যাবেন বলে তাকে জানান। ঘরেই ছিল তার রাসায়নিক দ্রব্যাদি। পরেরদিন তা তিনি দক্ষ হাতেই ব্যবহার করেন। অল্প কিছুদিন তার সক্রিয় প্রচেষ্টা তত্ত্বাবধান এবং সার্বক্ষণিক ব্যবস্থাপনায় লাশটি থেকে পচা মাংস ঝরে গিয়ে আস্তে আস্তে তা একটি মানব কঙ্কালে রূপান্তরিত হলো। অতি যত্নে এবং গোপনীয়তায় যা তিনি সংরক্ষণ করেন তার বাসায়।

সামরিক শাসনে দেশ চলছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত একটি দেশের স্বাধীনতা। সে স্বাধীন দেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সাথে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের হাতের পুতুল সামরিক

সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় যেন টালমাটাল। খুন, ধর্ষণ রাহাজানি ডাকাতি দেশে এখন যেন নিত্যদিনের ডালভাত। চোরাচালান আর দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দেশ। দেশের স্বাধীনতা বিরোধীদের লম্প-জম্প এখন সবকিছুকেই হার মানায়।

সেলু মজুমদার প্রশাসনের সকল সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে এখন নিজে একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। আমদানিকারকদের শীর্ষে এখন তার নাম। এই নাম কাগজে প্রদর্শন না হয়ে চোরাকারবারি হিসেবে যদি লেখা যেত, তবে তিনি হতেন দেশের শীর্ষস্থানীয় চোরাকারবারি। দেশ থেকে অনেক মূল্যবান বস্তু তিনি বিদেশে পাচার করেন। পরিবার-পরিজন বিদেশে থাকেন। সে সুবাদে বিদেশেও তার সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে। এসব জনতা দেখে কিন্তু যারা দেখার কথা, তারা দিনকানা হয়ে আছে যে, তারা তাই দেখতে পায় না।

সেলু মজুমদারের স্ত্রী সন্তানরা ইংল্যান্ডে যে অভিজাত এলাকায় থাকেন সেখানে তাদের পাশের বাসায়ই থাকেন দেশের নামকরা চিকিৎসক ডা. সুমিত ব্ল্যাক। কেউ কারও কোনো ইতিহাস না জানলেও প্রতিবেশী হিসেবে একে অপরকে চিনেন ঠিকই। সেদিন সেলু মজুমদারের ব্যবসায়ী ছেলে নিজের বাসার সামনে নিজের টেনিস মাঠে খেলতে খেলতে হঠাৎ বুক চেপে ধরে ঝুলে পড়েন। পাশের বাসাতো ডা. সুমিতের। তখন তিনি তার বাগানে গান শোনে শোনে ফুলগুলো দেখছিলেন। একটু অবসর মনে যেন সময় কাটাচ্ছেন। তার চোখের সামনেই ঘটলো ঘটনাটা। তিনিই জরুরি কল করে অ্যাম্বুলেন্স ডাকলেন। অ্যাম্বুলেন্স এসে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে তার হার্ট অ্যটাক ধরা পড়ল। চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে সেলু মজুমদারের ছেলে। কৃতজ্ঞতা হিসেবে পাশের বাসার ডাক্তার সুমিত ব্ল্যাককে ধন্যবাদ জানায় এবং তাদের বাসায় নেমন্তন্ন করে। ডা. সুমিত ভদ্রতার খাতিরে নিজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আসেন প্রতিবেশীর ঘরে। আসলে ভদ্রতার খাতিরে কী নিজের অন্য কোন আকর্ষণে বা টানে তিনি এসেছেন কিনা সে হয়তো নিজেই জানেন না।

বাসার ড্রইং রুমে বসে আড্ডা হয়। তারপর ডাইনিং রুমে খাবারের জন্য যাবার পথে যে বিস্তৃত এবং প্রশস্ত পথ সেখানে প্রচুর দর্শনীয় বস্তুর সাথে একটি কাচের বাক্সে রাখা একটি মানব কঙ্কালে তার চোখ আটকে যায়। ভদ্রতা লঙ্গিত হয় জেনেও তিনি এ নিয়ে আলাপ করেন। এটা কেন? কোথায় পেলেন ইত্যাদি। সেলু মজুমদারের স্ত্রী জানালেন, ওটা তারা বিক্রি করার জন্য এনেছেন। বিদেশ থেকে আমদানি করা আইটেম। ফ্রম বাংলাদেশ।

দাওয়াত খাওয়া থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল তখন এই মানব কঙ্কালটি। যেহেতু বিক্রির জন্য আমদানি করা হয়েছে তাই ডা. সুমিত এটা নিজেই তার হাসপাতালের জন্য ক্রয় করার আগ্রহ দেখালেন। খাবার জিনিস সবই পড়ে রইল ডাক্তারের পাতে। তার দু'চোখ জোড়ে সেই মানব কঙ্কাল যেন কাচের বাক্সে দোলতে থাকে। একসময় সেলু মজুমদারের স্ত্রী অনেকটা যেন আবেগেই বলে বসেন: এত যদি আপনার পছন্দ হয় এবং দরকারি মনে করেন তবে বিক্রি নয়। আপনি তা এমনিই নিয়ে যান। আমরা তা আপনাকে গীপ্ট করব। আপনার যেহেতু এটা খুব কাজে লাগবে। অতএব তা আপনিই নেন। আমাদের কাছেতো তা নিছক একটা বিক্রয় পণ্য। অন্য আরো দু'দশটা জিনিসের মতোই। হয়তো এটা একটু বেশি মূল্যের। তাতে কী? আপনি সময়মতো অ্যাম্বুলেন্স ডেকে আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। একজন মানুষ তরতাজা বাঁচিয়ে দিয়ে আপনি নিচ্ছেন একটা মৃত মানুষের কঙ্কাল, −এইতো !

ডা. সুমিত এর উপযুক্ত মূল্য দেবার জন্য খুব পীড়াপিড়ি করলেও অবশেষে তা আর হয়নি। কঙ্কালটা তারা দান করেদেন ডা. সুমিতকে।

নিজের মা বাবার সব তথ্য অর্থাৎ ডিএনএ তথা শারীরিক সব নমুনা ছেলে ডা. সুমিতের ল্যাবরেটরিতে গচ্ছিত ছিল। মাঝে মাঝে তা তিনি নেড়েচেড়েও দেখতেন। সেদিন সে কঙ্কালটির কিছু নমুনা তিনি কী এক কৌতূহলবসত পরীক্ষা করছিলেন। কেমন এক অজানা ছোঁয়ায় যেন তিনি তা করছিলেন। দু'চার দিন নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষায় এগুতে এগুতে তিনি এক সময় আরো অগ্রসর হন। তার নিজের সাথেই এর মিল রচিত হয় নিখুঁতভাবে এক সময়। এ তো তার বাবার কঙ্কাল! তিনি ল্যাবরটরি থেকে তড়িগড়ি বের হন। গাড়ি নিয়ে দ্রুত আসেন প্রতিবেশীর বাসার সামনে। গেট বন্ধ। কলিংবেলে চাপ দেন প্রবল শক্তিতে। তাকে জানতে হবে এই কঙ্কালের রহস্য। তারা তা কোথায় পেলেন? কী ভাবে পেলেন?

কলিংবেলের শব্দে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন। ডা. সুমিত তাকে চেনেন না। সুমিত তখন নিজের পরিচয় দিয়ে এ বাড়ির মহিলা বা যে কারও সাথে দেখা করতে চান, তা জানালেন। লোকটি ডা. সুমিতের পরিচয় পেয়ে তার নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে হ্যান্ডশেক করার আগ্রহ দেখিয়ে বললো: এখন থেকে আমি আপনার প্রতিবেশী। এ বাড়ি এখন আমার। গত সপ্তাহে ক্রয় করে আজ থেকে আমি এখানে থাকছি। তারা এ দেশ ছেড়ে চলে গেছেন আমেরিকায়। আপনাকে আগে তারা জানাতে পারেননি। এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বিদায়ের আগে আজ আপনার বাসায় গিয়েছিলেন বিদায় নেবার জন্য। আপনাকে না পেয়ে তারা এই চিঠিটি আমার

কাছে দিয়ে গেছেন। আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্য। ভালোই হলো। আপনি নিজেই এসেছেন। তাদের মুখে আপনার অনেক গুনগান শুনেছি। আমি আপনার প্রতিবেশী হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই নিন তাদের দেয়া আপনার চিঠি।

ডা. সুমিতের চোখ থেকে এই প্রথম আজ দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। তিনি তার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। মনে পড়ল: তার বাবা ডা. জুলিয়ান ব্ল্যাকের একটা উইলের কথা। এটা তার কাছে এখনো আছে। বাবার মৃত্যুর পর যেন তার দেহ ইংল্যান্ডের কোন হাসপাতালে দেয়া হয় সে দানপত্রখানার কথা। ডা. সুমিত ব্ল্যাক জানেন যে, তার মা মুশরেকা রুমি যখন নিজের দেশ ছাড়তে রাজি হননি। তখন তার বাবা স্ত্রীর প্রেমে এতই জড়িয়েছিলেন যে, নিজের দেশ ইংল্যান্ডকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। এটা প্রিয় স্ত্রী মুশরেকা রুমিকে বুঝতে দেননি ঠিকই। কিন্তু তখন বলেছিলেন এবং লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পর তার দেহখানা ইংল্যান্ডে আসবে। এখানে থাকবে। যদি কোন কাজে লাগে তখন তার জন্ম ঋণ পরিশোধ হবে।

পরেরদিন নিজের হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে বাবার কঙ্কালখানা দান করেন ডাক্তার সুমিত। সাথে দানপত্র, উইল এবং এটা যে ডাক্তার জুলিয়ান ব্ল্যাক এর কঙ্কাল তার সব প্রমাণপত্র।

শুধু নিজের বাবার নয়, একজন দেশপ্রেমিকের কঙ্কালকে স্যালুট জানাতে প্রতি সপ্তায় একদিন ডা. সুমিত হাসপাতালে গিয়ে সেই কঙ্কালের সামনে দাঁড়াতেন অবনত মস্তকে। আর এ নিয়ম তিনি রক্ষা করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত –যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। শেষ বয়সে নিজের ছেলেকে সাথে নিয়ে যেতেন। একসময় তার ছেলে তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে নিজে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেত তার দাদার কঙ্কালের সামনে। একজন দেশপ্রেমিকের কঙ্কালের সামনে।

ছায়ামানুষ
আতাউর রহমান মিলাদ

এতটুকু জানালা পৃথিবীর কতটুকু আর ধারণ করে। তিন ফুট বাই পাঁচ ফুট জানালায় বিশাল পৃথিবীকে কীভাবে আটকে রাখা যায়? জানালার বাইরে যে দৃশ্য দু'চোখ ভরে দেখেছি প্রতিদিন কি করে মুছে দিই সে অধ্যায়। মুছতে পারি না কোনোভাবে। আর পারি না বলে কষ্টের কালো ছায়া লেপ্টে থাকে আমার উঠোনে সারাক্ষণ।

তাড়া করে পাড়া ঘুরোবার দিন শেষ, কোন শক্তি ও সাহস অবশিষ্ট নেই আর। দু'চোখ এখন ঘুম পাড়ানি মাসিপিসির গান। আমার ঘরে উড়াল দেয় না সোনারঙ পাখি যখন তখন, যার ডাক শুনে মনের ভেতর অন্যরকম সাড়া পেতাম। এখন সারাবেলা বিষণ্ন সুর, বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। স্মৃতির কামড়াকামড়ি। বেলাশেষে ফিরে যাওয়া আপন গৃহে, বহুদূরে।

আমার পৃথিবী এই একটি জানালা। রেশনের মতো এই জানালাটাই আমার জন্য বরাদ্দ। সমস্ত অন্ধকারের বিপরীতে এই এক চিলতে আলোসমূহ যন্ত্রণার কেন্দ্রীভূত সুখ। জানালা আছে বলেই নিজের অস্তিত্ব টের পাই। আকাশে ঘুরে বেড়ানো মেঘের সাথে আনমনে কথা বলি, রোদভরা নির্মল আকাশের সাথে সখ্যতা গড়ি। রাতের জ্যোৎস্নাকে মেখে নেই সৌরভহীন অঙ্গে, গভীর মমতায়। চুপচাপ বসে থাকি তারাদের নীরব খেলায়। ঘরে ফেরা পাখিদের কলতানে কেঁপে ওঠে সান্ধ্যপ্রদীপ, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিই একবুক বিষণ্নতা।

জানালার টুকরো ক্যানভাসে যে চিত্র ফুটে থাকে ষড়ঋতু সময়ে সে একান্ত আমার। টুকরো টুকরো স্মৃতি ও অপূর্ণ স্বপ্নকে বহন করে জীবনটাকে বনেদী খাটে শুইয়ে রেখেছি। আসলে মরার খাটিয়ায় শুয়ে প্রতিদিন আমি কবর দর্শনে যাই। জানি, এসব খণ্ডচিত্র মুছে যাবে একদিন, শুরু হবে আঁধার সময়। অস্তিত্বহীনতার বিপরীতে ফ্যাকাশে স্মৃতিগুলো থমকে যাবে কিংবা আটকে থাকবে সময়ের ভুল বারান্দায়।

চলে আসা এবং ফিরে যাওয়ার এই খেলা হয়তো চলবে কিছুটা কাল। তারপর নিভে যাওয়া প্রদীপের নিচে গুমোট অন্ধকার।

একবার চাই মুক্তি হোক। এই বিষণ্নবেলা কেটে চিরতরে মুক্তি আসুক। প্রতিদিনের যুদ্ধের চেয়ে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া অনেক ভালো। মুক্তি চাই, তবে মনে প্রাণে চাই না। এই অর্থহীন জীবন নিয়েও বেঁচে থাকার সাধ জাগে। কিন্তু কেন? একটা পাথর জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার কিই বা প্রয়োজন! সমস্ত যুক্তি তর্কের বিপরীতে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছা ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়ায়। সে কি তবে মায়া! কার মায়া? কিসের মায়া? চারপাশে ব্যস্ত মানুষের বাস, সেখানে অথর্ব ভালোবাসা কাঁধে নিয়ে বয়ে বেড়াবার সময় কোথায় বা কার দায় ই পড়েছে। তারপরও কীভাবে আশার পুকুরে প্রতিদিন ঘাই মারে জিয়ল মাছ। ভাবি, মনে মনে সে কথাই ভাবি।

আজ তিন বছর হয়ে গেছে অক্ষম জীবনের। প্রতিটি দিন, প্রতিটি ক্ষণ আঙুলে গুণে গুণে হিসাব রেখছি। জানি না প্রতিটি মৃত্যু পথযাত্রী এভাবে হিসেব কিনা। অবশ্য জানতেও চাই না। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে এত কিছু ভাবার অবকাশ কই?

যত দিন যাচ্ছে বিছানার সাথে একটা শক্ত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পৃথিবীতে একমাত্র বিছানা-ই আপন আমার, যে আমাকে ধরে রাখে নিঃস্বার্থ মায়ায়। জানি, এই গভীরতাও বেশিদিন ঠিকে থাকবে না। সমস্ত সম্পর্কের ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে চলে যেতে হবে মহামায়ায়। ধসনামা চামড়ায় চিমটি কেটে প্রতিদিন নিজের অস্তিত্ব অনুভব করি। শ্বাস-প্রশ্বাসের গভীরতায় মেপে নেই আয়ুর কাল।

চারপাশের বিচ্ছিন্নতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোথাও কোনো পর্দা নেই। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে দুরত্ব। ছেড়ে যাবার সমূহ আয়োজন প্রায় শেষ। গতিহীন নদীর স্রোত। স্বামী, সংসার, ছেলে-মেয়ে, রোদ-বৃষ্টি, আলোছায়া, স্বপ্ন, বিবিধ চেনাপরিধি ছোট হয়ে আসছে। হাতের মুঠো থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সঞ্চিতসময়ের বেলুন। চোখ জুড়ে মৃত্যু ঘুম। চোখ খুলে তাকাবার সাহস নেই। চারপাশে ঝাপসা জগৎ। বন্ধনহীন দুবাহু শুধু অসম্পূর্ণ জীবনের ব্যর্থতা কুড়ায়।

ডাক্তার ও পথ্যের উপদ্রব বেড়েছে খুব। মৃত্যু ও জীবনের রশি টানায় মাঝপথে হাঁপিয়ে উঠি। এতো ধকল শরীর নিতে পারে না, সহ্য হয় না। একেকবার মনে হয় ঘোষণা দিয়ে মৃত্যুবরণ করি। মৃত্যু যখন অবধারিত তখন আনুষ্ঠানিক মৃত্যুর পথটা একেবারে মন্দ নয়। চোখ বুজলেই ওপারের ডাক শুনতে পাই। সময় অসময়ে সে ডাক শুনি, চেষ্টা করেও উপেক্ষা করতে পারি না। বুঝতে পারি না অর্ধসমাপ্ত খোয়াবের ভাষা, পাড়ভাঙ্গা নদীর তীব্র আর্তনাদ।

বয়স যখন কুড়ি, তখনই বিয়ে হয়ে যায় ছয় বছরের বড় নিহালের সাথে। না, কোন প্রেমঘটিত ব্যাপার নয়, বাবার পছন্দের মানুষ। ভাবীদের কাপড়ের ফাঁক ফোকড়ে সামান্য দেখা, এই যা। অবশ্য নিজের পছন্দের তালিকায় এমন কেউ ছিল না যার জন্য আঁচল পেতে রাখব। বাবার উপর সবসময়ই অগাধ বিশ্বাস ছিল বলে সহজেই তার পছন্দকেই মেনে নিই।

একজন অচেনা মানুষকে নিয়ে মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলাচল যে ছিল না এমন নয়। চেনা জানার সুযোগও ছিল না। ওর চোখে একবার চোখ রেখে দেখেছিলাম নির্ভরতার ছায়া। ব্যস এটুকুই। সাহসে ভর করে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম দাম্পত্যের দলিলে। একেবারে শংকামুক্ত ছিলাম সেটা বলব না। সে আমাকে ঠকায়নি, দীর্ঘ পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনে আলোড়ন তুলেছে, সে নিহাল। স্বামী-স্ত্রীর বাইরেও আমরা বড় বন্ধু, বিশ্বস্ত সঙ্গী। একে উপরের আকাশে উড়তে পারি শর্তহীন। হাতে হাত রেখে শুনেছি সূর্যাস্তের গল্প, সূর্যোদয়ের আশ্বাসে। মধুময় স্মৃতির ভেতর বেড়ে ওঠা নাহিদ ও নাদিয়া। দু'জনের যৌথ অভিলাষ ঘুরপাক খায় ওদের ঘিরে। ওরা আমাদের ঘিরে রাখে আরো কাছে, নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায়।

ভালোবাসার দায়বোধ নিয়ে বেঁচে থাকা কষ্টের। তিনটা বছর থেকে খাটে শুয়ে আছি পাথরের ভার নিয়ে। অসম্পূর্ণ স্বপ্নবোধ ও ভিন্নতর ভালোবাসায়। বিছানা ছেড়ে আর উঠে দাঁড়াব না নিহালের কাঁধে ভর দিয়ে। ঘুরে বেড়ানোর দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন এই চতুর্ভুজ খাটেই জীবনের সমস্ত লেনদেন, নোনাজলের নির্মম নিয়তি।

নিহাল আমাকে ভালোবাসে আজও। আমি তার প্রতিদান দিতে পারি না। অক্ষমতার শেকলে বাঁধা আমার হাতপা। বুঝতে পারি, একমুখি ভালোবাসা করুণায় রূপ নিচ্ছে দিন দিন। দু'য়ের মিলনেই তো ভালোবাসা বেঁচে থাকে। একরোখা স্রোতের বিপক্ষে নিজেকে ধরে রাখার শক্তি নেই আমার। নিহাল আমার অক্ষমতাকে অসম্মান করে না। বৈকল্য দিনে তার কাছ থেকে এখনো সমান ভালোবাসা পাই। এ আমার পরম সৌভাগ্য।

প্রতিদিন আমি যে জীবন কল্পনা করি কিংবা কামনা করি তাকে ধরে রাখতে পারি না, হাতের তালুতে অথবা ঘরের দেয়ালে টাঙানো ফুলতোলা ফ্রেমে। পর্দার আড়ালে দাঁড়ানো অশুভ ছায়াপথ আগলে দাঁড়ায়। নিজের দীর্ঘ ছায়া দেয়ালে দেখে কেঁপে ওঠে মন। খসে পড়ে টিকটিকির লেজ। ছায়াকে আমার ভয়, সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে প্রতিনিয়ত। ক্রমশ হয়ে উঠছি ছায়ার মানুষ। জানি, এই ছায়াই আমাকে গিলে

খাবে একদিন। ছায়াকে এড়িয়ে যেতে চাই, আমাকে ছাড়ে না। ছায়ারা প্রতিধ্বনি তুলে বিকৃত স্বভাবে।

একদিন মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে নিহালকে খুঁজে পাই না হাতের কাছে, নির্ধারিত বিছানায়। ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে রাখা ঘড়িতে চোখ রাখি। রাত আড়াইটা। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা পার হয়, নিহাল ফিরে আসে না। আমাকে চাবুক মারে নিঃশব্দ রাত। প্রার্থনা করি প্রার্থিত মানুষের সান্নিধ্য। ডিমলাইটের মৃদু আলো কাঁপা কাঁপা স্বভাব উসকে দিচ্ছে ভেতরের সজারু চোখ।

রাতের শেষ ভাগ। ঘুমহীন কাতর চোখ নিশ্চুপ, মিশে আছি লেপ তোষকের নিবিড়তায়। নিজেকে মেলে ধরতে চাই, আড়ষ্টতা আঁকড়ে ধরে। বাইরে পাতা ঝরার শব্দ, শিশিরের ছন্দতে টিপটিপ, কেঁদে কেঁদে ওঠা আহত পেঁচার আর্তনাদ, তবু নিজেকে লেপ্টে রাখি নির্দিষ্ট জায়গায়। ভয়ে চোখ খুলি। চোখ যায় সামনের কক্ষের আধখোলা দরজার ফাঁকে। উৎসুক চোখ মেলে দেখি মাথাটা কাত করে। একটা ছায়া দীর্ঘ হতে থাকে, আরেকটা ছায়া আলতো করে সেই ছায়াটার পাশে দাঁড়ায়। ছায়ারা মিশে যায় ক্রমে। ছায়ারা আলগা হয়। মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমার ভয় বাড়ে, হারাবার ভয়। চোখ বন্ধ করে রাখি। ছায়াকে আমার ভয়।

নির্দিষ্ট সময় পরে নিহাল ফিরে আসে, আলগোছে শুয়ে পড়ে আমার পাশে। আমি তাকে চিনতে পারি না। পনেরো বছরের যৌথ জীবন উপহাস করে। মনে হয় পরপুরুষের সাথে শুয়ে আছি। মধ্যিখানে মৃত আরশোলা। দুহাতে সরিয়ে নিতে চাই অবাঞ্ছিত জঞ্জাল। একটি অসামাজিক ভোরের প্রতীক্ষায় চোখ বন্ধ করে রাখি। জানি ভোর হবে, সূর্য উঠবে, নিয়মমাফিক আলোয় ভরে উঠবে অন্যরকম সকাল। একটি ছায়াচিহ্ন নিয়ে আমি সরে যাব আলো থেকে, পরিচিত জগতের চেনা আঁল থেকে।

কাম ও পাপের কাছে মানুষের অসহায় রূপ আমি দেখেছি ছায়াচিত্রে, বিদ্যুতের আধমরা আলোয়। একপাটি খোলা দরজায় যা দেখেছি, খুলে দিয়েছে মনের দরজা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনের সাথে অবিরাম যুদ্ধ করেছি। হেরে গেছি। নিহাল জানল না আজ রাতে কী লেখা হলো ডাইরিতে, কী দেখা হলো কৃষ্ণপক্ষেও চাঁদের বুকে। মানুষের অন্ধকার রূপধারণ করে ঘুমিয়েছি অবিশ্বাসের অবিন্যস্ত খাটে।

ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত নিহালের চোখে তৃপ্তির ঘুম দেখে ঘৃণা করেছি নিজেকে, নিজের অক্ষমতাকে, অযোগ্যতাকে। নির্লজ্জ বাসনার যে আগুনে পুড়ে গেল বন্ধনের শাড়ি, তাকে গায়ে জড়িয়েছি মুগ্ধতায়। ব্যর্থতার সকল গান একান্তই আমার। এই কালো

রাত্রির আদিমতা বুকে জমা রেখে ক্ষমা করি নিহালকে। কষ্ট পেলেও তার বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই।

কাজের মেয়ে জরিনা আঠারো পেরিয়েছে ক'দিন হলো। ওর বয়স যখন দশ তখন আমার বাবা ওকে নিয়ে আসেন সংসারের কাজে একটু সাহায্য-সহযোগিতার জন্য। সেই থেকে সে এ সংসারের একজন। জরিনাকে লালন-পালন করেছি মেয়ের মতো। বেড়ে ওঠায় কোন ত্রুটি করিনি। বাবা ওকে আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, 'মা মরা মেয়ে, একটু দেখে রাখিস নীলু।' বাবার কথার যথার্থ মুল্য দিয়েছি। ওর মায়ের অভাব বুঝতে দিইনি কখনো। বড় করেছি সন্তানের মায়ায়। এ নিয়ে অনেকের বাঁকাত্যাড়া অনেক কথা শুনতে হয়েছে। যে মেয়েটা মুখভরে মা বলে মা বলে ডাকে তাকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করার সাহস হয়নি। সেই জরিনা চোখের সামনে আঙুল দিয়ে বড় হয়ে গেছে টেরই পাইনি। মনে হয় ভালোবাসার চোখ অন্ধই হয়। ফ্রকের বয়স পেরিয়ে সে এখন শাড়িতে জড়িয়ে রাখে যুবতী শরীর। আমি তার ঘরময় ঘুরে বেড়ানোর ছায়াসঙ্গী হই। ফিরে যাই পনেরো বছর পূর্বে, যেদিন নিহালের হাত ধরে এ ঘরে পা রাখি। দেহে যৌবন ছিল, মনে ছিল গান, প্রাণে খোলা আকাশ। পৃথিবীজুড়ে ছিল স্বপ্নের জোটবদ্ধ ঢেউ।

জরিনাকে দেখলেই আমার পিছনে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। বিগত সময়ের সুখস্মৃতি নেড়েচেড়ে দেখার তৃষ্ণা বাড়ে। কিন্তু কেন? আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে পিছনের অনেক কিছুই দেখা যায় না। আবছা অন্ধকার, অস্পষ্ট। অশুভ ছায়া ঢেকে রাখে সুখস্মৃতি। নিজে রূপান্তরিত হই ছায়া মানুষে। জীবনে এত বেশি ছায়ার ছড়াছড়ি, আলোর দেয়াল পেরিয়ে ক্রমাগত অন্ধকারে যাত্রা। জানি এই অন্ধকারই গ্রাস করে নিবে জীবনের তপ্ত নিঃশ্বাস, সৌখিন নখপলিশ, কপালের লাল টিপ, হাতে মেহেদির কারুকাজ।

যতই সময় যাচ্ছে জরিনা ফুটে উঠছে সৌন্দর্যের দারুণ অহংকারে। একদিন নিজ হাতে ওকে নিখুঁতভাবে সাজাতাম, নিজের পছন্দমতো। আজ নিজেই ফুটে উঠছে মোহনীয় রূপে। তার এই সৌন্দর্যকে আমি সহ্য করতে পারি না, ঘৃণা হয়, ভয় হয়। কিন্তু কেন? ওতো আমার মেয়ের মতো। মেয়ের সৌন্দর্যে মা খুশি হবার কথা! কেন ওর রূপ মাধুর্যে খুশি হতে পারি না? তিলে তিলে ওকে তো আমি গড়ে তুলেছি। তার মাঝে আমার ঠোঁট, চিবুক, উষ্ণ করতল, আবর্তিত হতে দেখি। যত্ন করে রাখা পছন্দের শাড়িগুলো ওকে পরতে দিই। সে আমার যৌবনকাল ধারণ করে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়ায়। পাখি হয়ে ওড়ে, শিস দেয়। রাতের আকাশে বন্দনা করে

চাঁদের। আমার জীবনের অনধিকারে সে আলোকিত হয়, যে আলো কুড়িয়েছি পনেরো বছরের বিশ্বস্ততায়, ভালোবাসার বুকভেজা জলের মায়ায়।

মাঝরাতে নিঃসঙ্গ দীর্ঘশ্বাসগুলো দেয়ালে আঘাত পেয়ে ফিরে আসে আমার কাছে। হৃদয়ে বাজে করুণ সুর, এ যে জীবনের আবহ সঙ্গীত। মাথার উপরে ঝুলে থাকা সিলিংফ্যানের কোমল বাতাস উসকে দেয় মনের গহীনে চাপাপড়া আগুন। আদিম আঁধারে ডুবে যেতে থাকি প্রতিদিন। ফ্যাকাশে চায়ের মতো গোধূলি সন্ধ্যায় যে রাখাল ফিরল না মাঠ থেকে তার হিসাব রাখবে কি গৃহস্থ পুরুষ? স্বার্থহীন ভালোবাসা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে না। কখন কোন ফাঁকে এর মৃত্যু ঘটে কেউই টের পায় না, যখন পায় তখন ভালোবাসা বলে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।

আমি এখন ছায়ার সাথে বাস করি। আমাকে অতিক্রম করে ছায়ার মানুষ। নাটকের শেষ দৃশ্যে আমি হারতে চাই না। চোখ থেকে সরাতে চাই ঘুমের পর্দা, পারি না। সংশয়ে কাটে সময়, আড়ালের ভাষা যদি সত্যি হয়ে যায়! গিলে খায় আমাকেই। মাথার উপর ঝুলছে মাকড়সার জাল, আমার কোন স্বপ্ন বোনা নেই।

আমি কেন লিখে রাখি এসব অসফল ভ্রমণচিত্র! কী হবে এসব লিখে রেখে? আমি তো বাতিল মুদ্রা পড়ে থাকি ড্রয়ারের কোণে। চোখ পড়লে কেউ নেড়েচেড়ে দেখে, আবার রেখে যায় নির্ধারিত স্থানে। প্রয়োজনের বাইরে মানুষ কিছুই ধরে রাখতে চায় না। সময়কে পূজো করে। আমি কিছুই চাই না। শুধু চাই, আমার ব্যর্থতাকে ক্ষমা করুক নিহাল। আমি যা দিতে পারি না তাকে তা কুড়িয়ে নিতে হচ্ছে। এ ব্যর্থতা আমার। আমার সুখ আমার ঈর্ষা, আমার অসুখ আমার ঈর্ষা।

বাবা আমার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করেন, ‘কেমন আছিস মা?’

উত্তর দিতে পারি না। জানা নেই। অক্ষমতার দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে অজান্তে। বাবা কি বুঝতে পারেন এই অশ্রুর ভাষা? বাবাকে শক্ত করে ধরে রাখি। সারা জীবনের নির্ভরতার হাত।

দরজা ঠেলে নিহাল ঘরে ঢুকে। অশ্রুভেজা ঝাপসা চোখে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই না। পনেরো বছর ধরে চেনা মানুষটিকে চিনতে পারি না। কষ্ট হয়। মনে হয় এ যেন ছায়া মানুষ।

দুঃস্বপ্নের দীর্ঘ বৃত্তান্ত

মাসুদা ভাট্টি

আকাশে দানোর মতো মেঘেরা ছুটে যাচ্ছে দিগ্বিদিক, মাটিতেই বাতাসের ভীষণ বেগ, আকাশে নিশ্চয়ই তারও বেশি।

খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর কোনো ভাবনায় ডুবে ছিলেন সৈয়দ আল-ফাইয়াজ। পেশায় তিনি দেশের অন্যতম বিখ্যাত মনোচিকিৎসক। যিনি মনে করেন, মনোবিজ্ঞান বলে আসলে কিছুই নেই, সবই এ্যানাটমি অথবা সার্জারির বইয়ের মতো অবশ্যপাঠ্য চিকিৎসাশাস্ত্র। মনোবিজ্ঞানী বলে যাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয় তারা নিতান্তই মূল্যহীন, আর কিছু পড়ার সুযোগ হয়নি বলে সাইকোলজি পড়েছিলেন এবং এখন ছাত্র পড়িয়ে দিন চালাচ্ছেন। তার এই অবস্থানের কথা তিনি প্রকাশ্যেও বলেন, কিছু লোক তাকে এড়িয়ে চলেন, কেউ কেউ তাকে পিছনে গাল দেয় আকাট বলে, কিন্তু কেউই তাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। কারণ সৈয়দ আল-ফাইয়াজ ডাক্তার হিসেবে খুব ভালো।

বরিশালের নদীধোয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ওদের জমিদারি ছিল এককালে। তিনি নিজেও ছোটবেলায় দেখেছেন সেই জমিদারি। তারপর ক্ষয়েবয়ে গেছে সবকিছু। কিন্তু তাও যা থেকে গেছে সেটুকুও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট, খাচ্ছেও ওদের পরিবারের একাধিক পুরুষ। এই পরিবারে অবশ্য নারীদের কোনো ভাগ নেই, তারা জন্মায়, বড় হয়, তারপর চলে যায় পরের বাড়িতে। যাওয়ার সময় তাদেরকে যথেষ্ট দেওয়া হয়, কিন্তু সেটুকুই, এর বেশি এই পরিবারে আর তাদের কোনো বক্তব্য থাকে না কোনো কিছুতেই। আল-ফাইয়াজ যখন লন্ডনে পড়তে যান, সেই ষাটের দশকে তখন তার চাচাতো বোন কুদরতি নূর তার চেয়েও ভালো ফলাফল করেছিলেন কলেজ ফাইনালে। জেঁদ ধরেছিলেন তিনিও যাবেন ঢাকায় লেখাপড়া করতে কিন্তু সৈয়দ আল-ফাইয়াজই সে পথ বন্ধ করেছিলেন, তখনো তাদের যৌথ পরিবার ছিল। তিনি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ছিলেন, যেখান থেকে পাস করেই

তিনি লন্ডনে যান মনোচিকিৎসক হতে। দীর্ঘদিন সেখানে লেখাপড়া ও কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফেরেন, দেশ তখন স্বাধীন। এসেই জাঁকিয়ে বসতে অসুবিধে হয়নি, তার পরিবারের অনেকেই তখন সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। তিনিও ঢুকে গেলেন সরকারি হাসপাতালে। তারপর তো নিজেই একটি বিশাল মনোরোগের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলেন। এই যে বরিশালে তাদের সাবেকি বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশ ভরা মেঘের ছুটোছুটি দেখতে দেখতে সৈয়দ আল-ফাইয়াজ তার অতীতচারণ করলেন, তাতে কোথাও কোনো ফাঁক নেই, ভুল নেই– সবই নিপাট, দাগহীন।

এখানে এলে আর ঢাকায় ফিরতে ইচ্ছে করে না তার। তিনি কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না বড় বেশি। তার সার্বক্ষণিক সেবক আছে সরফরাজ, বহুদিন ধরেই তার সঙ্গে আছে। টিকে গেছে কেমন করে সে এক বিস্ময় যদিও। কিন্তু আছে। তার সকল কাজেই সরফরাজকে সব সময় পাওয়া যায়। সে রাত গভীর হোক কি ঊষাকাল হোক। স্ত্রী আর কন্যার সঙ্গে তার বনিবনা নেই, তারা গুলশানে তার দুই বিঘা জায়গার ওপর বানানো বাড়িটির অর্ধেকে নিজেদের মতো করে তাদের নিবাস গড়ে নিয়েছে। তিনি যেটুকুতে থাকেন, সেটুকু সাবেক আমলের, একটু সাহেবি বাংলা মতোন। ওপরে নীচে দু'জায়গাতেই টানা বারান্দা, বড়সড় বসার ঘর, দৃষ্টির বাইরে থাকা রান্নার জায়গা আর প্রতিটি কামরার সঙ্গে লাগোয়া শৌচাগার। স্নানের জন্য আলাদা জায়গার সুযোগ পরে তৈরি করতে দিতে হয়েছে, না হলে চলে না। বাড়ির কাছেই আরেকটি জায়গা তার দখলে আছে সেই পাকিস্তান আমল থেকেই। ইদানীং মামলা চলছে জায়গাটি নিয়ে, পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া জায়গা বলে একাধিক ব্যক্তি এই জায়গার দখল চাইছে। কিন্তু তার কাছে পাকা কাগজপত্র আছে, আদালতও সেটা মানতে বাধ্য হয়েছে। তাছাড়া এখানেই তিনি দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে রোগীর সেবা দিয়ে চলেছেন। নিজস্ব হাসপাতালের বাইরে এটাও তার রোগি দেখবার জায়গা। এ দেশকে মনোরোগ বুঝতে শিখিয়েছেন তিনি, না হলে এ দেশে মনোরোগ বুঝতো কে? এ কথা ভেবে বহুবার সৈয়দ আল-ফাইয়াজ বাঙালি জাতির চৌদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করেছেন মনে মনে, কারণ বাঙালি সেটা স্বীকার করতে চায় না। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারাদি তাকে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু তাতে কি, স্বীকৃতির তো শেষ নেই। বয়স হয়েছে তার, সময় ফুরুচ্ছে বটে কিন্তু তার সঙ্গে স্বীকৃতির কোনো সম্পর্ক নেই।

সরফরাজ তাকে ডাকতে এসেছে, বাজ পড়ছে চারদিকে। আজকাল বাজ পড়ে মৃত্যু হচ্ছে মানুষের আকছার। এতো মৃত্যুর খবর এর আগে কখনো শোনা যায়নি। যদিও

এতো খবরের দৌরাত্ম্যও আগে ছিল না। কিছু হতে না হতেই খবর হয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়াই যে মানুষের মনের ভেতর সবচেয়ে বড় অসুখটি তৈরি করে দিচ্ছে সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত সৈয়দ আল-ফাইয়াজ। তিনি যখনই কোনো মিডিয়ার মানুষকে পান তখনই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন কিন্তু কে শোনে কার কথা। এই আরেক সমস্যা, এ দেশে কেউ কারো কথা শোনে না। সবাই সবকিছু বোঝে। কিন্তু তাদের আমলটা এমন ছিল না। তিনি সেই পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের কথা বলছেন। সময়টা আরো অনেক বেশি সম্মানজনক ছিল। তখনো ঢাকা অনেক দূরের কোনো শহর ছিল, সেখানে সবাই যেতে পারত না, যেতে পারলেও টিকে থাকতে পারত না। শুধু তারাই পারত যাদের এই বরিশালে কিংবা অন্য কোথাও থেকে ঢাকায় টিকে থাকার মতো রসদ সরবরাহের মতো জায়গা ছিল। এখন তো ঢাকা কি, লন্ডনেও নাকি মানুষে সপ্তাহে সপ্তাহে যাওয়া আসা করে। অথচ লন্ডনে তিনি যখন পড়তে গিয়েছিলেন তখন ক'জন লন্ডন শহরের নাম জানত? হ্যাঁ, বিলেত বলে তখন এই দেশের বাইরের যে কোনো দেশকেই মানুষ বোঝাত। দিন কত বদলে যায়, এক জীবনেই সেটা দেখলেন সৈয়দ আল-ফাইয়াজ।

ছুটি শেষ, এবার ফিরে যাওয়ার পালা। না, কেউ তাকে ছুটি দেওয়ার নেই, তিনি নিজেই নিজেকে ছুটি দেন। বরিশালের এই বাড়িতে এসে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে ফিরে যান ঢাকায়। আজকাল আর বিদেশে যান না খুব একটা। ডাক্তার দেখাতে অবশ্য যেতেই হয়, এ দেশের ডাক্তারদের ওপর তার কোনোই আস্থা নেই। যারা পেটের ভেতর গজ-ফিতে রেখে সেলাই করে দেয় তাদের ডাক্তারিবিদ্যে নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কই তাদের আমলে তো এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি? এখন ঘটে কেন? ঘটে কারণ, এখন সবকিছু ভেঙেচুরে গেছে, কেউ এখন আর কাউকে মানে না। সবাই সবাইকে অগ্রাহ্য করে। এ এক অদ্ভুত সময়। লঞ্চের কেবিনে শুয়ে শুয়েও সৈয়দ আল-ফাইয়াজের এ কথাটিই মনে হলো বার বার। ঢাকায় এসে আবার সেই পুরানো রুটিনেই ফিরে গেলেন তিনি, নিজের জীবনে তিনি খুব বেশি অদল-বদল আনেননি কোনোদিন, বদল তার পছন্দ নয়।

তার কাছে যেসব রোগী আজকাল আসে তাদের প্রত্যেকেই মূলত তার হাসপাতাল কিংবা বড় সরকারি হাসপাতালগুলো থেকে তারই ছাত্রদের রেফার করা। তিনি রোগী দেখেন যত্ন করে, সময় নিয়ে। দিনে মাত্র দু'জন কি তিনজন রোগী দেখেন, সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা। এই দু'ঘণ্টা। তার অফিস সহকারী অমলেন্দু দে, বয়স হয়েছে অনেক, যদিও তার চেয়ে একটু ছোটই হবেন অমলেন্দু, কিন্তু তিনি তাকে এখনও ছাড়িয়ে দেননি। ওই যে, তিনি বদলাতে পারেন না কিছুই।

প্র্যাকটিস-কার্যালয়ে ঢুকেই তিনি এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করেন। তারপর এককাপ চা চেয়ে নেন, ততক্ষণে সাড়ে ছ'টা বেজে যায়। প্রথম রোগি পাঠিয়ে দেন অমলেন্দু। প্রাথমিক যে সকল তথ্য জানা দরকার সেগুলো অমলেন্দুই জেনে নিয়ে লিখে দেন। এজন্য ছাপানো প্রশ্নাদি আছে, সেখান থেকেই অমলেন্দু রোগীর কাছ থেকে জেনে নিয়ে সেগুলোর উত্তর বসান। অমলেন্দুর হাতের লেখাটি স্পষ্ট। ইংরেজি জ্ঞানও যথেষ্ট ভালো। ঝকঝকে অক্ষরে কোনো রকম কাটাকাটি ছাড়া উত্তরগুলো পাঠে সৈয়দ আল-ফাইয়াজের আনন্দ হয় খুউব।

নাম: কামালুদ্দিন।
বয়স: ৫৫
পেশা: ব্যবসায়ী
বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত, একটি সন্তান
রোগের বর্ণনা:

প্রতি রাতে একই দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠছেন, গলা শুকিয়ে যায়, কয়েক গ্লাস পানি পানেও তৃষ্ণা মেটে না। তারপর আর ঘুম আসে না। ঘুমের ওষুধ খেয়েও না।

: বসুন কামাল সাহেব। কামাল উদ্দিন না লিখে আপনি নিজের নাম কামালুদ্দিন লেখেন কেন?
: আব্বা এভাবেই শিখাইছিলেন।
: আব্বা বেঁচে নেই তো?
: জ্বি, নাই।
: বলুন, আপনার স্বপ্নের কথা শুনি।
: আমি প্রতি রাতে ঘুম আসা মাত্র স্বপ্ন দেখি যে, আমার মুখে কেউ থুতু মারছে আর কেউ আমার মুখে দুই হাত দিয়ে সমানে থাপ্পড় মারতেছে। মিনিট খানেকের মধ্যেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, আর ঘুমাইতে পারি না ডরে।
: কবে থেকে এই স্বপ্ন দেখেন?
: অনেক দিন হয়ে গেল। বছর সাতেক বা তার বেশি হবে।
: এতদিন আসেননি কেন?
: বিভিন্ন জায়গায় গেছি, আপনার কথা জানতাম না।
: কিসের ব্যবসা করেন?
: গার্মেন্টস আছে। একটা দিয়া শুরু করছিলাম, এখন নিজের দুটা আর অর্ডার বেশি হলে পার্টনারের কারখানায় কাজ করাই।

: ব্যাংক লোন আছে?

: জ্বি আছে।

: সে কারণে কি দুশ্চিন্তায় ভোগেন?

: না, লোন তো নিয়েছি অনেক আগেই, কই তখন তো এরকম স্বপ্ন দেখছি বলে মনে পড়ে না।

: ব্যবসায় এমন কোনো অসুবিধা, যা আপনাকে ঘুমাতে দেয় না?

: না, ব্যবসা তো ভালোই চলছে।

: স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

: সম্পর্ক ভালো। দুই ছেলে স্কুলে পড়ে, তাদেরকে সঙ্গে দিয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়েছি কানাডায়। বছরে দু'বার ওরা আসে আর আমি সময় পেলেই যাই ওদের দেখতে।

: যৌন-জীবনতো তাহলে আপনার নিয়মিত নয়। তাই না?

: আমার সেসব সমস্যা নাই।

: আপনার তো কোনো সমস্যাই নেই, আপনি বলছেন। তারপরও আপনি দুঃস্বপ্ন দেখছেন। স্ত্রীর বাইরে আর কারো সঙ্গে সম্পর্ক আছে? তাকে নিয়ে পরিবারে অশান্তি হচ্ছে?

: সম্পর্ক আছে কিন্তু পরিবারে তা নিয়ে অশান্তি নেই। কারণ স্ত্রী এ বিষয়ে জানে না। তার এসব বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা নাই।

: তিনি আপনার ব্যাপারে নিস্পৃহ কেন এতো?

: মেয়েছেলের বাচ্চা-কাচ্চা হওয়ার পর তাদের প্রথম প্রায়োরিটি হয় সন্তান, স্বামী গৌণ হয়ে যায়। তাকে আমি অসুখী রাখি নাই। সেও সুখেই আছে।

: সেটা তো আপনি বলছেন। তার সঙ্গে কথা বলে হয়তো অন্যরকম উত্তর পাওয়া যাবে।

: আপনি চাইলে কথা বলতে পারেন। এরপর যখন আসবে তখন পাঠায়ে দিবো আপনার কাছে।

: ঘুমাতে যান কখন?

: বেশি দেরি করি না। ধরেন এগারোটা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়ি।

: মদ্যপানের অভ্যাস আছে?

: জ্বি সামান্য। আগে বেশি খাইতাম। এখন কমায়া দিছি। ডাক্তার মানা করছে। শরীর খারাপ হইয়া যায়। ঘুম কম হয়। তাই কমাইছি। তাছাড়া আর খুব বেশি ভালোও লাগত না। বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পরে খাইতাম।

: বাহ্, খুব দ্রুত একটা খারাপ অভ্যেস ছাড়তে পেরেছেন।
: পুরা ছাড়তে পারি নাই, তবে পারব ইনশাল্লাহ্।
: তার মানে আপনার মনের জোর আছে, আমি সেটা জানি।
: জ্বি। আমি মনের জোরেই এতোটা পথ আসতে পারছি।
: আপনার ভেতর কোনো ভয় কাজ করে? কোনো অন্যায় করেছেন কিংবা অতীতের কোনো কাজ থেকে অনুশোচনা?
: না, আমি অন্যায় করি নাই। ব্যবসায় কত কিছু করতে হয়। সেইগুলারে আমি অন্যায় মনে করি না। লাভের জন্য মানুষ কত কিছু করে। আমিও করি। সেরকম কোনো কাজের জন্য আমার কোনো সমস্যা হয় নাই এখনো।
: বেশ। শারীরিক আর কোনো অসুবিধে? ধরুন গিয়ে আপনার স্ত্রী-সঙ্গমে কোনো সমস্যা?
: না, তেমন কোনো সমস্যা হয় না। এই বয়সে যতটুকু দরকার তার চেয়ে বেশিই ভালো। প্রথমবার অল্পক্ষণ টিকতে পারি, তারপরের বার যতক্ষণ ইচ্ছা চালায়ে যাইতে পারি।
: হুম, তার মানে তো আপনি ঠিকই আছেন।
: স্বপ্নটাকে একটু বিস্তারিত বলুন তো শুনি আবার।
: এই যে ধরেন, ঘুম আসার ঘণ্টা খানেক পরেই স্বপ্নটা আসে মনে হয়, কারণ যদি আমি সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘুমাই, তাইলে স্বপ্ন দেইখা জাইগা উঠলে ঘড়িতে দ্যাখা যায় দেড়টা-দুইটা বাজে। প্রথমে মুখের ওপর হঠাৎ একটা পানির ছিটা মতোন আইসা লাগে। তারপর হাত দিয়া সেইটা মুছতে গেলেই গন্ধটা আইসা নাকে লাগে, ছ্যাপের গন্ধ, নিজের না, অন্যের ছ্যাপের গন্ধ, নিজেরটা তো টের পাওয়া যায় না, অন্যেরটা টের পাওয়া যায়। তারপর আচমকা কেউ সামনে দাঁড়ায়ে সমানে আমার দুই গালে চড় মারে। থামে না, চড় মারতেই থাকে। এ্যাতো তাড়াতাড়ি মারতে থাকে যে আমার হাত দিয়া ঠেকাইতে গেলেও পারা যায় না। এক সময় ঘুমটা ভাইংগা যায়। নাকে তখনও ছ্যাপের গন্ধ টের পাই।
: কতোক্ষণ থাকে গন্ধটা?
: বেশিক্ষণ না, কিন্তু একটা অস্বস্তি ঠিক থাকে, মনে হয় বার বার গিয়া মুখ ধুই। আর ঘুম আসে না।
: চড়টা কে মারে? তাকে চিনতে পারেন? কোনো মানুষের অবয়ব দেখতে পান কি?

: না, পাই না। শুধু চটাস চটাস চড় পড়ে দুই গালে। কাউকে সামনে দেখতে পাই না। দেখতে পাইলে তো তারে মারার কথা ভাবতাম, আমি তো শুধু ঠেকাই, দুই হাত দিয়া চড় ঠেকানোর চেষ্টা করি।

: হুম কখনও ঘুমের ওষুধ খেয়ে দেখেছেন?

: জ্বি, এমনিতেই ঘুমানোর জন্য ডাক্তার আমারে ঘুমের ওষুধ দিছিলেন। ডাবল ডোজ খাইয়াও দেহি একই ঘটনা ঘটে।

: ঘাম হয় তখন?

: সব সময় হয় না। কখনো দেখি ঘাম হচ্ছে না। আবার দেখি ঘামে শরীরটা চুপচুপা হয়া গেছে।

সৈয়দ আল-ফাইয়াজ কী যেন ভাবলেন এরপর। সোনার জলে নিজের নাম ছাপানো প্যাড নিয়ে তাতে খস্‌খস্‌ করে লেখেন কিছু একটা, তিনি এখনও দামি ঝর্ণা কলম ব্যবহার করেন। রোগী দেখার সময় তিনি স্যুট পরে থাকেন। টাই না থাকলেও পকেটে রুমাল গোঁজা থাকে। তিনি কাফলিং লাগানো শার্ট পরেন, সব লন্ডনের একটি বিশেষ দোকান থেকে কেনা। এখন এ দেশে এসব পাওয়া গেলেও তিনি সেখান থেকে কেনাটা পছন্দ করেন না। লন্ডনের দোকানে এখন ই-মেইল করে দিলেই ওরা পাঠিয়ে দেয়, তার আগে তারা তাকে ক্যাটালগ পাঠিয়ে দেয়, যাতে তিনি সেখান থেকে পছন্দ করে নিতে পারেন। গত কুড়ি বছরে তার শরীরের মাপের কোনো হেরফের হয়নি।

: এই নিন। কয়েকটা টেস্ট লিখে দিয়েছি। এগুলো করিয়ে আসবেন আগামি সপ্তাহে। অমলেন্দুর কাছ থেকে তারিখ জেনে নেবেন।

: কোনো নির্দিষ্ট সেন্টার থেকে করাবো টেস্টগুলো?

: না, আমি কোনো নির্দিষ্ট টেস্ট সেন্টারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করি না। আপনার যেখান থেকে ইচ্ছে সেখান থেকেই করাবেন। তবে খোঁজ নিয়ে জেনে নেবেন যে, কোন্‌টা আজকাল ভালো করছে।

: তাও আপনি যদি বলে দিতেন, ভালো হতো না?

: আমি সে কাজ করি না। অমলেন্দুকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। ও হয়তো আপনাকে বলে দেবে কোনটা কোনটা থেকে করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। অমলেন্দুও আপনাকে নির্দিষ্ট কোনো সেন্টারের নাম বলে দেবে না, ওকেও এ ব্যাপারে কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে। ও বড় জোর আপনাকে একটা লিস্ট ধরিয়ে দেবে। যান, লিস্টটা নিয়ে যান। আর দুটো ওষুধ লিখে দিয়েছি,

আপনি একেবারে বিছানায় যাওয়ার আগে একটা খাবেন। আর যদি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠে দেখেন যে, আর ঘুম আসছে না, তবে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করতে পারেন, ছাদে যেতে পারেন, সেখান থেকে ফিরে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করবেন এবং আবার বিছানায় গিয়ে, বিছানায় বসেই এই ওষুধটা খাবেন। ডোজটা কড়া। একটার বেশি কোনো ভাবেই খাবেন না। ঠিক আছে?

: জ্বি থ্যাঙ্ক ইউ। আপনার ফিসটা?

: কেন অমলেন্দু আপনাকে বলে দেয়নি?

: জ্বি দিয়েছে। তবে আপনাকেও জিজ্ঞেস করে নিলাম।

: যে কথা আপনাকে বলে দেওয়া হয়েছে সেকথা আবার জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমার এখানে দু'রকম ফলাফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আসুন আপনি।

ভদ্রলোক উঠে যাওয়ার পর, সৈয়দ আল-ফাইয়াজ তার নিজস্ব নোট বই নিয়ে বসেন। ছোট ছোট অক্ষরে ইংরেজিতে লিখে রাখেন অনেকগুলো প্রশ্ন। সেগুলোর পাঠোদ্ধার আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। খুব নিবিষ্ট চোখে তাকালে বোঝা যায়, 'হোয়াট ইজ ড্রিম?' প্রশ্নটি এবং সেটা 'এ' অক্ষরে নম্বর দেয়া। কিন্তু এই প্রশ্নটি থেকে একাধিক প্রশ্নের উল্লেখে দেখা যায় নম্বর দেওয়া হয়েছে রোমান হরফে। একটা বেশ বোধগম্য ডায়াগ্রাম আঁকা হয়েছে। ইংরেজি সংখ্যায় নাম্বার দিয়ে। সেখানে কামালুদ্দিনের মতো অনেক রোগীর নাম, বয়সসহ নানা রকম তথ্যাদি দিয়ে পাতার পর পাতা ভরা। আমরা দেখতে পাই যে, তিনি সময় নেন এই লেখালেখিতে। অমলেন্দু এসে জানিয়ে যান যে, পরবর্তী রোগী এসে বসে আছেন। সৈয়দ আল-ফাইয়াজের মধ্যে কোনো তাড়া দেখা যায় না।

আটটা বেজে গেছে প্রায়। তিনি দীর্ঘ সময় নিয়েছেন কামালুদ্দিনের ক্ষেত্রে। এটা তিনি গত বছরখানেক ধরেই করছেন। রোগি দেখার দিনে প্রথম রোগীকে নিয়েই সময় পার করছেন বেশি। দ্বিতীয় রোগীর ক্ষেত্রে সময়টা তার কম লাগছে। কারণ প্রাথমিক প্রশ্নগুলো দেখা যাচ্ছে একই থাকছে। এটা গত বছর কয়েকের কথা। এর আগে এরকম হতো কি না তিনি মনে করতে পারেন না, তিনি ভুলতে শুরু করেছেন সবকিছু। খুউব দ্রুত। তিনি দ্রুত হাতে আরেকটি লাইন লিখলেন, এই লাইনটির পাঠোদ্ধার আমাদের পক্ষে উদ্ধার করা সহজ কারণ এটি কামালুদ্দিনের তথ্যের চেয়ে আকারে বড় অক্ষরে লেখা, যার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় এরকম, 'ড. রিচমন্ডকে ৮৯-তম রোগীর তথ্যাদি পাঠাতে হবে। রোগী ভেদে ড. রিচমন্ডের পাঠানো প্রশ্নগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে'।

ঘরের ভেতর এমন একটা সৌরভ ছড়ালো যা মূলত আরব ভূখণ্ডের মানুষের পছন্দ। খুব দামি 'উউদ'-এর সুগন্ধ। এ্যালকোহল ছাড়াও যা তেলের সঙ্গে মেশালে গন্ধে কোনো পরিবর্তন আসে না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই সুগন্ধী ব্যবহার করে থাকে আরবে। চমৎকার কারুকার্যময় কালো বোরখা, লেস লাগানো নেকাবের ভেতর থেকে মিহি ও মিষ্টি একটি আওয়াজ বেরিয়ে এলো, 'আসতে পারি?'

: জ্বি আসুন। বসুন।

অমলেন্দুর দেওয়া কাগজটি হাতে নিলেন সৈয়দ আল-ফাইয়াজ। সেখানে নাম লেখা আছে, নীলোফার হাশেম। বয়স: ৪০। বিবাহিত। পেশা: হোম মেকার। তিনি এই পেশার পরে লেখা ইংরেজি শব্দ দুটির নিচে দাগ দিলেন।

নারীটির গড়ন একহাড়া। কিন্তু বোরখার সরলরেখা থেকে বুকের জায়গাটা চমৎকার একটা উচ্চতা তৈরি করে আবার বোরখা সমান হয়ে পেটের ওপর দিয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। তিনি নারীটির দিকে পুরাপুরি তাকালেন। বুকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শরীরের পিছন দিকেও কোমরের নিচে প্রায় বুকের সমান উচ্চতায় বোরখাটি উঠে আবার ঝরনার মতো ঊরু বেয়ে নেমে গেছে। সৈয়দ আল-ফাইয়াজ নারীর মুখ দেখার জন্য উদগ্রীব হলেন। তিনি গলার স্বরে এই দেখতে চাওয়া মনোভাবের কোনো প্রকাশ না এনে বললেন, 'জ্বি এবার বলুন। আপনি চাইলে বোরখা খুলেও বসতে পারেন'। উত্তরে ভদ্রমহিলা কী বললেন বোঝা গেল না। তবে তিনি উঠে বোরখা খোলার কাজটিও করলেন না।

: আপনার সমস্যা সম্পর্কে বলুন।

: আমি ভয়ংকর একটি দুঃস্বপ্ন দেখি অনেকদিন ধরেই। দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম আসে না।

: কেমন দুঃস্বপ্ন?

: ঘুমানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পাই আমার মুখে কেউ যেন পানির মতো কিছু একটা ছিটিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে নাকে তীব্র একটা গন্ধ পাই, অন্যের থুতুর দুর্গন্ধের মতো। তারপর সেটা পরিষ্কার করতে যাওয়ার আগেই হঠাৎ মুখের দু'পাশে কেউ জোরে জোরে চড় মারে বলে মনে হয়। আমি যতোই বাঁধা দিতে যাই ততই চড় বেশি করে পড়ে। একসময় ঘুম ভেঙে যায় আমার। তারপরও থুতুর গন্ধ পাই কিছুক্ষণ, বার বার মুখ ধুতে ইচ্ছে কর। আর ঘুমুতে পারি না।

হাঁটাহাঁটি করি, কিংবা বসে থাকি, কফি খাই। কিছু করার থাকে না। সবাই তো তখন ঘুমিয়ে থাকে। কাজের মেয়েটাকে জাগিয়ে রাখি জোর করে।

: আপনার স্বামী কী করেন?

: তিনি ব্যবসায়ী। একটা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রি আছে আমাদের। নানা রকমের প্রোডাকসান্স। এক্সপোর্ট, ইমপোর্ট।

: আপনি নিজেও দেখেন কোনোটা?

: জ্বি আগে বসতাম, এখন আর ভালো লাগে না। ইচ্ছে করে না। বাবার ব্যবসা দেখেছিলাম কিছুদিন যখন ইউনি থেকে ইন্টার্নশীপ করতে হলো তখন। ভেবেছিলাম স্বামীর ব্যবসা ভালো লাগবে। লাগেনি, ছেড়ে দিয়েছি।

: কেন ভালো লাগেনি? জানেন সেটা?

: আমার কোনো কিছুই বেশিদিন ভালো লাগে না। খুব ধৈর্য নিয়ে কিছু করতে পারি না আমি অনেকদিন ধরে।

: সন্তানাদি?

: এক মেয়ে। আমার যখন পঁচিশ বছর বয়স তখন হয়েছে, এখন ওর বয়স পনেরো। আর ছেলের বয়স দশ।

: ওদের সঙ্গে সময় কাটান কতক্ষণ?

: ওদের সঙ্গে সময় কাটানোর কিছু নেই। ওদের দেখাশোনার জন্য একাধিক মানুষ রাখা আছে। একটা রুটিনে নিয়ে এসেছি সবকিছু আমি। সবকিছুই ঘড়ি ধরে সময়মতো হয়ে যায়। আমার কিছুই করতে হয় না। যখন আঁটকে যায়, তখনই কেবল আমার প্রয়োজন হয়।

: স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?

: এই বয়সে যেমন হওয়ার কথা, তেমন।

: কেমন হওয়ার কথা?

: এই সময়ে এসেই তো মানুষ নিজের জীবনকে নতুন করে দেখে, তাই না? মেয়েরা এক রকম করে আর পুরুষরা আরেক রকম করে। মেয়েরা মনে করে আর কিছুদিনের মধ্যেই সে ফুরিয়ে যাবে। আর পুরুষরা আরো স্বেচ্ছাচারী, ভোগী হয়ে ওঠে। সবক্ষেত্রে না হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই।

: বাহ্ ভালো লক্ষ করেছেন তো।

: মেয়েদের কাজই লক্ষ করে যাওয়া। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সব মেয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না।

: আপনার ক্ষেত্রে কতটা হয়েছে?

: আমার ক্ষেত্রে বেশ ভালোই হয়েছে। আমাকে তিনি স্বাধীন করে দিয়েছেন। বলেছেন, আমার যা ইচ্ছে আমি করতে পারি। তিনি সংসারে আছেন, আবার নেইও। তিনি সব বিষয়েই আছেন, আবার কোনো বিষয়েই নেই।

: আপনাদের শারীরিক সম্পর্ক কতটা নিয়মিত?

: তার আগ্রহ কমে গিয়েছিল আগেই, আমার আগ্রহ শেষ হয়েছে কিছুদিন হয়। এখন আমাদের শোবার ঘর আলাদা।

: আপনার আগ্রহ তার প্রতি কমেছে, কিন্তু আগ্রহ কি একেবারেই নেই?

: না, থাকবে না কেন? আছে এবং খুব বেশি ভালোভাবেই আছে।

: সে ক্ষেত্রে?

: আমি উপায় বের করে নিয়েছি।

: তাতে তার কোনো আপত্তি নেই?

: এখনো সে ব্যাপারটা জানে না। জানলে কী করবে বলতে পারব না। কিন্তু তারও যে আগ্রহ শেষ হয়নি সেটা তো আমি জানি। টেরও পেয়েছি বিভিন্ন জায়গা থেকে। তাই আমার ওপর তার আপত্তি খাটবে কেন?

: আপনাদের বয়সের পার্থক্য কত?

: প্রায় পনেরো বছর। বাবাই ঠিক করেছিলেন আমার জন্য। বলেছিলেন এখানেই আমি ভালো থাকব। তখন উঠতি ব্যবসায়ী ছিল। এখন তো তাকে সকলে চেনে।

: তাহলে আপনারা এক ছাদের নিচে বসবাস করেও একত্রে নেই আর?

: বলতে পারেন, প্রতিবেশীর মতো বসবাস। কিন্তু এতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

: ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে ব্যাপারটা?

: আমি বুঝিয়েছি ওদেরকে। মেয়ে বুঝেছে আরো আগেই। ছেলেটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে।

: ওরা কোনো অসুবিধে তৈরি করছে না তো? যেমন ওদের মধ্যে কারও ড্রাগ সমস্যা বা মেয়ের দিক থেকে খুব সমস্যার কোনো কারণ মনে করতে পারেন?

: না, বাচ্চা দুটো আমাদের বেশ লক্ষ্মী হয়েছে। তাছাড়া ওদের বাবা বা আমি, আমরা দু'জনেই বাচ্চাদের জন্য যে কোনো কিছু করতে পারি। নিজেদের মধ্যে নিজেদের জন্য কোনো আগ্রহ অবশিষ্ট নেই সেখানে তো আর কিছুই করার থাকে না, তাই না?

: সে তো বটেই। আপনার স্বামীর এরকম কোনো সমস্যা আছে বলে জানা আছে আপনার?

: আমি বলতে পারব না। আমাদের একটা সীমারেখা আছে দু'জনের মাঝে। আমরা কখনোই সেটা ক্রস করি না। প্রথমদিকে তিনি আমাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতেন, কিন্তু কয়েক বছর পরেই বুঝেছেন যে, সেটা সম্ভব নয়। আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, আমি আমার জায়গা থেকে সরবো না। কিছুদিন চেষ্টা করে তিনি সেই চেষ্টাটাই বাদ দিয়েছেন। বললাম না, আমরা সম্মানজনক একটা দূরত্ব নিয়ে এক বাড়িতে বসবাস করি। আমরা চাইলে দিনের পর দিন দু'জনের মুখ না দেখেও থাকতে পারি। কিন্তু বাচ্চাদের জন্য আমাদের সপ্তাহে দু'একবার দেখা হয়েই যায়।

: হুম, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আপনারা দু'জন দু'জনকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।

: একদম সেটাই।

: আরেকটু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই।

: জ্বি করুন।

: আপনি যে বললেন, আপনার বিকল্প ব্যবস্থা আছে, মানে ওই যে শারীরিক ব্যাপারটার ক্ষেত্রে। সেটা কী রকম? কারও সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক তৈরি হয়েছে?

: না, সেরকম স্থায়ী কোনো সম্পর্ক নয়।

: তাহলে? আপনি বলতে না চাইলে আমি জোর করব না।

: না আপনি ডাক্তার, আপনাকে তো বলতেই পারি। তবে নিশ্চয়ই ব্যাপারটি কনফিডেনশিয়াল?

: অবশ্যই। এই তথ্যাদি কেবল চিকিৎসার জন্য।

: আমি আমার পছন্দের পুরুষ ভাড়া করে নিয়ে আসি। তার সঙ্গে অল্পক্ষণের সম্পর্ক তৈরি হয় আমার। তারপর আবার নতুন কোনো ভাড়ার সম্পর্কে চলে যাই। এই শহরে হলে এই শহর, বিদেশে যদিও সুযোগ বেশি। কিন্তু আমার এই শহরের ভাড়াটে পুরুষই বেশি ভালো লাগে।

: কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি আপনাকে এজন্য?

: আগে হতো, এখন এই শহরেও এ ব্যাপারে প্রফেশনালিজম তৈরি হয়েছে। ক্লায়েন্টকে কেউ আর কোনোভাবে হয়রানি করতে চায় না। এখন তো এজেন্সি রয়েছে এজন্য। এজেন্সিই ক্লায়েন্টের তথ্য ও গোপনীয়তা সংরক্ষণ করে।

: বাহ্ বেশ তো, এটার কথা আমার জানা ছিল না। আচ্ছা ঘুম ভাঙার পরে কখনো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, মুখে কোথাও কোনো দাগ থাকে কি না?

: হুম দেখেছি, দাগ থাকে না কিন্তু অনেকক্ষণ মুখটা গরম হয়ে থাকে। বোঝা যায় যে, মুখে কিছু একটা হয়েছে, না আয়নায় দেখে নয়, আপনি শুধু নিজেই বুঝতে পারবেন ব্যাপারটা।

: আচ্ছা। আমি কিছু টেস্ট লিখে দিচ্ছি। করিয়ে নেবেন। আগামি সপ্তাহে আসুন আপনি। তবে এই সপ্তাহে দুটো ওষুধ দিচ্ছি খাওয়ার জন। আপনি এর প্রথমটা ঘুমুতে যাওয়ার আগে বিছানায় বসেই খাবেন। আর দ্বিতীয়টা যদি স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায় এবং আর ঘুম না আসে তখন কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে, দরকার হলে ছাদে গিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে ফিরে এসে তারপর এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান শেষে বিছানায় বসে তারপর খাবেন। খুব কড়া ডোজের ওষুধ এটি। তাই কোনোভাবেই একটির বেশি খাবেন না। ঠিক আছে? আসুন আপনি।

মূল্যবান 'উ-উ-দ'-এর সুগন্ধ নিয়ে বোরকায় মোড়া মেয়েটি বেরিয়ে গেলেও সুগন্ধী তখনও ঘরটায় স্থির হয়ে থাকে। কিছুক্ষণ এই সুগন্ধের ভেতর ডুবে থাকেন সৈয়দ আল-ফাইয়াজ। তারপর নোটবইখানার যেখানে কামালুদ্দিনের জন্য নোট রেখেছিলেন সেখান থেকে একটি পাতা বাদ দিয়ে পরের পাতায় লেখেন, ইংরেজি ভাষা থেকে তর্জমা করলে যার অর্থ দাঁড়ায় :

রোগী নম্বর: ৯০। ত্রিশতম নারী। স্যাম্পল হিসেবে ভিন্ন নয় কিন্তু আচরণের ভিন্নতা রয়েছে। ড. রিচমন্ডকে বিষয়টি জানাতে হবে।

রাত হয়ে গেছে, ন'টা বেজে গেছে। অমলেন্দু এসে জানতে চাইলেন আর কোনো রোগী দেখবেন কিনা? ইচ্ছে হলো না তার। সৈয়দ আল-ফাইয়াজ কিছুক্ষণ তার নোটবুকটার পাতা ওল্টালেন। তারপর সামনের ল্যাপটপটি টেনে নিয়ে ড. রিচমন্ডকে ই-মেইল লিখলেন। জানিয়ে দিলেন যে, সামাজিক অবস্থানের স্তরভেদে স্বপ্নের ভিন্নতা রয়েছে কিনা সেটি দেখার জন্য ড. রিচমন্ডের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী রোগি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু ড. রিচমন্ড তাকে এই নির্দেশনাও দিয়েছিলেন যে, তার কাছে আসা রোগী নয়, তার আশেপাশের মানুষ, যাদের সঙ্গে কমবেশি প্রতিদিনই দেখা হয় তাদের দু'একজনকেও তাদের স্বপ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার কথা। সৈয়দ আল-ফাইয়াজ কী যেন ভাবলেন, তারপর অমলেন্দুকে ডাকলেন।

: জ্বি স্যার? কিছু লাগবে?

অমলেন্দুর দিকে নতুন করে তাকালেন, এর আগে কখনো ওর দিকে তাকিয়েছেন কি? অমলেন্দুকে তো সেই ছোটবেলা থেকেই তিনি চেনেন। ওদের বাড়িটাই তো

এখন তাদের বাড়ি। অমলেন্দুর সেই কাকিমার কথা মনে পড়ে আল-ফাইয়াজের, সবাই চলে গেলেও ভদ্রমহিলা যেতে চাননি। ছিপছিপে গড়নের মহিলাটি তখন বলতে গেলে তরুণীই ছিলেন। বরিশাল শহরের একজন ডাক্তারবাবুর মেয়ে। চোখের ভেতর বিস্ময় নিয়ে দিনভর অমলেন্দুর কাকা সুখেন্দুদের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে থাকত। কখনো কখনো গানও গাইতো বলে মনে পড়ে সৈয়দ আল-ফাইয়াজের। সেসব ভয় ভয়ংকর সময়েও এই মেয়েটিকে কখনো জানালা থেকে সরতে দেখা যায়নি, হয়তো জানালাই তার খুব প্রিয় ছিল। তার কারণেই অমলেন্দুও থেকে গিয়েছিল এ দেশে। বরিশালের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে যখন দলে দলে হিন্দুরা যাচ্ছে তখন যে যেভাবে পেরেছে জায়গা-জমি দখল করেছে। কী ভয়ংকর ছিল সময়টা, আল-ফাইয়াজের পরিবারের কিছুই ছিল না তা নয়, কিন্তু এই সময়ের পরে তাদের পরিবারের সবকিছু কয়েক গুণ বেড়েছে। এখনকার বাড়িটাই তো অমলেন্দুদের কাছ থেকে কেনা কি দখল করে তা এখন আর মনে করতে পারেন না আল-ফাইয়াজ, মনে করার কোনো কারণও নেই। এ দেশে সে ইতিহাস কেউ মনে করে রাখেনি, তার কি দায় পড়েছে মনে করার? তবে তার মনে প্রশ্ন আছে এটা নিয়ে, কেন এতো দ্রুত মাত্রই ত্রিশ-চল্লিশ বছরের ব্যবধানে এসব সম্পদ-সম্পত্তি প্রায় নাই হয়ে গেছে? কিংবা থাকলেও তার জৌলুস নেই কেন একটুও? এই তো সৈয়দ আল-ফাইয়াজদের বাড়িটা, একেবারেই নিষ্প্রভ, অন্ধকার, মনুষ্যহীন হয়ে গেছে, কেন হলো এমন?

: অমলেন্দু, বসো ওই চেয়ারে। তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

: জ্বি স্যার বলেন।

: তুমি কি স্বপ্ন দ্যাখো অমলেন্দু?

প্রশ্নটা করেই সৈয়দ আল-ফাইয়াজ অপেক্ষা করেন, তিনি জানেন যে, উত্তরটা কী হতে পারে। মনে মনে ভাবেন, অমলেন্দু সরাসরি তার জানা স্বপ্নগুলোর কথাই হয়তো বলবে।

: জ্বি স্যার স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখব না কেন?

অমলেন্দু এরপর থেমে থাকে। সৈয়দ আল-ফাইয়াজ অধৈর্য হয়ে যান। গলার স্বর একটু চড়ে যায় হয়তো। জানতে চান, 'কী স্বপ্ন দ্যাখো সেটা বলো'?

: এই তো দেখি যে, আমি দৌড়াইতেছি, ধান ক্ষেতের আল দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে পাট খেতের আল পার হই, আর তখনই পায়ের নিচে কাটা-পাটের

খোঁচা লাগে, সরে দাঁড়ায়ে দেখি পা থেকে রক্ত বের হয়। রক্তের ধারার পাশে শ'য়ে শ'য়ে জোঁক আসে, বড় বড় ছোট ছোট নানা রঙের জোঁক।

সৈয়দ আল-ফাইয়াজ আরো অধৈর্য হয়ে পড়েন, বলেন, 'কী বলো এসব অমলেন্দু? তোমারে স্বপ্নের মধ্যে কেউ থাপ্পড় মারে না?' মুখে থুতু এসে লাগার কথাটা তিনি বলতে পারলেন না। কেন পারলেন না সেটা নিয়ে তিনি ভাবতে চাইলেন না। আরো উত্তেজিত হয়ে অমলেন্দুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

: না স্যার, আমি তেমন কোনো স্বপ্ন কোনোদিন দেখি নেই। আমারে ক্যান থাপ্পর মারবে কেউ? আমি তো কারও কোনো ক্ষতি করি নেই।

সৈয়দ আল-ফাইয়াজ এবার রেগে গেলেন, বললেন, 'তুমি যাও অমলেন্দু। আমি এখন কিছুক্ষণ একা থাকব। তুমি দরকার মনে করলে বাড়ি চলে যাও। আমার যেতে দেরি হবে'। রাগে তার শরীর কাঁপছে, তিনি ধারণা করেছিলেন সকলেই একই রকম স্বপ্ন দেখছে এ দেশে। তার কাছে গত প্রায় এক বছর ধরে যারাই আসছে সকলেই একই স্বপ্ন নিয়ে কথা বলছে। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নিজে? তিনি নিজেও তো স্বপ্ন দেখছেন, কেউ তার মুখে প্রথমে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে, তারপর সজোরে কেউ তাকে থাপ্পড় মারছে। তিনি একথা এমনকি ড. রিচমন্ডকেও লেখেননি। কিন্তু নিজে তো জানেন। আর বলতে গেলে সারাক্ষণ তার পাশে থেকেও অমলেন্দু ভিন্ন আরেকটি স্বপ্ন দেখছে? তিনি এটা মানতেই পারছেন না।

রাগে, ক্ষোভে, উত্তেজনায় সৈয়দ আল-ফাইয়াজ কাঁপতে থাকেন। আর কাঁপতে কাঁপতেই তার এও মনে হয় যে, তিনি স্বপ্ন দেখেন, থাপ্পড়ের বেদনা আর থুতুর গন্ধ নিয়ে ঘুম ভেঙে যাবার পর প্রতিবারই তার মনে হয়, এই থুতু অমলেন্দুর কাকীমার, রেখা রাণী সমাদ্দারের। সৈয়দ আল-ফাইয়াজ বাকি কথা আর মনে করতে চাইছেন না এ মুহূর্তে। তার পৃথিবী দুলছে, মনে হচ্ছে একটি প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে চারদিকে। সে ভূমিকম্পের গন্ধও থুতুর মতোই। রেখা সমাদ্দারের থুতুর গন্ধ।

মিলার পাহাড়

শিপা সুলতানা

মেয়েটাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছি বলে আমার আসলেও ভালো লাগতেছে। আমিও মনে মনে চাইছিলাম এমন কিছু হোক, এমনকি মেয়েটা ফাঁসি নিয়ে নিক অথবা বিষ খেয়ে ফেলুক, তবু আমার সাথে বিয়েটা না হোক। এমন যন্ত্রনায় পড়ব জানলে শালার এই পথে আসি আমি! আমার কপালটাই অমন, ঘাসে পা দিলে ঘাসফুল মরে যায়, ফলে হাত দিয়ে ফটো তুলতে গেলে ফলের বোঁটা ছিঁড়ে যায়, পাশ কেটে পাশের জনকে পথ দিতে গেলে ধাক্কা লেগে সেই মানুষটা ডেঞ্জার জায়গায়ই পড়ে...

সিগারেট ধরিয়ে মাথার পাগড়ি টাইপ জিন্নাহ টুপিটা দূরের অন্ধকারে ছুড়ে মারি, তারপর ধানক্ষেত না সরিষাক্ষেত ঠাওর করতে পারি না কিন্তু পায়জামার দড়ি খুলে শুসু করি। এত শান্তি লাগছিল শুসু করতে, মনে হচ্ছে শুসুর পানির সাথে সারা দিনের টেনশন আর বিষাদ বেরিয়ে গেল বুলেটের গতিতে! এখন আবার শুরু করা যাক যন্ত্রনা লোড করা। পায়জামার ফিতায় মনে হয় জন্মের গিট্টু দিয়ে ফেলেছি! সিগ্রেট দাঁতে চেপে ফুঁ দিয়ে ছাই ফেললাম। এতোক্ষণ ধরে শুসু করছি নাকি যে জ্বলে অর্ধেক হয়ে গেছে সিগারেট। আরেব্বাস, পাহাড়ের মাথায় কোহিনূর হীরার মতো লাল রঙের ঐটা চাঁদ নাকি! মেয়েটা তো ঐদিকেই দৌঁড়াচ্ছিল। একবার বলেছিলামও কিছুটা আগায়া দিয়ে আসবো কিনা, দুই দিকে মাথা নেড়ে কাঁদতে কাঁদতে গাড়ি থেকে নেমে গেল খালি পায়ে!

পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠতেছে, মনে হলো অশোকবৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে আছি আমি, একা এবং অসংখ্য আমি লাল আভায় ছেয়ে যাওয়া ধানক্ষেত বা সরিষাক্ষেত। পাহাড়টা খুব দূরে নয়, মেয়েটার মতো টেনে দৌঁড় দিলে আধাঘন্টার ভেতরে পৌঁছে যাব চূড়ায়, খুব উপরে চলে যাওয়ার আগে আগে ছুঁয়ে ফেলা যাবে লালচাঁদকে হা হা হা...

খুব ধপাস করে কানের পাশ দিয়ে মাটিতে পড়ল কিছু। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি বেল বা জাম্বুরা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি আমি। শালার ষোলকলা পূর্ণ হতে বাকি নাই দেখি! নিচের শক্ত মাটি বা পাথরে পড়ে জিনিসটা ফেটে গন্ধ বের হয়েছে, পাকা বেল। আমি কি ন্যাড়া! বেল তো আমার মাথায়ই পড়ার কথা মাটিতে না পড়ে। যেমন এই মেয়েটা পড়েছিল আমার উপরে, যেমন আমি এসেছিলাম এই গাঁয়েতে।

বাড়িতে গিয়ে অনেকদিন ফিরে না এলে আমরা অফিসে ভেবে নিয়েছি মুন্নার বাপ তাকে বিয়ে দিয়েছে। কেবল শিক্ষিত ছেলে বলে আরো আগে কাবু করতে পারে নাই, না হলে তার এক বছরের বড় ভাইয়ের তিনটা ছেলেমেয়ে। বন্যায় পথঘাট বন্ধ বলে ঢাকায় ফিরতে পারছিল না মুন্না, বাপ কাবু করে ফেলছে। শুধু আমি না, লীলাও মুখ কালো করে আশঙ্কার কথা জানিয়ে গেল সেদিন। তার পরদিন মুন্নার ফোন, ঠিক মুন্নার না, তার চাচাত ভাইয়ের। শহরে এসে ফোন দিয়েছে সে, মুন্নার আব্বা হঠাৎ করে মারা গেছেন, মুন্নার টাইফয়েড, তবে ভালোর পথে! কি যে হলো শুনে, অবশ্য আমার এমনই হয়, লেজ খোয়ানোর পরে লাজ হয়, শরীফকে ফোন দিলাম, লীলাকে ফোন দিতেই সে নাছোড়বান্দা। অফিস থেকে আগে আগে বেরিয়ে বাসায় চলে গেলাম, দ্রুত একটা ব্যাগ বানিয়ে কমলাপুর রেলস্টেশন। এখন লীলা যদি দেরি না করে, বিকেলের ট্রেন ধরে মধ্যরাতে সিলেট, সেখান থেকে বেবিটেক্সি নিয়ে মুন্নাদের বাড়ি বিয়ানীবাজার। স্টেশনেই থাকবে মুন্নার চাচাত ভাই। বিয়ানীবাজার নামটা আমার এমনিতেও প্রিয়, কোনো একদিন যাবার ইচ্ছা ছিল, তবে সাহস জোগাড় করার জন্য আরেকটু দরকার বলে মনের ইচ্ছা মুখে আনি নাই।

কি রে, আমরা তো ভাবছিলাম এসে দেখব তোর শিন্নি হচ্ছে!

লীলাকে দেখে গলা শুকিয়ে গেছে মুন্নার, ইশারায় সামলে নিলো শরীফ, বললো আমরা আসব শুনে তার বোন এমন গোঁ ধরলো যে রেখে আসা যাচ্ছিল না, তাছাড়া বাসায় একা রেখে আসা সেইফও না! মুন্নার ভাবি জড়িয়ে ধরে লীলাকে ভেতরের ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। যেতেই মুন্না ঘুষি দিল আমার নাকে, ব্যাটা খচ্চর।

একটা মধ্যম উঁচু টিলার উপর মুন্নাদের বাড়ি, পিছনের দিকের উঠানের মাথায় দাঁড়ালে তার বাবার কবর দেখা যায়। লাল রঙ্গের একটা কাঁচা মাটির ঢিবি, বাঁশের বেড়ার ভেতরে গাছের ডালপালা দেওয়া মনে হয়। আশেপাশের কবরগুলো পাকা দেয়ালঘেরা, পুরানো, কেবল নতুন নাজুক কবরটি মুন্নার বাবার। লোকটাকে কখনো দেখিনি, তবে প্রতিবার বাড়ি আসার আগে আগে ভয়ে ভয়ে থাকত মুন্না, সেই ইউনি

ফার্স্ট ইয়ার থেকে। আসতও না সব ছুটিতে, না আসলেও দেদারসে টাকা খরচ করত সে। চাকরিতে ঢুকার পর তার গলা শুকিয়ে যেত বাড়ির ফোন গেলে, লীলার কথা কোনোভাবেই বাড়িতে বলতে পারছিল না মুন্না। তবে কবরের দিকে তাকিয়ে কেনো যেন মনে হলো একজন ভালো মানুষের দেহ রাখা আছে ওখানে।

মৃতের চার মাস হয় নাই বলে অন্যের মাটিতে পা রাখতে পারবেন না মুন্নার আম্মা, কিন্তু ননদের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, মুন্নাও সেরে উঠেছে অনেকটা, সুতরাং বিয়েতে যাওয়া দরকার, কাজের মেয়েটাকে তার কাছে রেখে ঘরের সবাই বিয়েতে রওয়ানা দিলাম আমরা।

তুই যা বেটা, তোর কাজিন, আমরা তোর শহর ঘুরে দেখি একদিন।

মুন্না রাজি হলো না, বিয়েতে হেভি খাওয়াদাওয়া আছে বেটা, একা একা খেয়ে কোনো মজা আছে? সুতরাং আমরা লাইটেস ভরে রওয়ানা দিলাম তার ফুপুর বাড়ি। একটা বাজারের নাম যেন চেনা চেনা লাগল, তবে কোথাও কোনো পাহাড় দেখলাম না!

তোদের এদিকে পাহাড় নাই বেটা? শুনলাম না সিলেটে পাহাড় আর পাহাড়?

আছে, মুখ বন্ধ কর, আমার ঘুম পাচ্ছে।

লীলা এসে বলল একটা পরীর মতো দেখতে বউ!

আরেকবার এসে চুপিচুপি বলল একটা সর্বনাশ হইছে রে, বর নাকি আসবে না, বিয়েতে তার মত নেই!

এমনিতে বরযাত্রী দেরি করছিল বলে এক ব্যাচ খাইয়ে নিছেন কনের বাবা। গরমের দিন, সন্ধ্যার দিকে মাংস আর রাখা যাবে না, পরের ব্যাচে খেতে বসেছি আমরা, অর্থাৎ কনেপক্ষের মেহমানের খাওয়া শেষ করে ফেলা দরকার, ঠিক সেই মুহূর্তে এই সংবাদ, অল্পের জন্য গলায় মাংস আটকে যাচ্ছিল আমার। মুন্নার ভাবির একটা বেনারসি পরেছিল লীলা, তার দিকে হাভাতের মতো তাকিয়েছিল মুন্না, বিষয়টা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড লাগল তার, ঠিক সেই সময় ঘরের ভেতর আর্তনাদ শুরু হলো, প্লেটে পানি ঢেলে উঠে গেলাম আমি।

বিয়ের বর আসেনি, সে এখানে বিয়ে করবে না। ঘাড় ধরে হারামজাদারে যে এনে ফেলা হবে সেই ব্যবস্থাও রাখে নাই, চিঠি লিখে নিরুদ্দেশ! একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, এমন নরাধমের কাছে বিয়ে না হওয়াই ভালো!

মুন্না এসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলো! কনের মামাও! ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলা আমাকেই নাকি বাকি কাজটা সেরে দিতে হবে, ভাঙ্গা বিয়ের বউয়ের আর বিয়ে হয়

না, এতবড় বদনাম আর কিছুতেই নাই। অসম্ভব! আমি এতিমখানায় বড় হয়েছি, এখন মেসে থাকি মানে এই না যে আমি এক মিনিটের নোটিশে আগুনে ঝাঁপ দিব। দিলে আমি ভালোবাসায়ই ঝাঁপ দিতাম, এই এলাকার একটি মেয়েকে আমি কখনোই ভুলব না, তার সাথে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছি বছর দেড়েক আগে, কিন্তু দেড় মিনিটও আমি তাকে না ভেবে থাকতে পারি না! মেয়েটি আমাকে গার্হস্থ্য জীবন, প্রকৃতি আর ভালোবাসা চিনিয়েছিল চিঠির শব্দে শব্দে! বড় ঘরের মেয়ে, দুই বেনীর মেয়ে, আলাভোলোা মেয়ে! আমার এতিমখানার জীবনে তাকে প্যাঁচিয়ে ফেলার লোভ থেকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম নিজেকে। সেই এলাকার মেয়েকে বিয়ে! অসম্ভব।

অসম্ভব মুখ দিয়ে বলতে পারি নাই বলে ফাতেমা খানম নামের মেয়েটির সাথে কবুল বলতে হলো আমার!

মনে হচ্ছিল মুন্না আর শরীফকে খুন করে মাঠের মাঝখানে গেঁড়ে ফেলি! মুন্না না হয় লীলার কাছে বাঁধা, কই শরীফকে বলার সাহস কেউ পেল না কেন! তাও আবার কায়দা করে টয়োটা একটা যোগাড় করে তাদের দুজনকে ঢুকিয়ে তাদের গাড়িকে ফলো করতে বলা হয়েছে, মুন্নাদের বাড়িতেই যাচ্ছে সবাই!

গাড়ি থামান, আমি বমি করব–

স্লো করে ব্রেক করলাম আমি, ইচ্ছা করছে একেই এখানে মেরে পালিয়ে যাই! বললাম বমি টমি কিছু না, আপনি পালিয়ে যেতে চান

গেলে যাব, আপনি এখানেই বসে থাকুন–

গাড়ির সব লাইট অফ করে দিলাম, কয়েক সেকেন্ড লাগল ধাক্কা খেতে, দুই ধারে ধানক্ষেত না সরিষাক্ষেত! পাকা না কাঁচা জানি না, তবে সাদা, বিশাল নরম একটি আবহ শুয়ে আছে সেই ক্ষেতের উপর! পাশেই কোথাও পাহাড় আছে, একটা কালো ছায়াও ঢেকে রেখেছে ক্ষেতের কিছু অংশ! কোন পাহাড়? মাঘাইমা পাহাড়? ছাতলা?

বলুন তো বিয়েটা কি আপনিই ভাঙছেন? বরকে যে চিঠি লেখা হইছে কনে প্রেগনেন্ট বলে, সেটা আপনি লিখছেন তাই না?

হ্যাঁ লিখছি, আপনার সমস্যা?

আপনি প্রেগনেন্ট না, তাই না?

মেয়েটা এবার আর কোনো উত্তর দিল না, দ্রুত হাতে মাথার চুলে ক্লিপ দিয়ে আটকানো বিয়ের ওড়না খুলতে লাগল, তার পর একে একে সব গহনা খুলে সিটের পাশে রাখল, তারপর সম্ভবত স্যান্ডেল। কোনো মতে শাড়িটাকে জুত জাত করে

গাড়ির দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল! উদ্ভ্রান্তের মতো চারদিক দেখতে লাগল সে! আরিব্বাস, কেউ যদি আগে থেকেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, আমাকেই এখানে খুন করে কনে নিয়ে পালিয়ে যাবে! আমিও গাড়িতে বসে দ্রুত চারপাশ দেখে নিলাম, ফর্সা চরাচরে কেউ কোথাও নেই তবে একহারা গড়নের একটা গাছ আছে! তার আড়ালে কি কেউ! বললাম 'আগায়া দিয়া আসব?'

দুই দিকে মাথা নেড়ে মেয়েটা হঠাৎ করে সামনের ক্ষেতে নেমে পড়ল, একবার ফিরেও তাকাল না আমার দিকে। আমি গাড়ির চাবি খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম, মেয়েটা সেই পাহাড়ের দিকেই দৌড়াচ্ছে! কেউ কি পাহাড়ের তলে অপেক্ষায় আছে তার জন্য! যাক থাকলে ভালো, না থাকলেও আমার কোনো সমস্যা নাই!

দাঁড়িয়ে থাকব না গাড়িতে গিয়ে বসে থাকব না দ্রুত ড্রাইভ করে মুন্নাদের গাড়ি আটকাব! আমার এখন কি করা দরকার! মেয়েটা কয়েক সেকেন্ডের ভেতর নাই হয়ে গেছে শাদা আবহের নিচে, আমি কি অপেক্ষা করব পাহাড়ের চূড়ায় তার মাথা দেখা পর্যন্ত! আমার কেমন যেন অস্থির লাগছে হঠাৎ, মেয়েটাকে কেন জোর করে আগায়া দিতে গেলাম না! শাড়ি পরে কতদূর যেতে পারবে মেয়েটা, কাদার ভেতর দিয়ে দৌড়াবেই বা কীভাবে! গাছের নিচ ছেড়ে সেই জায়গায় এসে দাঁড়ালাম, মেয়েটা শেষবার যেখানে দাঁড়িয়েছিল। মাটির উপর কি এটা! বই? হাহাহ... বিয়ের কনের কাছে বই! গাড়ি থেকে নামার সময় ধাক্কা লেগে পড়ে গেছে, বইটি তুলে পিছনের সিটে, মেয়েটার অন্যান্য জিনিসের উপর রাখতে যাব দেখি ওয়্যার এন্ড পিস, পুরানো একটি এডিশন! কোনার দিকের কাভার সামান্য ছেঁড়া! বজ্রপাত হলেও এতটা ভয় পেতাম না, বইটি তো আমারই! পনেরো বছর বইটি তো আমার বিছানার পাশেই ছিল। মিলা নাকি বইটির কথা এতো শুনেছে, তার লোকাল লাইব্রেরিতে পাচ্ছে না!

আরে এটা কোনো কথা হলো! আমার জিনিস তোমার কাছেই থাকল বলে বিকেলের পোস্টে বইটি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আমি! বইটির পাতার ফাঁকে ফাঁকে কিছু চিঠি! লাইটার জ্বালিয়ে দেখলাম আমারই লেখা চিঠির ১২/১৩টি চিঠি পাতার ভাঁজে। মিলা কি কখনো তার পুরো নাম লিখেছিল ঠিকানায়? ঠিকানা তো দেওয়া থাকত তার বান্ধবীর, শুধু মিলাই লিখত সে, পত্রমিতালীর এড্রেসে শুধু মিলাই পেয়েছিলাম আমি!

চিৎকার করতে থাকলাম, মুখে রক্ত এনে চিৎকার, মিলা... মিলা আমি পাবলো...আমি পাবলো মিলা...

সুনশান ধানের ক্ষেতে কোনো কম্পন নেই, কোথাও কোনো শব্দ নেই...

ভ্রমান্ধ দৃশ্যের বায়স্কোপ

সুমন সুপান্থ

একলা দিনের বুকের ভেতর ব্যথার তুফান তুলে, মেয়েটাকে কাঁদিয়ে টাদিয়ে, রেলব্রিজের দুই পাতে পা রেখে তুতো এক ভাই চলে গেলে অবলীলায়, দূরে থাকার বেদনা সেইবার শিখতে শুরু। তারপর ওই দূর আর কাছে আসার দ্যোতনা রক্তজবা ফুলের মতো নির্ভার আর রক্তিম হয়ে বুকের ভেতরই জমা পড়ে রইল কত কাল! আর আজ এখানে এসে মেয়েটার সেই ক্ষতস্থানেই বেপরোয়া এক নোনতা হাওয়া লেগে গেল যেন!

রবীন্দ্রভাষ্যে বলা যেত নিভৃত নির্জন চারধার, এমনই এক শূন্যতা নিবিড় হয়ে, ঘাপটি মেরে বসেই ছিল। তারা তখন খেয়াল করেনি। মহানগরের আগ্রাসি থাবার নিচে এই বনবিন্দু এমন বিরক্ত হয়ে রইল কী করে, তারা কেউ কাউকে জিজ্ঞেসই করল না। মেয়েটা আনত। উচ্ছ্বসিত। ছেলেটা বলল, 'এ আর এমন কী! ইংল্যান্ডের উইলটশ্যারে একটা বাটারফ্লাই ওয়ার্ল্ড আছে, জান? হাজারে হাজার প্রজাপতি, মথ, সেখানে। উড়ছে, উড়ে এসে বসে যাচ্ছে তোমার গায়ে, তাদের পাখনার আবির লেগে যাচ্ছে তোমার শরীরে— চিন্তা করো !'

মেয়েটির বিস্ময় তখনো তুমুল দুলছে— 'এখানেও কম নয়। দেখো কত্ত প্রজাপতি! এই রকম একটা জায়গা আছে আমি তো জানতামই না!' কৃতজ্ঞতা। এর পরের পর্বও জানা আছে মেয়েটার। ছেলেটা এবার তার ফেলে আসা মফস্‌সল কী মফস্‌সলের মতো গ্রাম আর তার রাঙ্গিফলের মতো স্মৃতিগুলো, নিজের যাতনা, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবে।

'গ্রীষ্ম মানে কী! টা টা দুপুর। আগুনের তাপে দেখো সব পাকতে শুরু করেছে। রাগি সূর্য তার তীব্র রোদে তৃষ্ণার্ত ফেরিওয়ালার মতো ক্লান্ত শ্রান্ত করে ফেলছে চারপাশকে। হয়ত দু'একটা কাঁচা আম ঝরে পড়ছে টুপ করে। দৌড়াও। কিন্তু তুমি পেলে তো! তার আগেই হয়ত কেউ ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে! এমন সময় কি ঘুমাবার, তুমি-ই বল? কিন্তু মা তখন

সমানে ডেকে যাচ্ছে, 'ঘুমুতে আয় রিপন। জলদি আয় ঘুমাবি'। মা'র ছিল এই এক বিলাস। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত, ঠিক ভাতঘুম নয়, প্রায় মাঝ-দুপুরে একবার তার ঘুমানোই চাই। সঙ্গে আবার খোকাকে চাই! তা, আমি কী আর এমন; এমন দুপুর রেখে ঘুমানো যায় বলো, তুমি পারতে?'

মেয়েটা পারত কিনা আজ আর সেই মীমাংসায় পৌছানো যাবে না কোনোভাবেই। সবার গল্প যেমন আলাদা, মীমাংসার ধরনও কি তাই নয়? মানব জন্মের রহস্য বোধ করি এই, প্রত্যেকের জন্মযাতনা আলাদা— চুল সামলাতে সামলাতে সে ভাবল। তবে এটা ঠিক, এই ছেলেটার মতো কোনো অনাবিল শৈশব নেই তার। পৌষরাত্রির নির্জনতম কুয়াশাপতনের মতো মখমল কোনো স্মৃতি নেই। আর থাকলেও সে এমন নিখাদ, এমন কবিতার মতো ভাষায় বর্ণনা দিতে পারত না কোনোভাবেই। অতীতের জন্য এমন উচ্ছ্বাস সে জমাই রাখে নি কোনোদিন। জমাতে জমাতে গিয়ে খুচরো আধুলির মতো পথে পড়ে গেছে ঝনঝন!

গ্রীষ্ম পেরিয়ে ছেলেটা এবার বর্ষায়। জল। শুধু জল। থৈ থৈ। সমুদ্রের মতো হয়ে ওঠা বাড়ির পাশের নদীটা দেখো উঠোন পর্যন্ত এসে গেছে! আর ধুম পড়ে গেছে কে কত বড় করে বানাতে পারছে এককেটা ভেলা। না দেখলে বিশ্বাস করবে না। কেমন একটা উৎসব উৎসব হাওয়া সবখানে। তারপর রাত। কুপির আলোয় অল্প একটু সরে যাওয়া রাত। গরিব, হতদরিদ্র গ্রামজননীর মেয়ে ওই নিশি। সেই নিশিতে যখন আবার চাঁদ উঠছে, তার আলোয় তখন সেই গ্রামকেই আবার মনে হচ্ছে বেহেশতের পাশের একটা ছোট্ট দ্বীপ। মাথার ভেতর ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনি নিয়ে মেয়েটা তখন মনে করতে চাইছিল, মিলিয়ে নিতে চাইছিল দৃশ্যের ভেতরের দৃশ্যগুলোকে। তার ছোট চাচা এমন করে বলতেন। বলতেন, মানুষের জীবন তো পরস্পরকে নিয়ে এমনই ছিল। পরে তারা নিজেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কারা যেন ছিন্ন করে দিয়েছে। আগল খুলে দিয়েছে সমস্ত যৌথতার। এই ছেলেটার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে ছোট চাচার কথা খুব মনে পড়ছে তার। কোথায় যেন একটা মিল আছে দুজনের। কথা বলবার ঢং। সবকিছুকে অনুপম করে ব্যাখ্যা করবার এক আশ্চর্য দক্ষতা। রিপন ছেলেটার প্রতি তার মুগ্ধতা কেবল বেড়েই চলছে। সে কি প্রেমে পড়ে যাচ্ছে? আরে ধুর, কবি কবি স্বভাবের এরকম ছেলেদের প্রেমে পড়লেই কী আর না পড়লেই কী? এদের নিয়ে বেশিদূর যাওয়া যায় না।

জীবন তাকে এসব শিখিয়েছে ।

—তুমি তোমাদের গ্রাম দেখতে নিয়ে যাবে আমাকে?

প্রায় অপ্রস্তুত এক গলায় তবু কথাটা বলে ফেলল সে। কে যেন বলিয়ে নিলো! ছেলেটাও অবাক। যে ক'দিন থেকে সে জানে মেয়েটাকে, এমন দুম করে কিছু বলে বসবার মেয়ে সে নয়। আর একেবারে গ্রামে যাওয়ার প্রস্তাব! ছেলেটা বললো, 'গ্রাম তো আর সেই গ্রাম নেই। এখন শহর প্রায়। শহরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। বলতে পার শহর খেয়ে নিয়েছে আর কি !'

—'তবু যেতে চাই আমি। নিয়ে যাবে?' প্রায় মিনতি এবার।

—'হুম, যাবো একদিন।'

আমাদের গ্রামের পাশ দিয়েই একটা ছোট্ট মেঠোপথ, ওটা ধরে কিছুদূর এগোলেই রেললাইন, তারপরই বর্ডার। এই পাশে আমাদের গ্রাম, ওপাশে বিমলদের বাড়ি। বিমল আমার বন্ধু ছিল। আমি বাংলাদেশি। বিমল ইন্ডিয়ান। তবু সেই বিমলই আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিলো ছেলেবেলায়। বিকেল হলেই আমরা বেড়িবাঁধের উপর উঠে যেতাম। তারপর দুইজন দুপাশের দুটা গাছে বসে চিৎকার করে কথা বলতাম। আমি আমার স্কুলের কথা। বিমল বলত বিমলের স্কুলের কথা। মাঝখানে এটুকুন বেড়িবাঁধ। এটাই আলাদা করে নিয়েছে দুটো দেশকে। এক আকাশ, তার একই নীল রঙ। একই মাঠের হাওয়া দোল দিচ্ছে দু'দেশের ধানপাতাগুলোকে। তবু এটা এক নয়। তবু এটা দুই আলাদা দেশ। কী করে হয় বলো তো? মেয়েটাকে বিহ্বল করে দেয় ছেলেটা। তার ইচ্ছে করে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে, এমন অন্তর কাঁপিয়ে, কবিতার মতো করে কথা বলা সে কোথায় শিখেছে! জিজ্ঞেস করা হয় না। বলে, 'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাবো'। ছেলেটা আপত্তি করে, 'এই না মাত্রই এলে! এত্তো সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে এলাম, আর এখনই যাবে!'

মেয়েটা উঠে পড়ে। কিছুদূর হেঁটে আসে দুজনেই। তারপর রিকশা। ছেলেটা দাঁড়িয়ে থাকে। সিগারেট ধরায়। মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে। তারপর সামনে তাকায়। দিনের অনেকগুলো অসমাপ্ত কাজের কথা মনে পড়ে যায় তার। যাবার পথে শিলাকে স্কুল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে। গলির মোড়ের দোকানটাতে বাকি পড়ে থাকা টাকার কিছুটা অন্তত আজ দিতেই হবে। বড় মামার বাসায় যেতে হবে একবার। উফ্... মুহূর্তেই অন্ধকার এক তোবড়ানো ঝুপড়ির উপর বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। কালো। ঝমঝম বৃষ্টি। সামনে কিছু দেখা যায় না। কিচ্ছুটি না। এক মুহূর্ত আগের সময়টাকে, ছেলেটার সঙ্গ, কুড়িয়ে পাওয়া, পেয়ে আবার হারিয়ে ফেলা একটা মার্বেলের মতো মনে হয় তার। গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক দূর চলে যায় কেবল। হঠাৎ তার কী হয়, সবকিছুকে খুব ব্যর্থ মনে হয়। শূন্য শূন্য লাগে।

নিজেকে রিপনের তুলনায় রিক্ত, নিঃস্ব মনে করে আফসোস বাড়ে, কেন যে সে বড় হলো! বড় না হলে তো তারও এমন একটা গল্প জমা থাকত। কিংবা বড় না হলে তার সঞ্চিত গল্পও এমন জমাট বেঁধে থাকত। ক্ষয়ে যেত না। হারিয়ে যেত না। বড় হওয়া অনেক কষ্টের। বড় হলে কেবল মরে যেতে ইচ্ছে করে। শৈশবে যে জীবনকে ঘুড়ির মতো পলকা মনে হয়, বড় হলে তাকেই বোঝার মতো লাগে। সবার কি এমন হয়? মনে হয় না। রিপনকে দেখলে তো মনে হয় তার সমস্ত জীবন একটা ধানিমাঠ, মৌসুম শেষে যেখানে শুধুই সোনালি ফসল। এতো অর্থবহ, জমাট হয় কী করে কারও কারও জীবন? রিপনকে নিখাদ নিছক এক কবি মনে হয় তার। ছোট চাচাও এমন কবিই ছিল ভেতরে ভেতরে আসলে। এদের, এরকম স্মৃতিসঞ্চয়ী মানুষদের খুব ঈর্ষা করে মেয়েটা।

ছোট চাচা বলতেন জীবন এমনিতে একটা অর্থহীন ব্যাপারই বটে, তবে তাকে অর্থবহ করে তুলে নিতে হয়। ছোট চাচা তো কত কিছুই বলতেন! ছোট চাচা স্বপ্ন দেখতেন এই দুনিয়াটাকেই বদলে দেবেন। যৌবনে পাওয়া এক রাজনৈতিক আদর্শ আর আবেগ তাকে বদলে দিয়েছিলো আর সবার থেকে। দুরন্ত করে তুলেছিল। কবে কোথায় উত্তরবঙ্গের এক বিরাট জনসভায় গেছেন। ছাত্র, কর্মচারী আর মজুরের জনসমুদ্র। ঢাকা থেকে আসা বড় বড় নামকরা নেতার মাঝে উঠে দাঁড়িয়েছিল এক সাঁওতাল। আঁটসাঁট জামার তল থেকে তার চওড়া কাঁধ আর অসম্ভব শক্তিশালী মোটা ঘাড়ের দীপ্ত ভঙ্গিমা এক মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিয়েছিল গোটা জমায়েতকে। অল্প একটু জড়ানো বাংলায় বলেছিল, 'এইটে বাংলা। দেশটো হামার। এই বাংলা বদল করবি...'। পেশল হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ। ছোট চাচা অনেকবার সেই গল্প করেছেন। বলেছেন, তার নাকি ঘুমের ভেতর, স্বপ্নের ভেতরও সেই আওয়াজটা গভীর ঘণ্টাধ্বনির মতো বাজে। 'এই বাংলা বদল করবি...'। এই এই করে, বলতে গেলে তার কাছে কত কী শুনেই তো তার জীবনকে বুঝতে শেখা। জগৎকে জানা। ছেলেবেলায় কি তার মেয়েবেলায়, সবে এইট কি নাইন, চাচার এমন সব ভারী কথাগুলোকেও হঠাৎ ভালো লাগতে শুরু করলো। ইচ্ছে করতে লাগলো, বড় হয়ে চাচাদের দলে চলে যাবে সে। গোপনে এক রাতে সব কাপড়চোপড়, মা'র সব গহনা নিয়ে সত্যিই চলে যাবে একদিন। তা বাবা ছোট চাচাকে যতই বকুক, সে তো জানে ছোট চাচার স্বপ্নগুলো অনেক সুন্দর। সব সর্বহারারা তো আর ডাকাত নয়! আর ছোট চাচা তো কোনোভাবেই না। মাঝে মাঝে বাড়ি এলে যে অসীম মমতায় তার লাগানো ফুলের গাছগুলোতে পানি দিতেন ছোট চাচা; এই জন্মে এমন ভালো লাগার দৃশ্য খুব বেশি একটা তার নেই। এমন মানুষ ডাকাত হতেই পারে না।

সবচেয়ে মুমূর্ষু গাছটাতে পানি ঢালতে ঢালতেই একদিন সবচেয়ে বড় স্বপ্নটা তার চোখে গেঁথে দিয়েছিলেন উনি। ‘জানিস তো তোর নাম কে রেখেছে?’

আমি। ইলা। কেন ইলা রেখেছি, সেটা জানিস?’

মেয়েটা মাথা নাড়ছিল। জানে না।

‘ইলা মিত্রকে একদিন তুই জানবি। তোদের পুরো প্রজন্মটাই জানবে। জানতেই হবে। তোদের নিজের স্বার্থেই জানবি। না জানলে যে মুক্তি নেই রে। এই নারী একদিন আমাদের এই অঞ্চলে আলো নিয়ে এসেছিলেন। জমিদার বাড়ির বউ ছিলেন, বুঝলি? কিন্তু লড়ছিলেন তাঁর প্রজাদের হয়ে। সব মানুষের ভেতরে আলো থাকে। কিন্তু বারুদ থাকে কেবল অল্প কিছু মানুষের ভেতর। ইলা মিত্র সেটা সবখানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তুইও একদিন ইলা মিত্র হয়ে উঠবি।’

‘না আমি হবো ইলা লস্কর’। মেয়েটা ফাজলামি করছিলো।

‘ওই হলো। নামে কী আসে যায়? বারুদ পুষে রাখাই আসল...’

পরে, কলেজে পড়তে যেয়ে, হোস্টেলের ছাত্রফ্রন্ট করা আপাদের কাছ থেকে ইলা মিত্রের উপর অনেক বইটই পড়ে সে যখন সত্যি সত্যি মরিয়া হয়ে উঠছিল ভেতর ভেতর, যখন সেই গরম ডিম প্রবেশের গল্পে এসে তার নিজের নিম্নাঙ্গ অবশ হতে শুরু করল, আর হাতের শিরায় জমা হতে লাগল আগুনের মতো গরম রক্ত; তখনই একদিন শুনল ছোট চাচার গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া গেছে চকের গহীনে। বালিকার প্রচণ্ড অভিমান থেকে সেই তার অভিশাপ দিতে শেখা। অথচ ভেতর ভেতর অভিমান নয়, অভিশাপ নয়, জেদ সঞ্চয়ের বাসনা ছিল তার ষোলো আনা। ছোট চাচাকে সেটা জানানোই হলো না!

হলো না তো আরো কত কিছুই! সাদা এপ্রোন, গলায় স্টেথো ঝুলানো ডাক্তার আপা হয়ে রোগীর সেবা করে যাচ্ছে সে— বাবার এমন একটা নির্দোষ স্বপ্নও পূরণ হলো না। বাবা চলে গেলেন বছর দু’এক পরে। বাজারফেরতা স্কুল শিক্ষকের বুকে হঠাৎ ব্যথা উঠলে, যেমন ত্বরিত এক মৃত্যুদৃশ্যের ছবি ভেসে উঠে, বাবার মৃত্যুদৃশ্য নির্মিত হলো সেই সব নিয়ম মেনেই। সদরে নিয়ে যাবার সময় মিলল না। বাচ্চাদের সবার মুখ দেখা হলো না। সবার বড় ইলা তখন ইডেন হোস্টেলের ব্যালকনির দড়ি থেকে রোদে শুকোতে দেয়া কাপড় তুলে নিচ্ছিল, তেরো বছর বয়সি মিলা ছিল মা’র পাশেই। আর সব ছোট শিলা তখন খেলার মাঠে।

হোস্টেল থেকে বাড়ি ফিরে বাবার লাশ উঠোনে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে টেদে সেই যে চোখ মুছে নিয়েছিল সে, পরে অকারণে চোখে জল এনে তার মুল্য আর কমতে দেয় নি কোনোদিন। না, আরো একদিন। ওই তুতো ভাইটা তার প্রেম অবহেলা করে চলে গেলো যেদিন, সেদিন খুব করে কান্না এসেছিল। পৃথিবীর সব রং মুছে যাচ্ছিল। একটা হাহাকার তাকে পাখির ঝরে যাওয়া পালকের মতো শূন্য করতে করতে আছড়ে ফেলছিল। প্রেম! এখন মনে পড়লে হাসি পায়। ছেলেমানুষি। মেয়েমানুষি হবে, না? হা হা হা...

মেয়েটা সেই শহর ছেড়ে এই মহানগরে এসেছে, তরতাজা রূপসি মা প্রায় বুড়ো হতে চলেছেন, ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে তাও কত বছর! মিলা কলেজ পেরিয়ে গেছে। শিলাও স্কুলের শেষ ধাপে। চাকরি খুঁজতে খুঁজতে, চাকরি পেয়ে সেটা আবার হারাতে হারাতে, গার্মেন্টসে গার্মেন্টসে পোশাকের ডিজাইন করতে করতে, আটকে থাকা বেতন তুলে আনতে যেয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠে মরে যেতেও ইচ্ছে করেছে বার দু'য়েক। তবু তার চোখে জল আসেনি কোনোদিন। আজ এলো। আজ আবারো ছোট চাচা... নিজের হাতে লাগানো ফুল বাগান... ইলামিত্রের জীবনী... বাবার মৃত্যু — সব সারি ধরে উঠে আসল রিপনের বদৌলতে। এই ছেলে এতটা দখলপ্রবণ হয়ে উঠছে কোন শক্তিতে!

স্মৃতিশিহরিত মেয়েটা কান্না মুছে দেখল আকাশে শেষবেলার খেলা। কোথাও কোনো মেঘ নেই। ভ্রম। তার নিজের মনের সাপলুডু খেলা। পাখিরা তখন ডানায় রং নিয়ে বাড়ি ফিরছে। আর রিপন ছেলেটা তার হাতে গুঁজে দিচ্ছে একটা সবুজাভ পালক। মনে মনে সে রিপনের পালক ধরা হাতে চুমু খেল। পৃথিবী পৃথিবীকে ঠিক এমনটাই দেখতে চায়। জীবন জীবনকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায় সবখানে। মানুষ একদিন এসব জানত। ছোট চাচা জানতেন। আজ কেন সব ভুলে গেল মানুষ? আচ্ছা, রিপন কি জানে? মেয়েটা আসন্ন গোধূলির দিকে প্রেমার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে।

একদিন সত্যি রিপনদের গ্রামে গেলে সে জিজ্ঞেস করে নেবে এসব।

প্রথমে ভার হয়ে এসে এখন ভনভন করে ঘুরছে মাথাটা। এক লক্ষ জোনাকপোকা এক সঙ্গে নেচে উঠে খেয়ে নিচ্ছে চৈতন্যের শেষটুকু। বাইরে দু'পাশের অপস্রিয়মাণ গাছপালা, দীর্ঘ একরোখা রাস্তাটা— সব কিছু আবছা হয়ে যাচ্ছিলো ক্রমশ। মৃত্যুর মতো এক হিম, ঘুমের মতো পেলব এক ক্লান্তি টানছিল নিচের দিকে। ইলা আর তাকাতে পারছিল না। মাথার ভেতর বড় একটা নদী বিশাল বিশাল ঢেউ ফেলছে। মরিয়া হয়ে সে তবু চোখ খুলতে চাইছিল। পারছিল না।

অথচ আজ দেখবারই কথা ছিল তার। সবকিছু। আবার নতুন করে। নিত্যদিনের এই যুদ্ধ, শর্ষেদানায় পা রেখে দৌড়ানো কান্নালাগা, দমবন্ধ এই দিনগুলো উজিয়ে ইলা দেখে আসতে চাইছিল একটা ধানখেত। সারা আকাশ নীল। মাঝখানে এটুকুন বেড়িবাঁধ। আর ওপারে বিমল বসে কেবল স্কুলের গল্প শোনায়। রাতে অন্ধকার নেমে এলে অনেকগুলো কুপি জ্বলে উঠে একসঙ্গে। এসব।

সবকিছু দেখে এসে আবার কুড়াতে চাইছিল তার হারানো স্মৃতিভস্ম, নিখোঁজ আধুলিটা। দেখতে চাইছিলো কী ভীষণ সাহসে ভর করে রিপন এত পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে প্রতিবার। কিসের জোরে সে জিতে যায় অনায়াসে। কিন্তু তার মাথার ভেতর এখন সেই ধানখেতটা মরে যাচ্ছে। মগজের পরতে পরতে নীল রঙ মুছে পাণ্ডুর হয়ে পড়ছে পুরো আকাশ।

ডান হাতে রেন্ট-এ-কার থেকে ভাড়া নেয়া গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে রেখে, বাঁ হাত দিয়ে জুসপ্যাকটা এগিয়ে দিল রিপন। 'সবটুকু শেষ করো। ভালো লাগবে'। ইলা মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্ট্রটা মুখে পুরতে চাইল একবার। পারল না। বরং বেরিয়ে আসা আমের জুসটা ছলকে পড়ে তার গোলাপি জামাটার একটা অংশ ভিজিয়ে দিল। রিপন যুগপৎ নির্বিকার আর প্রশিক্ষিত এক ভঙ্গিতে দেখছিল সব।

তারপর তিন মিনিটের নীরবতা। রিপন আবার বাঁ হাতটাকে কাজে লাগিয়ে মোবাইলের বোতাম টিপল। 'কাজ হৈ গেছে বস... ধরেন অর্ধেক সারা। আপডেইট জানাইতাছি...'

গাড়ি সাঁ সাঁ করে ছুটছিল। রাস্তার এই অংশটা খানাখন্দে ভরা। গাছগাছালি নুয়ে এসেছে কোথাও কোথাও। নিস্তব্ধ। সুনশান। একটু দূরে মরে যাওয়া একটা নদীতে জাল ফেলে বসে থাকা কিছু অলস মানুষ। তাদের শরীরে মেঘের আবছায়া। চকের বাকি অংশে ঝাঁঝালো রোদ।

আর এসব কিছুর মাঝে, চকের একেবারে গহিনে ফাঁদে আটকে পড়া একটা জলঢুপি কেবল সমস্ত প্রতিরোধের শেষে ধ্বস্ত, ক্লান্তভীষণ, ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল।

হামিদা বানুর সংসার
সাঈম চৌধুরী

ছোটবেলায় বাবা-মা হারিয়ে মামার বাড়িতে বড় হয়েছে হামিদা বানু। পরের ঘরে থেকে স্বভাব হয়েছে পরগাছার মতো। নিজস্ব কিছু কোনোদিন ছিল না বলে সবকিছু নিজের করে নেবার বড় তাড়াহুড়ো তার।

আবদুল বাতেন সহজ সরল মানুষ। বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। মা গত হয়েছেন বছর কয়েক আগে। বাবা মারা গেছেন কিছু দিন। মৃত্যুর সময় চৌদ্দ বিঘে জমি রেখে গেছেন। বাজারে তিনটে দোকান। মাস পেরুলে ভাড়া আসে আঠারো হাজার টাকা। জমিগুলো বর্গা দেওয়া। বছর শেষে ফসল আসে। নগদ টাকা আসে। অভাব কি জিনিস জানে না আবদুল বাতেন। জীবন তার রঙের ঘোড়া দৌড়ায়। টর্চলাইটওয়ালা একটা মোবাইল নিয়েছে সে। দিন কাটে মোবাইলে বন্ধুদের সাথে রঙ-রসের আলাপে। নিয়ম করে প্রতি বিকেল বেলা মোবাইলে ফুল চার্জ দিয়ে রাখা হয়। রাত নামলে ঘর ছাড়ে। মোবাইল টর্চের রুপালি আলোয় পথ দেখে বাজারে যায়। খোকনের চায়ে দোকানে বসে চা-সমুছা খায়। বন্ধুদের সাথে রাষ্ট্র-সমাজ নিয়ে গুরুতর আলাপ করে। রাত গভীর হলে খোকন যখন তার দোকানের দরজায় তালা দেয়, তখন আবার রুপালি আলোয় পথ দেখে বাড়ি ফিরে আবদুল বাতেন। তার কাছে প্রতিদিন যেন রুপালি জোছনার রাত। জীবন তার রঙের ঘোড়া দৌড়ায়। সেই জীবনে অভিশাপ হয়ে আসে হামিদা বানু। বাপ-মা হারিয়ে মামাবাড়িতে যে মেয়ে বড় হয়েছে, পরের বাড়িতে বাস করে যার হয়েছে পরগাছা জীবন!

আবদুল বাতেনের বাবা খুব আগ্রহ করে হামিদা বানুর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, ছোট বেলায় বাপ-মা হারানো মেয়ে সংসারের মূল্য বুঝবে ভালো। কোথাও যাবার জায়গা নেই, তাই কখনো স্বামীর বাড়ি ছাড়বে না। আঁকড়ে ধরে রাখবে।

হামিদা বানু মামার বাড়িতে থেকে অনেক গঞ্জনা গায়ে মেখে অষ্টম শ্রেণি পাস করে। স্কুলে পড়ালেখার পাশাপাশি ছলাকলাও শিখে নেয়। সেবা-যতনের নামে শ্বশুরকে বশ মানায়। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত শ্বশুর পুত্রবধূর গুণে মুগ্ধ হয়ে থাকেন।

তারপর বেরিয়ে আসে হামিদার আসল চেহারা। যেন ফণা তুলে ঘুমন্ত সাপ। কী তার কুটিল চক্রান্ত, কী তার দেমাগ!

হামিদা বানু হয়তো কখনো আয়না দেখে না। আয়না দেখলে এতো দেমাগ হতো না। বিয়ের সময় চেহারার দিকে একবার তাকালে আরেকবার তাকাবার ইচ্ছে মরে যেত। শ্বশুর বাড়িতে বেশুমার খাবার গিলে গায়ে-গতরে চর্বি জমে। চেহারায় খানিক রোশনাই আসে। চেহারা যত বদলায় তার চেয়ে বেশি বদলায় আচার-স্বভাব। সবকিছু গিলে খাবার প্রবণতা তীব্র হয়ে ওঠে। দুজনের সংসার। সেই সংসারে দিনে রাতে কামলা খাটে রজব আলী আর ময়নার মা। রাজরানি হয়ে থাকার চরম বন্দোবস্ত। কিন্তু হামিদা বানু কী আর কখনো কোনদিন এমন সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করেছিল!

কীভাবে সুখ উপভোগ করতে হয় জানে না সে। তাই নিজে সারা দিন কামলা খাটে। কোন প্রয়োজন ছিল না তবু বাড়ির পিছনের জংলা পরিষ্কার করে। তাতে শস্য ফলায়। উঠোনে বাগান করে। কোদাল দিয়ে মাটি খুড়ে গর্ত বানায়। ময়লা আবর্জনা সেই গর্তে পুঁতে। তিন কামলার কাজ একলা করে। করুক। তাতে আবদুল বাতেনের কিছু যায় আসে না।

তবে যখন হামিদা বানু আবদুল বাতেনের জীবনের রুটিন পাল্টে দিতে চায়, তখনই সমস্যা বাঁধে। স্বামী কেন কোনো কাজ করে না এ নিয়ে সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান করে সে। তাতে যারপরনাই বিরক্ত হয় আবদুল বাতেন। বলে, আমি কাজ করতে যাই কুন দুঃখে! আমি তো ফকিরনির পোলা না।

হামিদা বানু বলে, কাম হইলো পুরুষ মাইনষের পরনের কাপড়। কাম ছাড়া তারে ন্যাংটা লাগে!

এমন কথা শোনে রাগে গা জ্বলে আবদুল বাতেনের। সেই রাগকে আরো তীব্র করে হামিদা বানুর নির্মম রসিকতা। একদিন সে স্বামীকে বলে, আইজ বাজারে গেলে কিছু আন্ডা কিন্যা আইসেন।

আবদুল বাতেন জানতে চায়, আন্ডা দিয়া কি হইবো?

হামিদা বানু বলে, আপনে হারাদিন ঘরে বাইয়া থাকইন, কাম নাই, কাজ নাই, বইয়া বইয়া আন্ডায় তা দিতেন!

আবদুল বাতেন নিপাট ভদ্রলোক। তাই কিছু বলে না। শুধু মনে মনে রাগ পুষে। বিপরীতে হামিদা বানুর অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ভোর হলেই মোরগের ডাকের মতো আবদুল বাতেনকে ডাকে। ঘুমাতে দেয় না। এতো সকালে উঠে কী করার আছে! যাদের ঘরে ভাত নেই তারা ভাতের বন্দোবস্ত করতে ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠবে। আবদুল বাতেনের মতো মানুষেরা ঘুমাবে পাক্কা এগারোটা পর্যন্ত। ঘুমের মাঝেই তো জীবনের সুখ!

কিন্তু হামিদা বানু জানে না জীবনের সুখ, তাই অন্যের সুখ কেড়ে নিতে তার বুক কাঁপে না।

এই যে দিনের বেলা আবদুল বাতেন বন্ধুদের সাথে মোবাইলে কথা বলে, রাতের বেলা খোকনের চায়ের স্টলে আড্ডা দেয় এটাই তো উপভোগ। কিছুদিন ধরে এইসব আনন্দেও কাঁটার বিস্তার করে হামিদা বানু। বলে, কাজ নাই তো এতো আড্ডা কিসের, যাগো সঙ্গে আড্ডা মারেন তারা বেহায়া-বেশরম কোকিল! টেকার গন্ধ পাইয়া কু-কু স্বরে ডাকে। যখন টেকা থাকবো না আপনের সঙ্গে আলাপে তাদের ঠেকা থাকব না!

এভাবে স্বৈরাচারের মতো আবদুল বাতেনের জীবনকে পুরোটা দখলে নিতে চায় হামিদা বানু। মেয়েটির মাঝে কী যেন একটা কিছু আছে, মাঝে মাঝে এত রাগ হয়, মাঝে মাঝে মাথায় তুলে আছাড় দিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ালে কেনো জানি চুপসে যায় আবদুল বাতেন।

বন্ধুরা এ নিয়ে হাসাহাসি করে। বলে, বউয়ের ডরে বাঘ থাইক্যা বিলাই হইছে। তা না হলে কি স্বামীর লুকানো এক লাখ বিশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিতে পারে কোনো স্ত্রী!

বাবা মৃত্যুর পর এক বিঘে জমি বিক্রি করে ছিল আবদুল বাতেন। কীভাবে জানি খবরটা পেয়ে যায় হামিদা বানু। জমি বিক্রির টাকা গেল কোথায় এ নিয়ে প্রশ্ন করে।

বাবার কিছু ধার ছিল, জায়গা বিক্রির টাকায় সেই ধার শোধ করা হয়েছে জেনে রাগ করে হামিদা বানু। বলে, বাপের জমি বেইচ্যা যে পোলায় বাপেরই ঋণ মারে, সেই আকামা পোলার সন্তান একদিন বাপের কাফনের টেকার লাগি ভিক্ষা করবো!

সে রাতে কড়ায়-গণ্ডায় জমি বিক্রির টাকার হিসাব নেয় হামিদা বানু। অঙ্ক করে দেখে এখনো এক লাখ বিশ হাজার টাকা খরচ হয়নি, আলমিরা থেকে চিলের মতো ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে যায় সে!

শুধু ঘরে রাখা টাকায় নয় হামিদা বানুর চোখ যায় বাজারেও। তিনটে দোকানের ভাড়া আরো বেশি হওয়া দরকার এমন কথাও তুলে। যারা দোকানদার, তারা আবদুল বাতেনের বন্ধু-স্বজন। হামিদা বানু বলে, ব্যবসায় ইয়ারানা খাটে না। কী লজ্জার কথা, নারী হয়েও সে বাজারে যায়। দোকান তিনটায় নোটিশ দিয়ে আসে। বলে, ভাড়া না বাড়াইলে দুই মাস পর দোকান বন্ধ! নোটিশ পেয়ে বাধ্য হয়েই এক সপ্তাহের মধ্যে দোকানিরা ভাড়া বাড়ায়। কিন্তু এ নিয়ে আবদুল বাতেনকে কটু কথা বলতে তারা দ্বিধা করে না।

বউয়ের এমন ব্যবহারে লজ্জিত হয়, শঙ্কিত হয় আবদুল বাতেন। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। তার জীবনকে পুরোটাই ব্যতিব্যস্ত করে রাখে হামিদা বানুর নিত্য নতুন অত্যাচার।

একদিন বাড়িতে এক ট্রাক ইট আসে সঙ্গে বারো বস্তা সিমেন্ট। অবাক হয় আবদুল বাতেন। ইট-সিমেন্টের রহস্য জানতে গিয়ে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। হামিদা বানু বলে, আপনে তো হারাদিন ঘরে বইস্যাই থাকেন। ওহন উঠানে বসবেন। আপনারে একখান দোকান খুইল্যা দেই।

আবদুল বাতেনের বিশাল বাড়ি। বড় উঠোন। সেই উঠোনের একটা অংশে দশ ফুট বাই দশ ফুট দোকানের নকশা আঁকা হয়। হামিদা বানু যুক্তি দেখায়, এক পোয়া লবণ, পাঁচ টেকার পিয়াজ কেনার লাইগ্যা গেরামের মানুষ আধ মাইল পথ হাইট্যা বাজারে যায়। ঘরের সামনে দোকান হইলে তারা এইখান থেকে সওদা করে!

রজব আলী রাজমিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি নিয়ে আসে। দেখতে দেখতে তিন ইঞ্চি গাঁথুনির একটা রুম তৈরি হয়ে যায়। আবদুল বাতেন বলে, মরে গেলেও আমি দোকানে বসুম না!

হামিদা বানু বলে, আপনে শুধু পায়ের উপরে পা তুইল্যা দোকানের ক্যাশে বইয়্যা থাকবেন, রজব আলী দোকান চালাইব। আপনে হইবেন মহাজন সাব। লোকে কত সম্মান কইর‌্যা আপনেরে মহাজন কইবো! কথা বলতে বলতে লোভে তার চোখ চকমক করে।

'এই মাইয়্যা টেকা ছাড়া আর কিছু বুঝে না। আর কিছু বুঝবার চায় না, খোকনের চায়ের দোকানে বসে বন্ধুদের কাছে এভাবেই স্ত্রীর গোমর-ফাঁস করে আবদুল বাতেন। বন্ধুরা বলে, এমুন বউ যার ভাগ্যে আছে তার মরণ ছাড়া গতি নাই।

আবদুল বাতেন মরে গেলেও দোকানে বসবে না জানায় বটে কিন্তু বউয়ের জেদের কাছে তাকে হার মানতে হয়।

বাজার থেকে ঠেলাভর্তি মালপত্র নিয়ে আসে রজব আলী। দোকান সাজায়। দোকানে মিলাদ হয়। পরদিন ভোরে মোরগের ঘুম ভাঙার আগে হামিদা বানুর ঘুম ভাঙে। আবদুল বাতেনকে আর বিছানায় থাকতে দেয় না। বলে, ও মহাজন সাব, আপনের দোকান খুলনের টাইম হয়।

এত ভোরে কার দায় পড়েছে বাজার-সওদা করার। কিন্তু হামিদা বানুকে উপেক্ষা করার শক্তি থাকে না আবদুল বাতেনের। কোনোরকমে মুখ-হাত ধুয়ে ছুটতে হয়। রজব আলী আগে থেকেই দোকানের দরজা খুলে রাখে। সকালের চা-নাস্তা হামিদা বানু দোকানে দিয়ে যায়। এর নাম বুঝি সংসার, এর নাম বুঝি জীবন! আবদুল বাতেন দীর্ঘশ্বাস গোপন করে।

প্রথমদিনেই জমে যায় দোকানের ব্যাবসা। হাতের কাছে দুধ-চিনি-চা পাতা কেনার সুযোগ পেয়ে এদিন গ্রামের মানুষের ঘরে ঘরে সকালের চা তৈরি হয়।

ব্যাবসার এমন সাফল্যে হামিদা বানু দারুণ খুশি। আনন্দ তার ধরে না।

সারা দিন দোকানে বসে ক্লান্ত আবদুল বাতেন রাতে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে হামিদা বানু কাছে আসে। বলে, আইজক্যা রাইতে আপনের মোবাইলের টর্চলাইটের দরকার নাই। আইজ আসমানে আল্লায় তার টর্চলাইট জ্বালাইছে! আহেন বাইরে আহেন। দিন রাত কামলা খেটে কাঠের মতো শক্ত হয়েছে হামিদা বানুর হাত। সেই শক্ত হাত দিয়ে টেনে আবদুল বাতেনকে বিছানা থেকে তুলে, ঘরের বাইরে নিয়ে যায়।

আকাশে মস্ত বড় একটা চাঁদ। হামিদা বানু বলে, আল্লাহর টর্চলাইটে আইজ নয়া ব্যাটারি লাগছে, দেহেন সব কেমুন ফকফকা!

জীবনে যা কোনোদিন ঘটেনি আজ তাই ঘটায় হামিদা বানু। স্বামীর হাত ধরে হাঁটে। বাড়ির পিছনের জংলা জায়গায় যায়। এখন আর এখানে জঙ্গল নেই। কেঁটে-ছেঁটে সবকিছু পরিষ্কার করা হয়েছে। হাত ধরে টান দিয়ে আবদুল বাতেনকে মাটিতে বসায় হামিদা বানু। তারপর একদম ঘা ঘেঁষে পাশে বসে। গুনগুন করে গান গায়। চাঁদনি রাতে এক অচেনা হামিদা বানুকে দেখে বিগলিত হয় আবদুল বাতেন।

অনেকক্ষণ বসে থাকে তারা। বহুদিন ধরে একটা কথা, একটা ইচ্ছা আবদুল বাতেনের মনে বাসা বেঁধে আছে। ভয়ে বলা হয়নি কখনো। আজ সেই কথাটা বলে সে। বলে, ঘরে যুদি একখান নয়া মেহমান আইতো কেমুন মজা লাগতো! ডাক্তারের কাছে যাইবানি, পোলা মাইয়্যা ক্যান হয় না জানন দরকার।

মায়াভরা চোখে স্বামীর দিকে তাকায় হামিদা বানু। বলে, মা হওনের সুখ আমি ওহন বুঝবার পারি। আরেক বেটির পোলারে যতন কইর‍্যা বড় করি, হেই পোলায় যহন বড় হইবো, তহন আল্লায় আমার পেটে পোলা দিবো, আমার পোলায় টর্চওয়ালা মোবাইল নিয়া খেলবো! একটু সবুর করেন। সময় হইলেই আমাগো সন্তান আইবো।

কার কথা বলে হামিদা বানু, আর 'কোন বেটির পোলা'রে সে মানুষ করে! বউয়ের হেঁয়ালি কথার কোনো মানে বুঝে না আবদুল বাতেন। আজ তার স্ত্রী বড় রহস্যময়!

প্রতিদিন মজার ঘুম ফেলে খুব ভোরে জাগতে হয় আবদুল বাতেনকে। তারপর দোকানে গিয়ে বসা। দিনে দিনে দোকানের পসার বাড়ে। ক্রেতা বাড়ে। সেই ক্রেতাদের একজন হয়ে আসে মালেকা বেগম। মুন্সি বাড়ির মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক আগে। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। তাই গাটকি-বোচঁকা নিয়ে বাবার বাড়ি ফিরে আসে। এখন সে বৃদ্ধ বাবার সংসার দেখাশোনা করে। বাড়ির কাছে হওয়ায় এটা-ওঠা কেনার জন্য প্রায়ই দোকানে ছুটে আসে মালেকা বেগম। তাকে দেখলে আবদুল বাতেনের মনচনে হয়ে ওঠে। রূপ যদি হয় পরীক্ষার খাতা তবে হামিদা বানু পাবে টেনেটুনে তেত্রিশ আর মালেকা বেগম হবে লেটার মার্ক, নিদেনপক্ষে আশি! এমন সুন্দর নারীর কেনো সংসার টিকে না! এমন সুন্দর নারী কেন হামিদা বানুর আগে তার জীবনে আসে না!

মালেকা বেগমের প্রতি দিনে দিনে মমতা বাড়ে আবদুল বাতেনের। আড়াইশ গ্রাম চিনি কিনতে এলে তাকে পাঁচশ গ্রাম চিনি দেওয়া হয়! বাড়তি খাতির-যত্নে মালেকা বেগমও আগ্রহী হয়ে ওঠে। দরকারে-অদরকারে দোকানে ছুটে আসে। আবদুল বাতেনের সঙ্গে রঙ-রসের গল্প করে। হাসে। আবদুল বাতেনের তখন বড় ভালো লাগে। বড় বেশি ভালো লাগে। এর নাম যদি প্রেম হয়, তবে হ্যাঁ অবশেষে প্রেম এসেছে আবদুল বাতেনের রঙ হারানো জীবনে। আবার তার জীবন রঙের ঘোড়া দৌড়ায়।

প্রেমের কথা তারা দু'জনের কেউ মুখে উচ্চারণ করেনি। প্রেম চিনতে মুখের ভাষা লাগে না। এমনকি রজব আলীও বুঝতে পারে, একটা কিছু ঘটছে। সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটছে!

তখন হামিদা বানুর আসন্ন সর্বনাশের চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে রজব আলী। একদিন হামিদা বানুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে।

হামিদা বানু পরের ঘরে মানুষ। ঘর ভাঙার কষ্ট তার চাইতে আর বেশি কে বুঝে! আবদুল বাতেনের মনে যে রঙ ধরেছে কিছুটা আন্দাজ পেয়েছিল সে। আজ রজব

আলীর কাছ থেকে সব শুনে তাই বিপন্নবোধ করে। সারাদিন কাজে মন বসে না। সারারাত ঘুম হয় না। পরদিন মুন্সি বাড়ি ছুটে যায়। মালেকা বেগমের বাবার সাথে দেখা করে। নালিশ জানায়।

কথাটা জানতে পারে মালেকা বেগম। সে ছুটে আসে আবদুল বাতেনের কাছে। কেঁদে কেঁদে নালিশের খবর জানায়।

আবদুল বাতেন চরম ক্ষিপ্ত হয়। হামিদা বানু সীমা অতিক্রম করেছে। তাকে শিক্ষা দিতে হবে। কঠিন শিক্ষা দিতে হবে। দোকান ছেড়ে বাসায় ছুটে আসে আবদুল বাতেন। হামিদা বানুর নাম ধরে ডাকে। সাড়া মিলে না। শোবার রুমে ঢুকে। এখানে নেই হামিদা বানু। রুম ছেড়ে বেরুবার পথে পায়ে একটা ছোট প্যাকেট ধাক্কা খায়। আগ্রহী হয়ে প্যাকেটটা হাতে নেয়। ওভাকন। এই বাড়িতে ওভাকন পিল কে খায়, কেনো খায়?

এই সময়ে রুমে ঢুকে হামিদা বানু। স্বামীর হাতে প্যাকেটটা দেখে ইততস্ত হয়। মালেকা বেগমের বিষয়ের চেয়ে এই মুহূর্তে ওভাকনের প্যাকেট বড় হয়ে দাঁড়ায় আবদুল বাতেনের কাছে। কেন সংসারে নতুন অতিথি আসে না এই নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার চিন্তা ছিল তার। আজ ডাক্তারের কাছে না গিয়েও এতদিনের প্রশ্নের উত্তর মিলে।

আবদুল বাতেনের ভেতর তখন পুরুষ জেগে ওঠে। চোখ লাল হয়। ছুটে গিয়ে হামিদা বানুর চুলের মুঠি চেপে ধরে। 'মাগী তুই পিল খাস, আইজ তর পিল খাওনের শখ আমি ছাড়াইয়া দিই' বলে হামিদা বানুকে টেনে নিয়ে যায়। বিছানার ধাক্কা মেরে ফেলে। আজ ভেতরের পুরুষ জেগে উঠেছে, আজ বুকের ভেতর একটা পশু ঘোৎ ঘোৎ করে। যে বিছানায় সব সময় আদর করে আবদুল বাতেন, আজ সেই বিছানায় হামিদা বানুর ইজ্জত নেয় সে। বলে, তর পিল খাওনের শখ আমি ছাড়াইয়া দিই!

এমন পাশবিক কাণ্ডে মুখে কোনো কথা আসে না, চোখে কোনো জল আসে না হামিদা বানুর। শুধু রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। মনে মনে ভাবে, যা ঘটছে, স্বপ্নে ঘটছে। ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।

তবু আবদুল বাতেনের রাগ থামে না। মালেকা বেগম আর ওভাকন মিলে বহুদিন ধরে পুষে থাকা রাগ আগুনে পরিণত হয়।

হামিদা বানুকে বিছানায় ফেলে রেখে বাইরে যায় আবদুল বাতেন। দশ মিনিটের মাথায় ফিরে আসে আবার। একা নয় সে। সঙ্গে নিয়ে আসে মসজিদের

মোয়াজ্জিনকে। ততক্ষণে পরণের পোশাককে কোনোরকমে ঠিকঠাক করে বিছানায় পাথর হয়ে বসে থাকে হামিদা বানু।

বাড়ির উঠোন থেকেই বড় গলায় চিৎকার করে বারান্দায় আসে আবদুল বাতেন। পিছন পিছন আসেন মোয়াজ্জিন। আবদুল বাতেন বলে, মাইনসে মসজিদের মওলানারে স্বাক্ষী রাইখ্যা বিয়া করে, আইজ আমি হেই মওলানারে সাক্ষী রাইখ্যা তালাক দিমু।

এমন কথা শুনে বাঁধা দেন মোয়াজ্জিন। বলেন, থামেন গো বাজান থামেন, যে কথা মুখে আনছেন হেইটা আল্লাহপাকের বড়ই না পছন্দ। তার পেয়ারের হাবিবেরও বড় না পছন্দ।

স্বামীর উঁচু গলা শুনে বিছানা ছেড়ে বাইরে আসে হামিদা বানু। তখনো সে বিস্মিত। তখনো সে পাথরের মতো।

মোয়াজ্জিনের কথায় আরো খেপে যায় আবদুল বাতেন। বলে, হুজুর আমারে ধর্ম শেখায়েন না। আমি যা কইবার চাই, যা বহুত দিন কইবার পারি নাই, আইজ আপনে তার সাক্ষী হন।

একটু আগে হামিদা বানুর জীবনে ঝড় বয়ে গেছে। এখন সে সেই ঝড়টাকে সামলে জলোচ্ছ্বাসকে ঠেকাতে মরিয়া হয়। মাথায় কাপড় টেনে মোয়াজ্জিনকে উদ্দেশ্য করে বলে, হুজুর আপনের পায়ে পড়ি আপনে যান, উনার মাথা গরম হইয়া আছে, আমি সামাল দিতাছি।

মোয়াজ্জিন চলে যেতে চান। ফেরার পথ ধরেন। তখন চিৎকার করে আবদুল বাতেন। বলে, যাওনের আগে শুইন্যা যান, আমি আবদুল বাতেন, পিতা আবদুল কাদের, সাং বড় গ্রাম, পোস্টাফিস রানিরবাজার, আইজ আমি আমার স্ত্রী হামিদা বানুরে তালাক দিই। এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক।

হামিদা বানুর শরীর কাঁপে। পায়ের নিচে মাটি সরে যায়, মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে। তবু সে স্থির থাকতে চায়। তবু সে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চায়, হুজুর তিনি যা কইছেন, তা কি হইছে, ধর্মে কি তা মানে?

মোয়াজ্জিন মাথা নিচু করে উত্তর দেন, আমি সতেরো শ টাকা বেতনের মোয়াজ্জিন। ধর্মের বেশি ব্যাখ্যা কইতে পারি না। মনে লয়, তিনি যা কইছেন, তা হইছে, ধর্মেও তা মানছে। তয় একখান পথ থাকে গো মা, যদি আপনে পোয়াতি হন তাইলে তালাক হয় না।

তখন আবার চিৎকার করে আবদুল বাতেন। বলে, থামেন, থামেন এখানে থামেন, এই মাইয়্যা পোয়াতি হইবো ক্যামনে, এই মাইয়া পিল খায়!

তালাকের তেরো দিনের মাথায় মালেকা বেগমকে বিয়ে করে আবদুল বাতেন। বন্ধুরা খুশি হয়। বলে, তুই ছক্কা মারছস। মালেকা বেগমের মতো রূপসী নারীরে বিয়া করছস, হামিদা বানুর মতো রাক্ষুসিরে তাড়াইয়্যা দিছস, তুই বাঘের বাইচ্চা!

আবদুল বাতেনের এখন সুখের সময়। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে। মালেকা বেগম গুণবতী রমণী। দিনে স্বামীর মাথায় তেল মালিশ করে দেয়, রাতে পা টিপে দেয়। এখন সকালে কেউ আবদুল বাতেনের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেয় না। দিনে কেউ কাজের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে না। রাতে টর্চওয়ালা মোবাইলের রুপালি আলোয় পথ দেখে বাজারে যায় আবদুল বাতেন। বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়। আবদুল বাতেন যা চেয়েছিল তার সবকিছু হাতের নাগালে।

তবু কিছুই ভালো লাগে না তার। ভোর হলেই ঘুম ভেঙে যায়। মোবাইলে কথা বলতে মন বসে না। বন্ধুদের আড্ডায় বিরক্তি আসে। সবচেয়ে বড় কথা, এত কিছুর পর, এত আদর-যত্নের পর মালেকা বেগমে মন বসে না আবদুল বাতেনের। সুখগুলো পাতলা ডালের মতো পানসে লাগে।

তারপর একদিন আসমানে আল্লাহর টর্চলাইট জ্বলজ্বল করতে দেখে আবদুল বাতেনের বুকের ভেতরে উতাল-পাতাল হয়। কাউকে কোনো কিছু না বলে সে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে হামিদা বানুর মামা বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হয়। মামাকে দেখে হাউমাউ করে কাঁদে। বলে, মামাগো হামিদা বানু কই? হেয় আমার জীবনটারে ছারখার কইর‌্যা দিছে! তারে ছাড়া সবকিছু আন্ধার লাগে, তারে ছাড়া বুকের ভেতর দম থাকে না, যা প্রায়শ্চিত লাগে আমি করি, হামিদা বানুরে শুধু একবার দেখবার দেন!

তালাকের পর এক কাপড়ে মামা বাড়িতে এসেছিল হামিদা বানু। মামি তাকে গ্রহণ করেননি। মামি তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। মামা বলেন, হামিদা বানু বুঝি আর তোমার বাড়িত ফিরিয়া যায় নাই, তাইলে কই গেল মেয়ে?

ছোটবেলায় বাবা-মা হারিয়ে মামার বাড়িতে বড় হয়েছে হামিদা বানু। পরের ঘরে থেকে স্বভাব ছিল তার পরগাছার মতো। নিজস্ব কিছু কোনদিন ছিল না বলে সবকিছু নিজের করে নেবার বড় তাড়াহুড়ো ছিল তার।

সবকিছু কি আর নিজের করে নেওয়া যায়?

ছড়া

সূচি

নুরুজ্জামান মনি
২২১ শক্ত হাতে বীর দাঁড়া
২২২ আজ থেকে শুরু হোক আমাদের রণটা

শাহাদাত করিম
২২৩ ভাত দাও
২২৪ কুটনি বুড়ি

রেজুয়ান মারুফ
২২৫ ডায়াসপোরা'র ছড়া
২২৬ বড় ভাই

সৈয়দ হিলাল সাইফ
২২৭ আমার গাঁও
২২৯ অনুভূতির ছোঁয়া

জোসেফ খান
২৩০ মনে পড়বে কি আমাকে?
২৩২ লোকান্তরের জনক

নূরুজ্জামান মনি

শক্ত হাতে বীর দাঁড়া

লড়াই দিতে পিছপা কেন
বক্র কেন শিরদাঁড়া?
বুকের পাঁজর উঁচিয়ে ধরে
শক্ত হাতে বীর দাঁড়া।

দূর করেছি নিকষ আঁধার
ঝড়-তুফান আর দুর্বিপাক,
নিত্য লড়াই যুদ্ধ করে
করবই দূর ঘোর বিপাক।

বিপদ দেখে পিছপা কেন
মরার আগে মরতে নেই,
দেও-দানোদের হু হুঙ্কারে
বীর সেনাদের ডরতে নেই।

আজো কেন এ নাম শুনি
রাজাকার আর আলবদর?
দুষ্ট লোকের চামড়া পিঠের
শক্ত হাতে ছালবো, ধর।

আজ থেকে শুরু হোক আমাদের রণটা

ঘাতকের নেই জাত কিবা নেই ধর্ম,
রুখে দিতে হবে তার সব অপকর্ম।
হাতে হাত ধরে হবে মানুষকে দাঁড়াতে,
দুনিয়ার বুক থেকে বিদ্বেষ তাড়াতে।

জোট বাঁধো পদাতিক এক হয়ে লড়ব,
মানুষের উপযোগী পৃথিবীটা গড়ব।
মানবতা জয়ী হোক এই শুধু কাম্য,
অমৃতের সন্তান আনবেই সাম্য।

সাম্যের জয় হোক বিদ্বেষ চাইনে,
নিরাপদ হোক ধরা মানবিক আইনে।
দাঁড়াও মানুষ আজ ভয় দূর করতে,
প্রগতির ফুলটাকে ফোটাবার শর্তে।

সন্ত্রাসী দুরাচার ধর্মের লেবাসে,
মানুষের পৃথিবীতে ভালো তাকে কে বাসে?
মানবের এ ধরায় দানবকে দলতে,
ধমনীতে জ্বালো আজ বিদ্রোহ-সলতে।

আজ থেকে শুরু হোক আমাদের রণটা,
বাজাবই দানবের বিদায়ের ঘণ্টা।
লড়ে যাও রণবীর দানবকে রুখতে,
দানবের পিঠে শেষ পেরেকটা ঠুকতে।

শাহাদাত করিম

ভাত দাও

ফাল মেরে ঘাড়ে চড়ো
পেট মাথা বড়োসড়ো
চোট পেয়ে থাকো চুপ
বলো না তো ‘উফ’টাও।

চ্যাংদোলা দিয়ে চাও
গোঁফ-মোচে দিয়ে তাও
টের পাবে ঠিকই ঢের
ছিঁড়ে নেবো গোঁফটাও।

দাঁত-টাত আছে যা-ও
ভেঙে-চুরে দেবো তা-ও
শুধু শুধু বিতলামি
কেটে নেবো হাতটাও।

আছো বটে ঝরঝরা
হাসি মুখে ফরফরা
বাঁদরামো যাই করো
পাতে আগে ভাত দাও।

কুটনি বুড়ি

খেক শেয়ালের পাহারাতে
মুরগি ঝিমোয় খাঁচায়
ইচ্ছেমাফিক কুটনি বুড়ি
সুতোয় পুতুল নাচায়।

পুতুল নাচে দুলিয়ে কোমর
পড়লে সুতোয় টানটা
পড়শি ব্যাটায় লুটছে মজা
বেশ তো নাড়ায় কানটা।

কুটনি বুড়ি থুতনি বাঁকায়
ঠ্যাংটা তুলে কান্ধে
বাক্সবন্দি ইঁদুর লাফায়
পড়েই বুড়ির ফান্দে।

উল্টে যাওয়া আরশোলারা
জানটা নিয়ে কোমায়
দুধের বাটি সাবাড় করে
সব হুলোরা ঘুমায়।

রেজুয়ান মারুফ

ডায়াসপোরা'র ছড়া

ভাইয়া আমার প্রতিভার ডিপো!
ভাবীও কিন্তু কম না,
টিএসসি হইতে আজিজ মার্কেট
বেইলী রোড টু রমনা।

তাহাদের ছিল পদচারণা,
উদাস হাঁটাহাঁটি।
ভাইয়া বোধকরি ছিঁড়িতেন আর
ভাবী বাঁধিতেন আঁটি।

দেশের আর্ট এবং কালচার
নিয়াছিল তারা লীজে,
ভাবী দেখিতেন 'সংস্কৃতি পাড়া'
'সাহিত্য'- ভাইয়া নিজে!

নামকরা যত কবি-সাহিত্যিক
তাহাদের ছিল দোস্ত,
মাসে একবার 'গরিবের ঘরে'
খাইতো পোলাও-গোস্ত।

নাটক-সিনেমার সেলিব্রেটিরা
পাইতে ভাবীর ডাক,
মাসের পর মাস ওয়েট করিত
হইয়া তীর্থের কাক!

উনাদের চাপা- সেই লেভেলের!
নিন্দুকেরা বলে-
ডায়াসপোরায় ভাইয়া ও ভাবী
সগৌরবে চলে।

বড় ভাই

এখন তিনি নৌকা মার্কা
অতীতে ছিলেন কাস্তে
সেসব কথা তুলিলেই বলেন-
প্লিজ ছোট ভাই, আস্তে!

হাতুড়ি-কাস্তে লোক দেখানো
আসল বিষয় অন্য,
সমাজতন্ত্রীর ভেকটা ছিল
রাশিয়া যাওয়ার জন্য।

নাঙ্গল দিয়াও হাল চষেছেন
প্রথম বর্ষ-কলেজে
জাতীয় পার্টির নেতার জন্য
মাইকিং আছে নলেজে।

ধানের শীষের জন্য তাহার
দরদ ছিল না কম যে
ইদানীং তাই চলছেন খুব
বুঝে শুনে আর সমঝে।

শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার
উদ্ধার করিয়া গুষ্টি
আওয়ামী লীগেই পেয়েছেন খুঁজে
রাজনৈতিক-তুষ্টি।

সৈয়দ হিলাল সাইফ

আমার গাঁও

আমাদের গ্রাম আম আর জাম
করচের গাছ, পলো বাওয়া মাছ
আজো মনেপড়ে, ঝড়ে আম পড়ে
বরই গাছে ঢিল, আকাশে চিল
বিজলির রাতে, উজাই মারা তাতে
মাঠে ভেরা, গরু, রাখালেরা জড়ো
গরুবাড়ি, কর, কাটাগাঙ, ডর।

লাঙলের হাল, বড় ফারজাল
বাইন, জালাচারা, সময়ের তাড়া
কোণ দিয়ে সেচা, লাউ-কদু বেচা
ড্যানিকাটা ধান, ম্যাড়াতে আন
হুফাপরা দামা, পাজুমে থামা...
লুড়ালুড়ে কতো, দেখা যেতো শতো।

রাখালিয়া বাঁশি, কিশোরীর হাসি
মায়াভরা মুখ, ভুলে যাওয়া দুঃখ
জারমুনের ফুল, পুস্কুনির কূল
খাল, বিল, নদি, বহে নিরবধি।

মুড়ি, ভাজা খই, দুধ, মাঠা, দই
মধুমাখা বুলি, আদরের ঝুলি
বরইয়ের আচাড়, মুখেপুরে নাচার
সবুজের মাঠ, বেচাকেনা হাট
বাউলের প্রাণ, মরমীয়া গান।
পুঁথিপাঠ আসর,পুতুলের বাসর

ভ্যাটকল্লির ফুল, আমের মুকুল
দোয়েলের ছানা, পিঞ্জিরা খানা।

কদমের ফুল, হিজল জারুল
কাঠাল পাখির ডাক গোয়ালের হাঁক
সেসব দিন আজো অমলিন !

অনুভূতির ছোঁয়া

ও...আমার জারমুনের ফুল, সালিউরা বনের শাপলা
আমার স্পর্শের ছোঁয়া নিও
ঘরের আঙিনায় বেড়ে ওঠা লাউয়ের ডগা
শীমের কলির সুরভি দিও।

ও...আমার বড়দ্বারার মাঠ, হালিছাড়ার শামুক
আমার নামে কাদা মেখো
মাগুরা নদীর গোপাটের কূলে সাঁতার কাঁটতে
দস্যি ছেলেদের সঙ্গে রেখো।

ও...আমার চেঙ্গাবিলের শিং, ডাট্টা বর্শির কৈ মাছ
শালুক, সিঙরাই, ভেটের খই
জল ভরা ঘাটের প্রথম সিঁড়িতে হাগাটালু, বালিগড়া, ব্যাঙের পোনা
আমার প্রথম মিতা ও সই।

জুসেফ খান

মনে পড়বে কি আমাকে?

এমনও তো হতে পারে এই মুহূর্তটাই
আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত, তাই,
জীবন ক্যানভাসের শেষ তুলিতে আমি
ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে যেতে চাই।

হয়তো মনে রাখবে আমার কোনো কথা,
কোনো এক পার্টিতে বয়ে আনা হাসির গুঞ্জন,
ভাববে আমার ভিজে যাওয়া শার্টের রঙ,
তোমার জন্য বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকা ক্লান্ত ক্ষণ।

ব্যালকনির সবুজে পড়ন্ত বিকেলের সেই স্তুতি
হাওয়ার পরশে মেঘবরণ কেশের উড়ে যাওয়া।
তোমার নীলাম্বরী শাড়ির হৃদয় গাঁথা বন্ধনা
নীল টিপ আর লিপস্টিকের মিল খুঁজে পাওয়া।

হয়তো মনে রাখবে আমার ভালো লাগা কাজ,
মনের অজান্তে করে থাকা কোনো অদৃশ্য পাপ!
নোটপ্যাডে টাইপ করা অগোছালো চরণগুলো,
একান্ত মনের রেখে যাওয়া কিছু ভাবনা বিলাপ।

পার্টনার ইন ক্রাইম, সহযোদ্ধার মনে আসবে কি
ঝড়-ঝঞ্ঝা সমস্যা-সঙ্কুলে আমার পাশে থাকা!
সারা জীবনের এক সঙ্গে চলার প্রতিশ্রুতি
সেই অনুপল, প্রথমবার মতো হাতে হাত রাখা।

সারপ্রাইজ দিয়ে সাজানো ডিনার টেবিল,
লাল গোলাপ আর মোববাতির মৃদু আলো।
ড্রয়িং রুমে টাঙ্গানো হাসি মাখা ক্যানভাসে

স্মৃতি রোমন্থনে মনে পড়বে কি আমার ভালো।

হয়তো কখনো শত ব্যস্ততার ফাঁকে
আমাকে নিয়ে ভাববে অযথাই,
কাফনের কাপড়ে শুইয়ে রেখে আসা
মাটির বিছানায় আমার শেষ মুহূর্তটাই।

শঙ্কিত মনে ভাবি হতে পারে এই মুহূর্তটাই
আমার জীবনের অন্তিম মুহূর্ত, তাই
জীবন ক্যানভাসের শেষ পদচিহ্নে শুধু
ভালোবাসার স্মৃতি রেখে যেতে চাই।

হ্যাঁ, শুধুই ভালোবাসার স্মৃতি রেখে যেতে চাই।

লোকান্তরের জনক

জনক আমি লোকান্তরের
স্বকীয় মনে অনুভবে,
মনের অশুচি হয়ে গেল সাফ
ঋষি, মুনি হব ভবে।

অপত্য মোর নুরের আভার
স্পর্শে পরশমণি,
স্নেহ মমতায় স্বর্গের সুখ
হৃদয়ে স্বর্ণখনি।

মেঘে ঢাকা মন সিক্ত মায়ায়
রোদনের লুকোচুরি,
প্রীতির মাঝে খেদগুলো সব
গোপন খোলসে মোড়ি।

সংকট সব পাশ কেটে যায়
খোদা সদা সাথে মোর!
গহিষ্ণুতায় অটল সত্তা,
জানি পরিণামে কোহিনূর।